ছোটদের অম্‌নিবাস

প্রেমেন্দ্র মিত্র

ওরিয়েণ্ট লংম্যান লিমিটেড
বোম্বাই ॥ কলিকাতা ॥ মাদ্রাজ ॥ নয়াদিল্লী
বাঙ্গালোর ॥ হায়দ্রাবাদ

ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস:
৩/৫ আসফ আলী রোড · নয়াদিল্লী ১১০০০১

আঞ্চলিক অফিস:
নিকল রোড, ব্যালার্ড এস্টেট · বোম্বাই ৪০০০৩৮
১৭ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ · কলিকাতা ৭০০০১৩
৩৬এ মাউন্ট রোড · মাদ্রাজ ৬০০০০২
১/২৪ আসফ আলী রোড · নয়াদিল্লী ১১০০০১
৮০/১ মহাত্মা গান্ধী রোড · বাঙ্গালোর ৫৬০০০১
৩/৫/৮২০ হায়দারগুডা · হায়দ্রাবাদ ৫০০০০১

—

প্রথম প্রকাশ: জুন ১৯৭৪

—

বার টাকা

প্রকাশক: শ্রী এন্. ভেম্বু. আয়্যার
রিজিওনাল ম্যানেজার
ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড
১৭ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ · কলিকাতা ৭০০০১৩

মুদ্রক: শ্রীসুনীলকৃষ্ণ পোদ্দার
শ্রীগোপাল প্রেস
১২১ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট · কলিকাতা ৭০০০০৪

—

শ্রীমান শুভময় চট্টোপাধ্যায়
স্নেহাস্পদেষু—

সূ চি প ত্র



সে অনেককাল আগের কথা।

তখন সবই ছিল আশ্চর্য রকমের। তখন ঠিক ভোরের বেলা সূর্য উঠতো ; আর এমন মজা যে, ঠিক রাত হওয়ার আগেই সূর্য অস্ত যেত। দিনের বেলা তখন আলো থাকতো, আর রাত্তিরে হতো অন্ধকার।

পৃথিবীই ছিল তখন কি সুন্দর! মাটিতে নরম সবুজ ঘাস! হরেকরকম গাছে হরেকরকম রঙের ফুল, আর রাত্তিরবেলা আকাশে হাজার হাজার তারা—সে দেখতেই ছিল চমৎকার!

পাখিই ছিল তখন কতরকম। একরকম পাখি ছিল, তার নাম কাক। মিশকালো অন্ধকারের মতো তার রঙ্। আর তার গলার স্বর! কেউ-কেউ বলে তার গলার স্বর নাকি ভালো ছিল না। আমরা কিন্তু তা বিশ্বাস করি না। যে-কোকিল আজকাল আখছার আমাদের পথে-ঘাটে ঘুরে বেড়ায়, তারই যদি স্বর এত ভালো হয়, তবে না জানি কাকের স্বর কি মিষ্টি ছিল! আর এই কোকিল নাকি সেই কাকেদের বাসাতেই গলা-সাধতে শিখতো। সে-কাক এখন আর পাওয়া যায় না, কেউ-কেউ বলে—'উত্তর-মেরুতে পৃথিবীর যে সবচেয়ে বড় চিড়িয়াখানা আছে, সেখানে নাকি একটি কাক এখনো আছে। তার জোড়াটি মরে যাওয়ায় সেটিও নাকি ভারি

মনের কষ্টে আছে—বেশিদিন আর বাঁচবে না।' আর একরকম পাখি ছিল, তার নাম চড়ুই। সে-পাখি লোকের ঘরে-দোরে, কড়িকাঠের ফাটলে বাসা বাঁধতো। ক্ষুদে-ক্ষুদে পাখিগুলি নাকি মানুষের বাসের কাছে নইলে থাকতো না। মানুষের ফেলা-ছড়ানো ক্ষুদ-কুঁড়ো খেয়েই তারা থাকতো।

তোমরা ঘোড়া বোধহয় কেউ-কেউ দেখেছ। সে-ঘোড়া তখন পথে-ঘাটে গাড়ি টেনে লোক বয়ে বেড়াতো। কুকুর তো তখন যেখানে-সেখানে এখনকার চিতাবাঘের মতো সস্তা ছিল। এখন যেমন লোকে চিতাবাঘ পোষে, তখন তেমনি কুকুর পুষতো। আর একরকম জানোয়ার ছিল—তার নাম বেড়াল। সে-বেড়ালের কথা আমরা বেশি-কিছু জানি না। সেকালের লোকেরা বেড়াল-সম্বন্ধে বেশি-কিছু লিখে যায়নি।

একটি বহু পুরোনো সেকালের পুঁথিতে বেড়ালকে বাঘের মাসী বলা হয়েছে। তাতে মনে হয়, বেড়াল খুব প্রকাণ্ড জানোয়ার ছিল। কিন্তু এতবড় জানোয়ার লোকে বাড়িতে কি ক'রে পুষতো, তা আমরা এখনো বুঝতে পারিনি। সরকারী পশুশালার একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বেড়াল-সম্বন্ধে গবেষণা ক'রে একটি বই লিখেছেন। সেই বই প্রকাশিত হলে বেড়াল-সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য কথা জানা যাবে। আরো এমন সব অদ্ভুত জানোয়ার সেকালে ছিল, যা চোখে দেখলেও তোমরা বিশ্বাস করতে পারবে না—ছাগল, ভেড়া, গরু ইত্যাদি কত নাম করবো।

সবচেয়ে মজার কথা এই যে, তখনকার পিঁপড়ে নাকি খুব বড় হলেও মানুষের কড়ে আঙুলের চেয়ে বড় হতো না। সে-পিঁপড়েও ছিল নানাজাতের। মানুষের ঘরে-দোরে, মাঠে-গাছে নানারকমের পিঁপড়ে তখন গর্তের ভেতর বাসা বেঁধে থাকতো। তাদের মধ্যে দু'-এক জাতের পিঁপড়ে মানুষকে কামড়ে একটু যন্ত্রণা দেওয়া ছাড়া আর কোনো ক্ষতিই করতে পারতো না। দল বেঁধে একসঙ্গে তারা তখন থেকেই থাকতো বটে, কিন্তু মানুষ তখন মোটেই ভাবতে পারেনি

যে, এই পিঁপড়ের সঙ্গে পৃথিবীর অধিকার নিয়ে তাকে একদিন লড়াই করতে হবে। অনেকে তখন পিঁপড়ের ওপর দয়া ক'রে তাদের বস্তা-বস্তা চিনি খেতে দিত।

আর-বছরে দক্ষিণ-আমেরিকায় পিঁপড়েদের সঙ্গে যুদ্ধে আমরা ভয়ানকভাবে হেরে গেছি, একথা তোমরা সকলেই নিশ্চয়ই শুনেছ। কিন্তু তোমরা শুনলে আশ্চর্য হবে যে, তখন সমস্ত দক্ষিণ-আমেরিকায় নানাজাতের মানুষের বাস ছিল। মানুষ তখন নিজেদের মধ্যে মারামারি করতেই ব্যস্ত, পিঁপড়েরা কি করছে না করছে, তা দেখবার কথা তাদের কল্পনায়ও আসেনি। খুব বেশি পিঁপড়ের উৎপাত হলে পিঁপড়ের গর্তে খানিকটা বিষাক্ত অ্যাসিড ঢেলে দিলেই ঝঞ্ঝাট চুকে যেত। ৭৮৯৯ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ-আমেরিকায় মানুষের বাস ছিল, জানা গেছে। তারপর থেকেই আন্দিজ-পাহাড়ের জঙ্গল থেকে এই নতুন-জাতের ছ'ফুট লম্বা পিঁপড়ে বেরিয়ে দক্ষিণ-আমেরিকা থেকে মানুষ তাড়াতে শুরু করে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এর আগে অনেক পর্যটক সমস্ত দক্ষিণ-আমেরিকার পাহাড়-জঙ্গল ঘুরে বেড়িয়েছে, কিন্তু কেউ-ই এই পিঁপড়ের কোনো সন্ধান পায়নি। ৬৭৫৭ সালে বিখ্যাত পর্যটক অশেষ রায় যখন দক্ষিণ-আমেরিকার জঙ্গল ঘুরে এসে আন্দিজ-পার্বত্যপ্রদেশে একরকম অদ্ভুত জানোয়ারের কথা বলেন, তখন কাগজে-কাগজে তাঁকে এমন উপহাস-বিদ্রূপ করে যে, শেষ পর্যন্ত তাঁকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে চুপ ক'রে যেতে হয়। কিন্তু মৃত্যুর সময় তিনি তাঁর শেষ ডায়েরিতে লিখে যান : 'আমি শপথ ক'রে বলে যাচ্ছি—আমি যে অদ্ভুত জানোয়ারের কথা বলেছি, তা মিথ্যে নয়, মিথ্যে নয়।'

ওই আন্দিজ-পাহাড়ের কাছেই ৬৭৬৩ সালে একদল জাপানী রুপোর খনি আবিষ্কার ক'রে তাতে কাজ করতে গিয়ে একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। তারপর পাঁচ বৎসর ধ'রে তাদের তন্ন-তন্ন ক'রে খুঁজেও কোনো পাত্তাই পাওয়া যায়নি। তোমরা বোধহয় জান যে,

সে-সময় এই ব্যাপার নিয়ে ভয়ানক হুলস্থুল পড়ে গেছল। অশেষ রায় যখন এই একহাজার জাপানীর অন্তর্ধানের সঙ্গে এই অদ্ভুত জানোয়ারের কোনো সংস্রব আছে বলেন, তখন লোকে তাঁকে শুধু পাগলা-গারদে পাঠাতে বাকি রেখেছিল। অশেষ রায় এই অদ্ভুত জানোয়ার সম্বন্ধে যেসব কথা জানান, তা অত্যন্ত বিস্ময়জনক। সেকালের লোকেরা এই অপরূপ কাহিনীকে আজগুবি বলেছিল বলে তাদের বেশি দোষও আমরা দিতে পারি না।

অশেষ রায় তাঁর পর্যটন থেকে ফিরে কোনো কাগজে লিখেছিলেন : "সেবার দক্ষিণ-আমেরিকা-ভ্রমণে আমার সঙ্গী ছিলেন আমার কাফ্রী বন্ধু, পৃথিবী-বিখ্যাত কীটতত্ত্ববিদ্ মণ্ডুলা। আগের দিন আমরা মাসোর নদীর উৎসে পৌঁছোই। তারপর আমাদের গন্তব্যস্থল ছিল আলাগাস হ্রদ।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা আমরা ক্লান্ত হয়ে সারাটা'র কাছে একটি ছোট পাহাড়ের উপরে বিশ্রাম করছিলাম। আমাদের চারিপাশে আন্দিজের অসংখ্য শাখা-প্রশাখা তাদের বিপুল দেহ নিয়ে ঘিরে ছিল। তখনো সূর্য অস্ত যায়নি। আমাদের পশ্চিমে—ঠিক আমাদের পাহাড়ের নিচের উপত্যকার উপর তখন অস্তগামী সূর্যের আলো এসে পড়েছে। উপত্যকাটি আয়তনে খুব ছোট। চারিধারে পাহাড় যেন বিশাল দেওয়ালের মতো ওইটুকু জমিকে ঘিরে আছে। উপত্যকাটি আগাগোড়া দুর্ভেদ্য জঙ্গলে আচ্ছন্ন। শুধু একজায়গায় ছোট একটি পার্বত্য জলাশয় দেখা যাচ্ছিল।

আমি তখন আমাদের ছোট্ট তাঁবুটি রাত্রের জন্যে খাটাবার বন্দোবস্ত করছি। মণ্ডুলা তাঁর সেদিনকার সংগৃহীত নতুন-জাতের কীটগুলি বাক্সবন্দী করছিলেন। হঠাৎ চাপা উত্তেজিতকণ্ঠে মণ্ডুলা ডাকলেন—'শুনুন।'

খুঁটি পুঁততে পুঁততে চেয়ে দেখি, তিনি নিবিষ্টভাবে নিচের উপত্যকার দিকে চেয়ে আছেন। তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে কিন্তু আমি কিছুই দেখতে পেলাম না।

জিজ্ঞেস করলাম—'ব্যাপার কি?'

মঞ্জুলা শুধু ইসারায় তাঁর কাছে যেতে বললেন এবং তাঁর কাছে গেলে তিনি অঙ্গুলি-নির্দেশ ক'রে নিচের পার্বত্য জলাশয়টি দেখিয়ে বললেন—'দেখতে পাচ্ছেন?'

জলাশয়ের ধারে কালোরঙের কি একটা জানোয়ারকে অস্পষ্টভাবে ঘুরতে-ফিরতে দেখা যাচ্ছিল। বললাম—'ও আর কি? কোনো জানোয়ার-টানোয়ার হবে বোধহয়।'

মঞ্জুলা ঈষৎ হেসে বললেন—'কোনো জানোয়ার-টানোয়ার যে হবে, তা আমিও বুঝেছি, কিন্তু কোন্ জানোয়ার? দক্ষিণ-আমেরিকায় অত বড় কালো জানোয়ারের একটা নাম করুন তো দেখি! আপনি দূরবীণটা একবার বের করুন তো।'

সূর্য এরই মধ্যে পশ্চিমের পাহাড়ের আড়াল হয়ে গেছে। নিচে সমস্ত জলাশয়টির ধারে একটির পর একটি ক'রে দশটি ঐধরনের কালো জানোয়ার এসে তখন জড়ো হয়েছে।

আমার হাত থেকে দূরবীণটা একরকম কেড়ে নিয়েই মঞ্জুলা চোখে লাগালেন। কিন্তু পরের মুহূর্তেই দূরবীণটা নামিয়ে বললেন—'যাঃ, সব মাটি হয়ে গেল।'

দুর্ভাগ্যক্রমে সেইদিনই পাহাড়ে ওঠবার সময়ে কেমন ক'রে না জানি ঠোকা লেগে দূরবীণের কাঁচ দু'টি ভেঙে গেছে। সূর্যের আলো তখন বিরল হয়ে এসেছে। তবু সেই আলোতেই আমাদের খালি-চোখে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম, গভীর অরণ্যের ভেতর থেকে প্রায় দু'শো ঐ অপরূপ জানোয়ার জলাশয়ের ধারে এসে জড়ো হয়েছে। তাদের আকৃতি অদ্ভুত—সামনে ও পেছনে দু'টি বড়-বড় কালো ভাঁটাকে কে যেন এক-একটি খাটো কাঠিতে গেঁথে লম্বা-লম্বা পায়ের ওপর সাজিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তাদের আকৃতি যত না অদ্ভুত, তাদের আচরণ তার চেয়েও বেশি। দলবদ্ধ হয়ে অনেক জানোয়ার থাকে বটে, কিন্তু এমন অপরূপ শৃঙ্খলা কোনো জানোয়ারের ভেতর আছে বলে শুনিনি। তাদের একসারে চলা-ফেরা-দাঁড়ানোর সঙ্গে



মঞ্জুলা শুধু ইসারায়···বললেন···'দেখতে পাচ্ছেন ?'

একমাত্র খুব শিক্ষিত সৈন্যের কুচকাওয়াজের তুলনা করা যায়।

যত তাদের গতিবিধি দেখছিলাম, দূরবীণের কাচ ভেঙে যাওয়ায় দুঃখ আমাদের ততই বাড়ছিল। সন্ধ্যের অন্ধকারে তারা শেষে একেবারে অরণ্যের সঙ্গে মিলিয়ে গেলে আমরা বিমর্ষভাবে সেদিক থেকে চোখ ফেরালাম। সেদিন রাত্রে তাঁবুতে শুয়ে-শুয়ে ঘুম আমাদের আসতে চাইছিল না। মণ্ডুলা তাঁর বিছানায় অস্থিরভাবে খানিকক্ষণ এ-পাশ ও-পাশ ক'রে বললেন—'আচ্ছা, আপনার কি মনে হয়, বলুন তো? এমন আশ্চর্য জানোয়ার এতকাল কোনো পর্যটকের চোখে পড়েনি, এটা কি বিশ্বাস করা যায়?'

আমারও সেই কথাই মনে হচ্ছিল। তারপর কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি, মনে নেই। হঠাৎ চমকে জেগে উঠে দেখি, মণ্ডুলা উত্তেজিত-ভাবে আমায় ঝাঁকি দিচ্ছেন। আমি চোখ খুলতেই তিনি বললেন—'শিগ্‌গির বাইরে এসে দেখুন।'

তখনো ঘুমের ঘোর কাটেনি, অর্ধ-জাগ্রত অবস্থায় বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম।

মণ্ডুলা উত্তেজিতভাবে বললেন—'চেয়ে দেখুন—নিচে চেয়ে দেখুন।'

নিচে চেয়ে দেখে সত্যিই অবাক হয়ে গেলাম। অন্ধকারে সেই পার্বত্য জলাশয়ের ধারে নানা জায়গায় অসংখ্য আলো জ্বলছে। সে-আলোয় আমাদের পাহাড় থেকে বিশেষ-কিছুই দেখা যাচ্ছিল না, শুধু অস্পষ্টভাবে ওই জানোয়ারদের নড়া-চড়া এক-আধটু টের পাওয়া যাচ্ছিল। আমরা কিন্তু মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেইদিকে চেয়ে বসে রইলাম। এতবড় বিস্ময়জনক ব্যাপার বিশ্বাস করতে যেন আমাদের সাহস হচ্ছিল না।

ভোর হওয়ার কিছু আগেই সমস্ত আলো নিভে গেল। আমরা কিন্তু সেখান থেকে উঠতে পারিনি। ভোরের আলোয় ঐ জলাশয়ের দিকে চেয়ে আমাদের বিস্ময়ের আর অবধি রইল না। জলাশয়ের পশ্চিম-পাড়ে প্রায় দশবিঘা জমির জঙ্গল একেবারে সাফ হয়ে

গেছে। আগের দিন সন্ধ্যেবেলা যে প্রকাণ্ড গাছগুলি সে-স্থান অন্ধকার ক'রে দাঁড়িয়েছিল, তাদের চিহ্ন পর্যন্তও নেই।

মণ্ডুলার উত্তেজনা তখনো শান্ত হয়নি। আমার হাতটা সজোরে নাড়া দিয়ে তিনি বললেন—'আমার কি মনে হয় জানেন, আমরা যে অদ্ভুত জানোয়ার দেখেছি তারা কীটজাতীয় প্রাণী!'

এবার কিন্তু আমি না হেসে পারলাম না, বললাম—'কারণ আপনি কীট-তত্ত্ববিদ্!'

মণ্ডুলা আমার পরিহাসে কান না দিয়ে বললেন—'হ্যাঁ, তাই! কীটজাতীয় ছাড়া পৃথিবীর কোনো প্রাণীর চারটার বেশি পা দেখেছেন?'

কথাটা সত্যি! আমরা যে অদ্ভুত জানোয়ার দেখেছি, তাদের পা কতগুলি, তা গুণতে না পারলেও চারের যে বেশি, এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই।

মণ্ডুলা বলে যাচ্ছিলেন—'তা ছাড়া আকৃতির কথা মনে রাখবেন।'

বললাম—'কিন্তু এত বড় কীট?'

মণ্ডুলা বললেন—'অসম্ভব তো নয়।'

তারপর পুরো একটি সপ্তাহ আমরা সেই পাহাড়ে ওই অদ্ভুত প্রাণী দেখবার জন্যে অপেক্ষা করি, কিন্তু আর কিছু দেখবার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি।"

অশেষ রায়ের বর্ণনা এইখানেই শেষ হয়েছে। তারপর একহাজার বৎসর এই প্রাণীর কথা আর কিছু শোনা যায়নি। অশেষ রায় ও মণ্ডুলার কথায় পৃথিবীর লোক হাসলেও কেউ-কেউ যে এ-বিষয়ে অনুসন্ধান করবার জন্যে সেখানে যায়নি, এমন নয়। কিন্তু আর কোনো পর্যটকের চোখে কিছু পড়েনি। এখন আমরা অবশ্য বুঝতে পারছি যে, অশেষ রায় এই পিঁপড়েদেরই দেখেছিলেন! তাঁর বর্ণনার একটি বর্ণও মিথ্যে নয়! কিন্তু মানুষ বেশ নিশ্চিন্ত হয়েই ছিল!

এই পিঁপড়ের কথা যখন আমরা জানলাম, তখন আর সময় নেই। ११৫१ সালে একেবারে বজ্রঘাতের মতো আচম্বিতে মানুষকে এই

পিঁপড়ের আক্রমণ অভিভূত ক'রে দেয়। আক্রমণের আগের মুহূর্ত পর্যন্ত কেউ এ-কথা কল্পনাও করেনি। পিঁপড়েরা যে বহুদিন থেকে গোপনে প্রস্তুত হয়েছিল, তার প্রমাণ ৭০ ডিগ্রি লঙ্গিচিউডের পশ্চিম-ধারে দক্ষিণ-আমেরিকার সমস্ত প্রধান নগর একদিনে ধ্বসে পড়ে। কতদিন আগে থেকে যে পিঁপড়েরা এই নগরগুলো ফোঁপরা ক'রে এসেছে, কেউ তা বলতে পারে না। মানুষ মাটির ওপরেই যুদ্ধ করতে ব্যস্ত। মাটির তলায় কোনো শত্রু তার সর্বনাশের আয়োজন করছে, এ-কথা সে কেমন ক'রে জানবে! ৭৭৫৭ সালের ১লা ফাল্গুন রাত একটার সময় কলম্বিয়া, ভেনেজুয়েলা, পেরু, ইকোয়েডরের সমস্ত বড়-বড় শহর যখন হঠাৎ ভীষণ শব্দে ধ্বসে পড়ে, তখনো কেউ সন্দেহ করেনি যে, এ কোনো শত্রুর কাজ। বিরাট ভূমিকম্প ভেবেই মানুষ তখন ভয় পেয়েছিল। কিন্তু ধ্বসে-পড়া নগরগুলির বিরাট বিশৃঙ্খলার ওপর যখন প্রভাত হলো, তখন যে-দৃশ্য প্রতি নগরের মুষ্টিমেয় জীবিত নগরবাসীদের চোখে পড়ল তা অতি ভয়ঙ্কর। প্রতি নগরের চারিধারে অসংখ্য পিপীলিকা-বাহিনী ঘিরে দাঁড়িয়েছে।

পিঁপড়েদের সেই প্রথম আক্রমণে যে-সমস্ত নগর ধ্বংস হয়ে যায়, তার একটিমাত্র অধিবাসীই রক্ষা পেয়েছিলেন। তিনি রায়োবোমা নগরের ডন পেরিটো। নগর-ধ্বংসের সঙ্গে-সঙ্গেই অধিকাংশ লোক মারা পড়েছিল, যে-কয়েকজন সকালবেলা পর্যন্ত কোনোরকমে জীবিত ছিল, পিঁপড়েরা তাদের নির্মমভাবে সংহার করে। মানুষ সেবার যুদ্ধের অবসর পর্যন্ত পায়নি—প্রস্তুতই তারা ছিল না! ডন পেরিটো কোনোরকমে তাঁর এরোপ্লেনে চ'ড়ে একেবারে মেক্সিকোতে পালিয়ে আসেন। এরোপ্লেনে চ'ড়েও যে তাঁর নিস্তার ছিল, তা নয়। এমনি এরোপ্লেনে ক'রে আরো অনেকে পালাতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পাখাওয়ালা পিঁপড়েরা আকাশে পর্যন্ত তাঁদের অনুসরণ ক'রে তাঁদের সে-চেষ্টা ব্যর্থ ক'রে দেয়। ডন পেরিটোর জীবনরক্ষা হয়েছিল শুধু তাঁর উপস্থিত-বুদ্ধিতে! অন্য-সকলের মতো প্রথম থেকেই এরোপ্লেনে লম্বা পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা না ক'রে তিনি প্রথমে শুধু ঊর্ধ্বে

আরোহণ করবার চেষ্টা করেন। পিঁপড়েরা আটহাজার ফিট পর্যন্ত তাঁকে তাড়া করে, কিন্তু তার বেশি তারা আর উঠতে পারে না বলেই তিনি রেহাই পান। পিঁপড়েদের প্রথম আক্রমণের কাহিনী পৃথিবীর লোক তাঁর কাছেই পায়।

তারপর কয়েক বৎসরের মধ্যে পিঁপড়েরা কিভাবে গায়না, ব্রেজিল, বলিভিয়া ও আর্জেনটাইন-রিপাবলিক দখল করে, তার ইতিহাস তোমরা কিছু-কিছু নিশ্চয়ই জান।

আশ্চর্যের কথা এই যে, পিঁপড়েদের প্রথম আক্রমণের পরেও দক্ষিণ-আমেরিকার অন্যান্য দেশ তেমনভাবে সাবধান হয়নি। তার একটা কারণ বোধহয় এই যে, প্রথম আক্রমণের পর দু'বৎসর পর্যন্ত তাদের আর কোনো সাড়া-শব্দ পাওয়া যায়নি। হঠাৎ দু'বৎসর বাদে একদিন মাঝরাতে ৫২ ডিগ্রি লঙ্গিচিউডের পশ্চিমের সমস্ত শহর ধ্বসে পড়ে। এই লঙ্গিচিউড ধ'রে পিঁপড়েদের আক্রমণ আর একটি আশ্চর্য ব্যাপার! এবারেও সেই আগেরবারের কাহিনীর পুনরাবৃত্তি হয়। শুধু অরিনকো নদীর ধারে বলিভার নগরের লোকেরা আগে থেকে সন্দেহ ক'রে শহর ছেড়ে নদীতে অস্ত্র-শস্ত্র ও যুদ্ধ-জাহাজ নিয়ে জড়ো হয়েছিল। তারাই কেবল যুদ্ধ ক'রে মরবার সৌভাগ্য পেয়েছিল। এই যুদ্ধে প্রথম পিঁপড়েদের অদ্ভুত অস্ত্রের ও তাদের যুদ্ধ-কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। এই যুদ্ধের শেষে কয়েকজন মাত্র বলিভার-নগরবাসী নদী দিয়ে মোটর-লঞ্চে অ্যাটলান্টিক সাগরে পালিয়ে রক্ষা পেয়েছিলেন।

পিঁপড়েরা যে-অস্ত্র ব্যবহার করে, তাকে খুব ভয়ঙ্কর একরকম বোমা বলা যেতে পারে। কিন্তু বোমা-প্রয়োগ করার রীতিটাই সবচেয়ে অদ্ভুত। বলিভার-নগরবাসীরা বলেন—"যখন তীর থেকে বহু উড়ন্ত পিঁপড়েকে গোল-গোল একরকম জিনিস নিয়ে আমাদের দিকে উড়ে আসতে দেখি, তখনই তাদের দিকে গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করি। অনেক পিঁপড়ে এইভাবে মারা পড়ে, কিন্তু দু'-একটা পিঁপড়ে সমস্ত গোলা-গুলি এড়িয়েও আমাদের জাহাজ-নৌকোতে এসে পড়ে।

তাদের পড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই সেই ভয়ঙ্কর বিস্ফোরক বোমা ফেটে জাহাজ-নৌকো সব গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যায়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, প্রত্যেক বোমার সঙ্গে একটি ক'রে পিঁপড়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে প্রাণ দেয়। দূর হতে নিক্ষেপ ক'রে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার কোনো সম্ভাবনা তারা রাখে না।"

পিঁপড়েদের দ্বিতীয় আক্রমণের পর সমস্ত পৃথিবী সচেতন হয়ে ওঠে। চীনের পিকিন শহরে পৃথিবীর সমস্ত দেশের প্রতিনিধিরা মিলে কর্তব্য স্থির করবার চেষ্টা করেন। পৃথিবীর সমস্ত দেশ থেকে অসংখ্য যুদ্ধ-জাহাজ, এরোপ্লেন ও সৈন্য দক্ষিণ-আমেরিকার বাকি দেশগুলির অধিবাসীদের হয়ে যুদ্ধ করবার জন্যে পাঠানো হয়। কিন্তু যুদ্ধ করবে কার সঙ্গে? পিঁপড়েদের আস্তানার কোনো পাত্তাই কেউ পায় না। মাটির তলায় কোথা দিয়ে তাদের গতিবিধি, সমস্ত আমেরিকা খুঁড়ে না ফেললে জানবার উপায় নেই। সৈন্যেরা দিনের পর দিন, ক্রোশের পর ক্রোশ পার হয়ে তন্ন-তন্ন ক'রে সমস্ত খুঁজে বেড়ায়। তারপর একদিন হঠাৎ এক জায়গায় গভীর-রাত্রে তাদের পায়ের তলার মাটি ধ্বসে পড়ে। সকালবেলা তাদের আর কোনো চিহ্নই পাওয়া যায়নি। এরোপ্লেনের দল ঝাঁকে-ঝাঁকে দক্ষিণ-আমেরিকার আকাশে বিচরণ ক'রে বেড়ায়। পিঁপড়েদের কোনো পাত্তাই পাওয়া যায়নি। এরোপ্লেনগুলিরও কোনোমতে আট-হাজার ফিটের নিচে নামবার উপায় নেই, কোথা থেকে একশো এরোপ্লেনের জায়গায় হাজার-হাজার উড়ন্ত পিঁপড়ে এসে আক্রমণ করে।

পিঁপড়েদের সঙ্গে এরোপ্লেন নিয়ে লড়াই করা শক্ত। একটাকে মারতে একশোটা এসে ছেঁকে ধরে। সবচেয়ে মুস্কিল, তারা এরোপ্লেনের ঘূর্ণ্যমান পাখার সঙ্গে জড়িয়ে তাকে অচল ক'রে মাটিতে ফেলে দেয় এবং সঙ্গে-সঙ্গে নিজেরাও মরে।

আটহাজার ফিট ওপর থেকে পিঁপড়েদের কোনো সন্ধানও মেলে না।

এদিকে মাটির ওপর বাকি সমস্ত দক্ষিণ-আমেরিকা তখন প্রাণপণে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। যেখানে যে শহর ছিল, সমস্ত শহরের লোক শহরের বাইরে নতুন ক'রে ঘর বেঁধে বাস করতে আরম্ভ করলে। কখন যে কোন্ শহর ধ্বসে পড়ে, তার ঠিক কি? পিঁপড়েরা কবে থেকে কোন্ শহরের তলা ফোঁপ্‌রা ক'রে রেখেছে, তা কে বলতে পারে?

কিন্তু পিঁপড়েদের তৃতীয় ও শেষ আক্রমণ এলো সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে। হঠাৎ একদিন সমস্ত নতুন শহরের ভেতর সকাল থেকে মড়ক শুরু হয়ে গেল। সুস্থ-সবল মানুষ হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে যায়, তারপর কয়েক মিনিট হাত-পা খিঁচে মারা যায়! কাতারে-কাতারে সকাল থেকে লোক মারা পড়তে থাকে, অথচ ডাক্তার-বৈজ্ঞানিকেরা রোগের স্বরূপই খুঁজে পান না। সারা পৃথিবী এ-সংবাদ শুনে ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। বড়-বড় মাথা ঘেমে উঠল, কিন্তু এই মড়কের কারণ বোঝা গেল না। একদিনে এইভাবে অর্ধেক আমেরিকার লোক নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার পর পরের দিন সকালে রোগের কারণ আবিষ্কার করলে কিন্তু বাহিয়া-শহরের একজন মুটে। সকালবেলা শহরের সৈন্যাধ্যক্ষ, শাসনকর্তা আর তিনজন বৈজ্ঞানিকের একটি গোপন-সভা বসেছে। শাসনকর্তা নিরুপায় হয়ে শহর ছেড়ে, আমেরিকা ছেড়ে, একেবারে জাহাজে ক'রে এই ভয়ানক দেশ ছেড়ে যাওয়ারই প্রস্তাব করেছেন। বৈজ্ঞানিক ও সেনাপতিদের মধ্যে এই কথা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হচ্ছে—এমনভাবে পিঁপড়েদের কাছে হার স্বীকার ক'রে পালিয়ে যাওয়ার চেয়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে মরাও ভালো বলে সৈন্যাধ্যক্ষ তাঁর বক্তব্য শুরু করেছেন, এমন সময়ে হাঁপাতে হাঁপাতে তাঁদের সভার প্রহরীকে একরকম বগল-দাবাতে চেপে ধরে নিয়েই একটা বিশালকায় লোক ঘরের ভেতর এসে আছাড় খেয়ে পড়ল। সভার সকলে তো স্তম্ভিত! লোকটা যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া—মাংসের একটা পাহাড় বললেই হয়। কিন্তু তার সমস্ত মুখে কে যেন কালি মাখিয়ে দিয়েছে। সে-মুখের দিকে চাইলেই বোঝা



সভার প্রহরীকে একরকম বগল-দাবাতে চেপে ধরে…

যায় যে, এই অজানা ভয়ঙ্কর রোগ তাকে প্রবলভাবেই আক্রমণ করেছে। শেষ হওয়ার তার আর দেরি নেই। সেই বিশাল বিরাট দেহ সেই ভীষণ রোগের প্রভাবে এরমধ্যেই কাঁপতে শুরু করেছে। তার ভীষণ বাহুর চাপে প্রহরীটিরও তখন প্রাণান্ত হয়ে এসেছে। প্রথম বিস্ময় কেটে গেলে সেনাপতি তাড়াতাড়ি গিয়ে তার বাহুপাশ থেকে প্রহরীকে ছাড়িয়ে দিতে চেষ্টিত হলেন। প্রহরী তখন চিৎকার করছে যন্ত্রণায়! কিন্তু সে বিশাল দেহের জোরের সঙ্গে কি পারা যায়! লোকটার তখন হাত-পা-খিঁচুনি শুরু হয়েছে। অনেক কষ্টে প্রহরীকে যখন সবাই মিলে মুক্ত করলেন, তখন দেখা গেল যে, তার একটা পাঁজরা একেবারে ভেঙে গেছে। প্রহরী তো অনেক কষ্টে জানালে যে, এই লোকটাকে সভায় ঢুকতে মানা করতে গিয়েই তার এই দুর্দশা এবং লোকটাকে সে চেনে। সে এই শহরের একজন মুটে—তার নাম গুস্তাভ।

কেন তার সভায় ঢোকবার এত ব্যগ্রতা, সে-কথা তখন গুস্তাভকে জিজ্ঞেস করা বৃথা। মৃত্যুর পূর্বলক্ষণরূপ প্রবল হাত-পা-খিঁচুনি তখন তার শুরু হয়ে গেছে। কয়েক মিনিট বাদেই সব শেষ হয়ে যাবে। সভার সকলে বিমর্ষমুখে তারই অপেক্ষা করতে লাগলেন। দু'-এক মিনিটের মধ্যেই গুস্তাভ মারা গেল, কিন্তু মারা যাওয়ার আগে একটিবার চোখ খুলে সে উন্মত্তের মতো চিৎকার ক'রে উঠেছিল—'জল খেয়ো না।' তারপর সব শেষ।

'জল খেয়ো না!' এই ভয়ঙ্কর দৃশ্যের সামনেও সেনাপতির কৌতুক-বোধ হলো। শাসনকর্তা কাতরভাবে মুখ ফেরালেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে হঠাৎ একজন অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। মুখ-চোখ তাঁর অসাধারণভাবে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সেনাপতির পিঠ হঠাৎ চাপড়ে দিয়ে তিনি বললেন—'আমরা কি গাধা!'

সবাই তো অবাক। শাসনকর্তা বললেন—'আপনি একটু বিশ্রাম করুন গে যান, কাল থেকে আজ পর্যন্ত একটিবারও তো চোখের পাতা মোড়েননি।'

সবাই ভাবছিল—বৈজ্ঞানিকও বোধহয় পাগল হয়ে গেলেন ; কিন্তু বৈজ্ঞানিক পাগল হননি। সেনাপতিকে দু'হাতে জড়িয়ে ধ'রে তিনি বললেন—'আপনি কাল থেকে এখন পর্যন্ত কি খেয়েছেন ?'

ম্লান হেসে শাসনকর্তা বললেন—'খাওয়ার কি সময় পেয়েছি—শুধু এক পেয়ালা দুধ।'

কিন্তু এই কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁরও চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

বৈজ্ঞানিক হেসে বললেন—'এবার বুঝেছেন ?'

এতক্ষণে সকলেই বুঝেছিলেন। নানান কারণে, বিশেষত এই ভয়ঙ্কর মড়ক-নিবারণের উপায়-চিন্তায় তাঁদের কারুরই এই একদিন জল তো দূরের কথা, অন্য কিছু খাওয়ারই সুযোগ হয়নি।

বৈজ্ঞানিক বললেন—'যাকে আমরা নতুন রোগ বলে ভেবেছিলাম, তা কেবল বিষের ক্রিয়ামাত্র। শহরের জল বিষাক্ত হয়ে গেছে এবং কারা যে বিষাক্ত করেছে, তা বোধহয় আর বলতে হবে না!'

শহরের সব জায়গায় অবশ্য তখনই ঢেঁড়া পিটে দেওয়া হলো এবং দক্ষিণ-আমেরিকার সমস্ত শহরে তার ক'রে একথা জানিয়ে দেওয়া হলো।

সত্যই শহরের জল বিষাক্ত হয়েছিল। প্রত্যেক শহরের প্রধান ট্যাঙ্কের জল কিভাবে কখন যে পিঁপড়েরা বিষাক্ত ক'রে দিয়েছিল, তা অবশ্য কেউ জানে না!

কোনোরকমে এ-যাত্রা মানুষ রক্ষা পেলো বটে, কিন্তু দক্ষিণ-আমেরিকার অর্ধেক মানুষ কাবার হওয়ার আগে নয়।

এ-ধাক্কা আবার সামলাতে না সামলাতে হঠাৎ একদিন গভীর-রাত্রে শহরে-শহরে সাড়া পড়ে গেল—'পিঁপড়েরা আক্রমণ করতে আসছে! এবার যুদ্ধ মাটির ওপরে—সামনা-সামনি।' মানুষ এরই জন্যে এতদিন অপেক্ষা করছিল। মাটির ওপর যুদ্ধ করতেই সে অভ্যস্ত। এ-যুদ্ধের জন্যে সে সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

পিঁপড়েদের এই তৃতীয় আক্রমণের কাহিনী 'রায়ো-ডি-জানেইরো'র বিখ্যাত লেখক 'সেনর সাবাটিনি'র লেখা থেকে

আমরা পেয়েছি। তাঁর বিবরণই এখানে তুলে দিলাম।

সেনর সাবাটিনি লিখেছেন—"হঠাৎ গভীর-রাত্রে শহরের পশ্চিম-ধারের প্রাচীরের প্রহরীরা সংবাদ দিলে যে, দূরে লাখ-লাখ পিঁপড়ে এসে জড়ো হয়েছে। প্রস্তুত আমরা দিনরাতই থাকতাম। সুতরাং এ-সংবাদে আমাদের বিচলিত হওয়ার কিছু ছিল না। বরং এতদিন বাদে সামনা-সামনি যুঝতে পাবো বলে আমরাও উল্লসিত হয়ে উঠলাম। পশ্চিমের প্রাচীরের সমস্ত সার্চলাইট তখন রাত্রিকে দিন ক'রে তুলেছে। সেনাপতির আদেশে অন্য সমস্ত দিকে কয়েকজন প্রহরী ও সৈন্য ছাড়া আমরা সকলে পশ্চিমে নগর-প্রাকারের বাইরে এসে জড়ো হলাম।

সেখানে যে-দৃশ্য আমরা দেখলাম, তা জীবনে ভোলবার নয়। অন্ধকার রাত্রি আমাদের অসংখ্য সার্চলাইটের প্রখর আলোয় তিন-মাইল পর্যন্ত একেবারে যেন পেছিয়ে গেছে। সেই আলোয় আমাদের শহর থেকে দু'মাইল দূরে অসংখ্য পিঁপড়ের বাহিনী কালো-সমুদ্রের বন্যার মতো আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। পিঁপড়ের সারের পর পিঁপড়ের সার—যতদূর আলো পৌঁছোয়, ততদূর পর্যন্ত শুধু পিঁপড়ের সমুদ্র!

সেনাপতির আদেশে আমাদের একহাজার কামান গর্জন ক'রে উঠলো। ঘন পিঁপড়ের সারের মধ্যে আমাদের কামানের গোলায় যে ভয়ঙ্কর ধ্বংসলীলা আরম্ভ হলো, তা বর্ণনা করা যায় না। দিকে-দিকে আমাদের গোলায় ছিন্নভিন্ন হয়েও কিন্তু পিঁপড়েরা থামল না। মরা পিঁপড়ের স্তূপের ওপর দিয়ে নতুন পিঁপড়ের দল সমানভাবে অগ্রসর হতে লাগলো।

পিঁপড়েরা আমাদের গোলার জবাব দেয় না, শুধু নিঃশব্দে অগ্রসর হয়। সেনাপতির আদেশে এবার আমরা অগ্রসর হলাম। প্রথমে বিষাক্ত-গ্যাস নিয়ে একদল, তার পিছু-পিছু আমাদের আটশত ট্যাঙ্ক। প্রাচীর থেকে সার্চলাইট নামিয়ে বড়-বড় গাড়ির ওপর তুলে সেগুলিও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো।

পিঁপড়েদের দিক থেকে তবুও কোনো জবাব নেই। শুধু তারা ধীরে-ধীরে এগোয়।

সেনাপতি আদেশ দিলেন—'বিষাক্ত-গ্যাস ছাড়ো।'

বিষাক্ত-গ্যাস ছাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে কিন্তু পিঁপড়েদের অগ্রসর হওয়া বন্ধ হলো। সে-গ্যাসে এবং আমাদের ট্যাঙ্কগুলির মেশিনগানের গুলিতে লাখো-লাখো পিঁপড়ে মারা গেল। যেদিকে বিষাক্ত-গ্যাস ছোঁড়া হয়, সেদিকে পিঁপড়ের সার যেন কে মুছে দেয়। শুধু মাটি কালো ক'রে অসংখ্য পিঁপড়ের মৃতদেহ পড়ে থাকে। আমাদের ট্যাঙ্কগুলি সেই মরা-পিঁপড়ের সার মাড়িয়ে অগ্রসর হয়; আর তাদের মেশিনগানের গুলিতে পিঁপড়ের দল ছারখার হয়ে যায়। পিঁপড়েদের এই দুরবস্থায় তখন আমরা উল্লাসে উন্মত্ত হয়ে উঠেছি। শহর থেকে ছেলে, মেয়ে, বুড়োরা পর্যন্ত তখন পিঁপড়েদের ধ্বংস-যজ্ঞ দেখবার জন্যে প্রাচীরের বাইরে আমাদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

পিঁপড়েরা হঠাৎ যখন পিছু হাঁটতে আরম্ভ করল, তখন তাদের অর্ধেকের বেশি মারা পড়েছে। কিন্তু পেছুলে কি হবে? আমাদের ট্যাঙ্কগুলি তখন একেবারে তাদের ভেতরে গিয়ে পড়েছে। সেই বিরাট ট্যাঙ্কগুলির চাপেই যে কত পিঁপড়ে মারা গেল, তার ঠিক নেই।

আমার তখন মনে হচ্ছিল, এতদিন আমরা মিথ্যাই ভয় পেয়েছি। হয়তো কোনো উপায়ে তারা কিছু শক্তি অর্জন করেছে; কিন্তু হাজার হ'লেও তারা কীট—সামান্য কীট মাত্র। মানুষের শক্তি, মানুষের বুদ্ধি, মানুষের কৌশলের বিরুদ্ধে তারা লড়তে আসে কোন্ সাহসে? তাদের এই দুর্দশায় একটু যেন করুণাই আমার হচ্ছিল। সেনাপতির আদেশে তখন অশ্বারোহী সৈন্যের দল তাদের ভেতর গিয়ে পড়েছে। এ-যুদ্ধটা আমার একটা বীভৎস প্রহসনের মতো লাগছিল। অসহায় পিঁপড়ের দলের পিছু হাঁটবার ব্যর্থ-চেষ্টা দেখে আমার সত্যিই কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে,-ছিন্নভিন্ন হয়ে পিছু হাঁটলেও তারা কিন্তু ছত্রভঙ্গ হয়নি।

এবার সেনাপতির আদেশে পদাতিকদল অগ্রসর হলো। সেনা-পতির আদেশ—একটি পিঁপড়েও যেন আজ না বাঁচে। কিন্তু খানিক দূর অগ্রসর হতে না হতেই আমরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। পিঁপড়ে-বাহিনীর একেবারে পেছনে প্রায় শ'-পাঁচেক সার্চলাইট জ্বলে উঠেছে। পিঁপড়েদেরও যে সার্চলাইট থাকতে পারে এবং এতক্ষণ বাদে তা জ্বালবারই বা কি প্রয়োজন, ভেবে আমরা অবাক হয়ে গেলাম। সার্চলাইট তাকে ঠিক বলা চলে না। আমাদের সার্চ-লাইটের আলোর চেয়ে সে আলো শতগুণ তীব্র ও একটু যেন সবুজে রঙের। সে তীব্র আলোর সরু-জিহ্বা যেন তারা আমাদের আগের সৈন্যদের মুখের ওপর দিয়ে বুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। এই অভূতপূর্ব দৃশ্যে আমরা সবাই দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। আমাদের সারের পর সার সৈন্যদের মুখের ওপর দিয়ে সে-আলো বুলিয়ে-বুলিয়ে তারা ক্রমশ এগিয়ে আসছিল।

জুতোর ফিতেটা অনেকক্ষণ থেকে খুলে গিয়েছিল। এই অবসরে নিচু হয়ে বসে সেটা বেঁধে উঠে আমি দেখি যে, সে-আলো আমাদের সার ছাড়িয়ে আমাদের অনেক পেছনের সারের মুখের ওপর দিয়ে তারা দ্রুত বুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

আমার পাশের সৈনিকটি আমার হাতটা নাড়া দিয়ে বললে—'সার্চলাইটগুলো নিভে গেল কেন বল তো?'

আমি হেসে উঠলাম—'কানা হয়ে গেছ নাকি, সার্চলাইট আবার নিভল কোথায়? দিব্যি তো জ্বলছে।'

সে আবার ভীতকণ্ঠে বললে—'কই, আমি যে কিচ্ছুই দেখতে পাচ্ছি না।'

আমি তার পিঠ চাপড়ে বললাম—'ওই চড়া আলোয় চোখটায় একটু ধাঁধা লেগেছে। চোখটা একটু রগড়ে নাও।'

কিন্তু আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই আমাদের সামনের সার থেকে একজন চিৎকার ক'রে কেঁদে উঠলো—'আমি যে কিচ্ছুই দেখতে পাচ্ছি না!'

আমার পাশের সৈনিক আমার হাতটা কাতরভাবে জড়িয়ে ধরে বললে—'তবু যে কিছু দেখতে পাচ্ছি না ভাই, কি হবে?'

বিদ্যুতের মতো চকিতে এ-ব্যাপারের আসল অর্থ আমার মনে খেলে গেল। আমাদের সমস্ত বন্দুক-কামান স্তব্ধ হয়ে গেছে, আমাদের ট্যাঙ্কগুলিও নিঃশব্দ হয়ে গেছে, শুধু চারিদিক থেকে অসহায় সৈন্যদের চিৎকার, কলরব, বিলাপ তখন তুমুল হয়ে উঠেছে।

আতঙ্কে পেছনে ফিরে চিৎকার ক'রে উঠলাম—'চোখ বন্ধ কর, আলোর দিকে চেয়ো না।' কিন্তু চারিদিকের ভীত-অসহায় সৈন্যদের কলরব ছাপিয়ে সে-ক্ষীণস্বর কতদূর আর পৌঁছোয়! পিঁপড়েরা তখন আমাদের শহরের প্রাচীরের কাছে সমবেত ছেলেমেয়ে ও বুড়োদের মুখের ওপর দিয়ে আলো বুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

তারপর যে ভয়ঙ্কর বীভৎস ব্যাপার আরম্ভ হলো, তা বর্ণনা করবার শক্তি আমার নেই। সেই অন্ধ-অসহায় সৈন্যদের ওপর অসংখ্য পিঁপড়ে হিংস্র যমদূতের মতো ঝাঁপ দিয়ে এসে পড়লো।

চিৎকার ক'রে বললাম—'পালাও, পালাও!'

কে পালাবে? কোথায় পালাবে?

অন্ধ সৈন্যের দল অসহায়ভাবে পালাতে গিয়ে নিজেদের মধ্যেই মাথা ঠোকাঠুকি ক'রে মরতে লাগলো এবং পিঁপড়ের দল সেই বিশৃঙ্খল জটলাকে নির্মমভাবে সংহার করতে শুরু করলো। এই হতভাগ্য সৈন্যদের কোনোরকমে বাঁচাবার উপায় না দেখে অবশেষে নিজের প্রাণ রক্ষা করবার জন্যে ছুটতে হলো। কিন্তু ছুটে পালানোও সোজা নয়, পিঁপড়েরা তখন ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে। একটা বিশাল কালো পিঁপড়ে আমার পিঠের জামাটা কামড়ে ধরেছিল। হাতা-হাতি লড়াই পিঁপড়েদের সঙ্গে এর আগে হয়নি। সেই বিকট কীটকে দেখে শিশুর মতো ভয়ে চিৎকার ক'রে উঠলাম। কিন্তু চিৎকার করবার সময় সে নয়—পাশ থেকে আর একটা পিঁপড়ে তখন আমার পায়ে প্রচণ্ড কামড় দিয়ে চলেছে। সেটার মাথায় ছোরা বসিয়ে দিতেই চট্‌চটে একরকম রসে সমস্ত হাতটা আমার ভিজে গেল এবং

পরমুহূর্তেই পেছনের পিঁপড়েটার টানে একেবারে চিৎ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলাম। সমস্ত পিঠটা আমার ঐরকম রসে ভিজে ওঠাতে বুঝলাম, পেছনের পিঁপড়েটাকে দেহের চাপে থেঁৎলেই ফেলেছি। পিঁপড়েদের দেহগুলো আকারে বড় হলেও অত্যন্ত হালকা ও মানুষের তুলনায় অত্যন্ত নরম, এই যা রক্ষা। তাড়াতাড়ি উঠে আবার ছুট দিলাম—কোন্‌দিকে, তা মনে নেই।"

এইখানে সেনর সাবাটিনির বর্ণনা শেষ হয়েছে। রায়ো-ডি-জানেইরো'র সমস্ত-অধিবাসীর মধ্যে একমাত্র সেনর সাবাটিনিই রক্ষা পেয়েছিলেন। পিঁপড়েদের হাত কোনোরকমে এড়িয়ে সমুদ্রে পড়ে ছোট একটি ভেলার সাহায্যে নিকটের একটি দ্বীপে উঠে তিনি সেবার প্রাণ বাঁচান। কয়েকবছর বাদে একটি চীনে-জাহাজ তাঁকে সেখান থেকে উদ্ধার করে।

রায়ো-ডি-জানেইরো'র সঙ্গে-সঙ্গে পিঁপড়েরা সেদিন দক্ষিণ-আমেরিকার বাকি সমস্ত শহরই আক্রমণ করে। সে-আক্রমণে কোনো শহরই রক্ষা পায়নি। দক্ষিণ-আমেরিকা থেকে সেইদিনই মানুষের পাট ওঠে। তারপর আর মানুষ সেখানে পা দিতে পারেনি। গতবৎসর সে-চেষ্টা করতে গিয়ে আমরা কি ভীষণভাবে হেরে গেছি, সে-খবর তো তোমরা সবাই জানো।

এই হলো গিয়ে পিঁপড়েদের দক্ষিণ-আমেরিকা অধিকারের ইতিহাস। মানুষ অবশ্য নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে নেই। সামান্য কীটের হাতে এই লাঞ্ছনার শোধ নেওয়ার জন্যে পৃথিবীর বড়-বড় বৈজ্ঞানিক এখন মাথা ঘামাচ্ছেন। কিন্তু শিগ্‌গির যে আমরা দক্ষিণ-আমেরিকা ফিরে পাবো, তারও বড় আশা নেই; কারণ যে অদ্ভুত আলোয় তারা অমন ক'রে মানুষকে অন্ধ ক'রে দেয়, তার রহস্য এখনো আমাদের বৈজ্ঞানিকেরা বুঝতে পারেননি।

পিঁপড়েদের আমেরিকা-অধিকারের ইতিহাস পাঁচবছর আগে সংক্ষিপ্তভাবে কাগজে বের হয়। তারপর সেই বিবরণ পড়ে অনেকে কৌতূহলী হয়ে আরো অনেক কথা জানতে চেয়েছেন। কিন্তু

তাঁদের কৌতূহল চরিতার্থ করবার কোনো সুবিধা হয়নি। কারণ এতদিন পিঁপড়েদের সম্বন্ধে ওর বেশি কিছু জানা ছিল না। পিঁপড়েদের সম্বন্ধে বিশদভাবে সন্ধান করা তো দূরের কথা, মানুষ সেবার পিঁপড়েদের আক্রমণে দক্ষিণ-আমেরিকা থেকে পালাবারই পথ পায়নি! পিঁপড়েরা কেমন ক'রে এই বিপুল শক্তি অর্জন করেছে, তাদের রাষ্ট্রসমাজের গঠন কেমন, তারা দক্ষিণ-আমেরিকাকে কিভাবে এখন গড়ে তুলেছে, তার কোনো বিবরণই মানুষের জানবার কোনো সুযোগ হতো না—যদি না···

···যদি না ভারতীয় জাহাজ 'যমুনা'র সমস্ত নাবিক আর যাত্রী একটি দুরন্ত ডান্‌পিটে ছেলের দৌরাত্ম্যে অস্থির হয়ে উঠতো। একটি ছেলের দৌরাত্ম্যের সঙ্গে দক্ষিণ-আমেরিকার পিঁপড়েদের বিবরণ-সংগ্রহের সম্বন্ধ কোথায়, তা প্রথমে বোঝা একটু কঠিন বটে। ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার ক'রেই বলি। ভারতীয় নৌবহরের 'যমুনা' জাহাজটি সেবার ফিলিপাইনের পূর্ব-উপকূল হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জের একটি ছোটো দ্বীপের দিকে যাচ্ছিল। দ্বীপটি দক্ষিণ-আমেরিকার কাছাকাছি ও পিঁপড়েদের সঙ্গে যুদ্ধের আয়োজনের প্রধান ঘাঁটি। মাঝ-রাস্তায় ঝড় হয়ে আগেরদিন জাহাজ নির্দিষ্ট পথ থেকে একটু দূরে এসে পড়েছিল, এখন আবার নির্দিষ্ট পথ খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছিল; কিন্তু এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছিল শুধু একটি ছেলের দৌরাত্ম্যে। ছেলেটি 'যমুনা'র ক্যাপ্টেনের, বয়স তার মাত্র বারো, কিন্তু দুষ্টবুদ্ধি ও সাহসে সে পঁচিশ বছরের যুবককেও হার মানায়। ঝড়ের রাত্রে সবাই যখন জাহাজ ও নিজেদের সামলাতে ব্যস্ত, এমন সময় দেখা গেল, ছেলেটি জাহাজের দু'টিমাত্র লাইফবোটের একটি খুলে ঝড়ের সমুদ্রে নামিয়ে দিয়ে বসে আছে। ঝড় থেমে যাওয়ার পর হঠাৎ ছেলেটির খোঁজ পাওয়া যায় না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর দেখা গেল যে, সবচেয়ে বড় মাস্তুলের আগায় উঠে সে বসে আছে। নামিয়ে এনে ধমক দেওয়ায় সে বললে—'আমি নতুন দেশ আবিষ্কার করছিলাম।'

ঝড়ের পরের দিন রাত্রে হঠাৎ মাঝ-সমুদ্রে বারবার জাহাজ থেকে সার্চলাইট জ্বলতে দেখে দু'-একজন যাত্রী এসে ক্যাপ্টেনকে কারণ জিজ্ঞেস করলে। ক্যাপ্টেন তো অবাক! মাঝ-সমুদ্রে—যেখানে অন্য কোনো জাহাজের নামগন্ধ নেই, সেখানে সার্চলাইট জ্বালবার মানে কি? কোন্ নাবিক এরকম করছে, তার সন্ধান নিয়ে তাকে শাসন করবার জন্যে সার্চলাইট-টাওয়ারে গিয়ে ক্যাপ্টেন দেখেন যে, তাঁর ছেলেটি পরমানন্দে সার্চলাইট জ্বালিয়ে সমুদ্রের এধার থেকে ওধার বুলিয়ে বেড়াচ্ছে। তিনি কান ধ'রে তাকে শাসন করতে যাবেন এমন সময়ে চকিত সার্চলাইটের আলোকে একটি জিনিস তাঁর চোখে পড়ায় তিনি ছেলেকে শাসন করার কথা ভুলে নিজেই সার্চ-লাইট ধরে বসলেন।

সে-আলোয় যা দেখা গেল, তাতে বিস্মিত হওয়াই স্বাভাবিক। দেখা গেল যে, জাহাজ থেকে শ'দুয়েক গজ দূরে একটি ছোট্ট ভেলা সমুদ্রের ওপর দুলছে। তার ওপর আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা একটি অর্ধ-উলঙ্গ মানুষের দেহ। মানুষটি বেঁচে আছে কিনা, বোঝা যায় না।

তৎক্ষণাৎ তিনি নৌকো নামিয়ে ভেলাটি ধরে আনবার আদেশ দিলেন। আর তার ফলেই সেই ভেলাতে বাঁধা লোকটির অর্থাৎ দক্ষিণ-আমেরিকার পিঁপড়েদের ইতিহাস যে একটিমাত্র লোকের জানা ছিল, তাঁর উদ্ধার হলো।

তিনি সুখময় সরকার। দক্ষিণ-আমেরিকা থেকে মানুষ পালিয়ে আসার পর পাঁচবছর তিনি সে-দেশে কাটিয়েছেন পিঁপড়েদের সঙ্গে। আর মানুষের ভেতর একা তিনিই তাদের সমস্ত ব্যাপার জেনে জীবিত-অবস্থায় মানুষের দেশে আবার ফিরতে পেরেছেন। পিঁপড়েদের সঙ্গে তাঁর বাসের কাহিনী তিনি নিজমুখে যা বলেছেন, তা-ই আমরা এখানে উদ্ধৃত ক'রে দিলাম। রায়ো-ডি-জানেইরো'র পতনের দিন তিনি নগরের ভেতর একটি ল্যাবরেটরিতে গবেষণায় অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন। এমন সময় অযুত মানুষের আর্তনাদ তাঁর কানে এসে পৌঁছোয়। এখান থেকেই তাঁর বর্ণনা আরম্ভ হয়েছে—

"প্রথমে মনে হলো, আমাদের সৈন্যেরা বুঝি যুদ্ধজয় করেছে, তাই এই জয়ধ্বনি; কিন্তু পরমুহূর্তেই বুঝতে পারলাম—না, এ-তো আনন্দধ্বনি নয়, এ যেন সহস্র-কণ্ঠের আর্তনাদের মতো শোনাচ্ছে। এ-শব্দ শুনলে গায়ের ভেতর যেন কাঁটা দিয়ে ওঠে।

"তাড়াতাড়ি কী ব্যাপার দেখবার জন্যে নগর-প্রাচীরের কাছে গেলাম; কিন্তু ওপরে আর উঠতে হলো না। দূরে তোরণের ভেতর দিয়ে দেখি—অন্ধের মতো হাতড়াতে-হাতড়াতে কয়েকজন সৈন্য এগিয়ে আসছে। তাদের চলবার ভঙ্গি দেখে সত্যিই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম; কিন্তু বিস্ময়ের সময় বেশি ছিল না। তাদের পেছন-পেছনই দেখি—অগুনতি কালো-পিঁপড়ের দল তাদের তাড়া ক'রে আসছে। অসহায় সৈন্যদের পিঁপড়েদের আক্রমণ প্রতিরোধ করবার কোনো ক্ষমতাই নেই। তারা এলোপাথাড়িভাবে হাত-পা ছুঁড়ছে, কিন্তু পিঁপড়েরা অনায়াসে তাদের আঘাত এড়িয়ে একেবারে তাদের মর্মস্থলে ঘা দিচ্ছে।

"নগর-তোরণ পার হয়ে যে-কয়জন এসেছিল, তাদের কেউই শেষপর্যন্ত রক্ষা পেলে না, একজনমাত্র সৈন্য প্রাণপণ বেগে ছুটে পিঁপড়েদের পেছনে ফেলে আমার কাছ-পর্যন্ত এসে পড়েছিল। পিঁপড়েরা তখন আমাদের ধরে-ধরে। পিঁপড়েদের হাতে প্রাণ দেওয়া ছাড়া আর কোনো গতি নেই, বুঝতে পারছিলাম।

"সেইজন্যে প্রস্তুত হচ্ছি, এমন সময় মনে হলো, বৈজ্ঞানিকের মৃত্যু এভাবে হওয়া উচিত নয়। মরতে যদি হয়, তো নিজের পরীক্ষাগারের ভেতর নিজের গবেষণা করতে করতেই মরবো। তা ছাড়া যে-পরীক্ষাটি অসমাপ্ত রেখে এসেছি, পরীক্ষাগারের সকল দরজা-জানলা বন্ধ ক'রে পিঁপড়েদের গতিরোধ করলে তা সমাপ্ত করবার সময়ও হয়তো পেতে পারি।

"তাড়াতাড়ি সেইদিকে ছুটছিলাম। সঙ্গে-সঙ্গে মনে হলো, এই সৈন্য-বেচারীকেও তো আমার সঙ্গে নিতে পারি। পেছন ফিরে বললাম—'আমার পিছু-পিছু এস! খানিকটা নিরাপদ হতে

পারবে। কিন্তু সে আমার গলার আওয়াজ শুনে ভড়কে যেভাবে চারিদিকে তাকাতে লাগলো, তাতে মনে হলো, আমি যেন অদৃশ্য কোনো একটা পদার্থ। বললাম—'হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে দেখছো কি? এস আমার সঙ্গে।'

'কিন্তু আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।'

"এ-কথার অর্থ কিছুই বুঝতে পারলাম না; কিন্তু তখন সে-কথা আলোচনা করবার সময় নেই। তাড়াতাড়ি তার হাত ধরে ছুটতে-ছুটতে যখন পরীক্ষাগারে এসে পড়লাম, তখন দুটো পিঁপড়ে আমাদের পিছু-পিছু এসে প্রায় ধরে ফেলেছে। সৈন্যটিকে ঘরের ভেতর ঠেলে দিয়ে নিজে ঢুকে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ ক'রে দিলাম। তারি ভেতর কিন্তু একটা পিঁপড়ে ইতিমধ্যে আধখানা শরীর ভেতরে ঢুকিয়ে ফেলেছিল। দরজার চাপে তার মুণ্ডুটা ছিঁড়ে আমার ঘরের মধ্যে পড়লো।

"দরজাটা দিয়ে আমার মনে হলো, যাই হোক—এখন কিছুক্ষণের জন্যে নিরাপদ হওয়া যাবে। পরীক্ষাগারের সমস্ত জানলা আগে-থেকেই বন্ধ ছিল। পিঁপড়েরা ভেঙে না ঢোকা পর্যন্ত নিশ্চিন্তভাবে কাজ করা যাবে।

"এইবার আমার সঙ্গে যে সৈন্যটি এসেছিল, তার দিকে ফিরে বললাম—'মাটির ওপর যুদ্ধ, তাতেও পিঁপড়েদের কাছে পারা গেল না—কি তাদের এমন ভয়ানক অস্ত্র-শস্ত্র!'

"লোকটা মেঝের ওপর মাথা নিচু ক'রে বসে ছিল। আমার দিকে চোখ তুলে চাইতেই ঘরের আলোয় তার চোখের দিকে চেয়ে শিউরে উঠলাম—চোখের তারার জায়গায় তার রগ্‌রগে একটা ক্ষত।

"তারপর তিনদিন পরীক্ষাগারের ভেতর বন্দী হয়ে আছি। সৈন্যটির কাছে যুদ্ধে আমাদের বাহিনীর যে-দুর্দশার কাহিনী শুনলাম, তারপর আর কোনো কাজ করতে ইচ্ছে হয়নি। শুধু শান্তভাবে মানুষের নতুন-জেতাদের হাতে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছি। এখনো কেন যে পিঁপড়েরা আমাদের ধরবার চেষ্টা করেনি, তা বুঝতে

পারছি না। আমাদের দরজায় তো সারাক্ষণই প্রহরীর মতো একটি পিঁপড়ে মোতায়েন আছে, দেখতে পাচ্ছি চাবির ফুটোর ভেতর দিয়ে। জানলাগুলো দিয়েও সারাক্ষণই একটা-না-একটা পিঁপড়ে উঁকি দিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমরা এখনো অক্ষতদেহে বেঁচে আছি। যারা অজ্ঞাত-আলো দিয়ে মানুষকে অন্ধ করবার বিদ্যা আয়ত্ত করেছে, তারা একটা সামান্য দরজা ভেঙে ঢুকতে পারে না, এমন কথা অবশ্য মনেও স্থান দিইনি। তবুও এদের মতলব কী, বুঝে উঠতে পারছি না।

"চতুর্থ দিন কিন্তু সব দুর্ভাবনার শেষ হলো। পরীক্ষাগারের ভেতর যা সামান্য খাবার-দাবার ছিল তা এ-ক'দিনে আমরা নিঃশেষ ক'রে ফেলেছি। সকাল থেকেই বুঝতে পারছিলাম যে, পিঁপড়েরা না মারলেও উপবাসেই কয়েকদিনের ভেতর আমাদের মরতে হবে। পিঁপড়েদেরও সেই মতলব আছে কিনা, বলতে পারি না। এমন ক'রে নিশ্চেষ্টভাবে মৃত্যুর জন্যে প্রতীক্ষা করাও অসহ্য। ভাবলাম, বৈজ্ঞানিকের মৃত্যু তার যন্ত্র হাতে নিয়েই হোক। যে-সাধনা আজীবন ক'রে এসেছি, মরবার সময় যেন তারই মধ্যে মগ্ন হয়ে থাকতে পারি। এই ভেবে যন্ত্রপাতি নিয়ে নিজের গবেষণায় মন দিয়েছি, এমন সময় দেখি—বন্ধ দরজার কঠিন লোহার মতো কাঠ, কী অস্ত্রে জানি না, একেবারে মাখনের মতো কেটে যাচ্ছে। চারিধার কাটা হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে দরজাটা সশব্দে ভেতরে পড়ে গেল। অন্ধ সৈনিকটি সে-শব্দে চমকে ভীত হয়ে একধারে সংকুচিত হয়ে গিয়ে লুকোল। আমিও ভয়ঙ্কর মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালাম।

"এক-এক ক'রে প্রায় ছ'টি বৃহদাকার পিঁপড়ে আমাদের ঘরে ঢুকলো। তাদের এত কাছ থেকে নজর করবার কোনো সুবিধা এত-দিন হয়নি। লক্ষ্য করলাম—একজনের ছাড়া তাদের বাকি সকলের আকৃতি এক। একজনের মাথার আকারটা একটু বৃহত্তর এবং মুখের শুঁড়গুলির রঙও একটু আলাদা। কোনোপ্রকার শব্দ বা সংকেত শুনতে বা দেখতে না পেলেও বুঝতে পারলাম যে, তারই আদেশে

সব কাজ হচ্ছে। পিঁপড়েদের সর্দার ধীরে-ধীরে আমার কাছে এগিয়ে এসে হঠাৎ পেছনের পায়ে ভর দিয়ে, টেবিলের নিকট খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে, আমার পরীক্ষার যন্ত্রপাতির ওপর ঝুঁকে পড়ে কী দেখলে ও কী বুঝলে, সেই-ই জানে। আমার পাশেই সেই কদাকার লোমশদেহ কীটটাকে দেখে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে, এরাই মানুষের মতো প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটন ক'রে মানুষের সঙ্গে বুদ্ধির প্রতিযোগিতায় নেমেছে। ইচ্ছে হচ্ছিল, এক-চাপড়ে এই ঘৃণ্য-কীটটার ভবলীলা সাঙ্গ ক'রে দিই। সে-ইচ্ছা দমন করেই অবশ্য রেখেছিলাম, কিন্তু শেষপর্যন্ত আর থাকতে পারলাম না! এই অতিকায় পিঁপড়েদের গা থেকে এমন একটা উৎকট দুর্গন্ধ বের হয় যে, সে-দুর্গন্ধ সহ্য করা কঠিন। পিঁপড়েটা আমার অতি-নিকটে ঘেঁসে দাঁড়িয়েছিল, দুর্গন্ধ সহ্য করতে না পেরে তাকে ঠেলে দিলাম। ঠেলা যে বিশেষ জোরে হয়েছিল, তা নয়, কিন্তু সেই সামান্য ঠেলাতেই সে চারপাক খেয়ে ঘুরে একেবারে বহুদূরে ছিট্‌কে গিয়ে পড়লো। মনে হলো এবার আর নয়। এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে এদের আর বিলম্ব হবে না। কিন্তু কী আশ্চর্য! তাদের দলপতির এই অপমানে কোনো পিঁপড়েকেই একটুও বিচলিত হতে দেখলাম না। ব্যাপারটা যেন কিছুই নয়। তারা যেমন নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছিল, তেমনিই দাঁড়িয়ে রইলো। দলপতিও খানিক বাদে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়লো। দেখলাম, তার সামনের একটা পা ঐ সামান্য পড়াতেই ভেঙে গিয়েছে।

"দলপতি খাড়া হয়ে উঠেও কোনোপ্রকার প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করলে না দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে গেলাম। তাহলে এরা কী করতে চায়? কী এদের মতলব? কিন্তু সে-কথা ভাববার অবসর বেশি পেলাম না।

"হঠাৎ মনে হলো, আমার পা-গুলো ধীরে-ধীরে যেন অবশ হয়ে যাচ্ছে। সেই অবশতা পা থেকে ক্রমশ আমার দেহের ওপরদিকে উঠতে আরম্ভ করলো। সে-অবশতার ভেতর কোনো কষ্ট অনুভব



পিঁপড়েদের সর্দার···হঠাৎ পেছনের পায়ে ভর দিয়ে···

করছিলাম না। শুধু মনে হচ্ছিল, শরীরটা ভয়ানক ক্লান্ত হয়ে এসেছে—এখন যেন একটু কোথাও গড়াতে পারলেই বেঁচে যাই। কিন্তু মিনিটখানেকের ভেতর যখন হঠাৎ মনে হলো যে, আমার দৃষ্টি, শ্রবণ, স্পর্শ—সমস্ত শক্তিই লোপ পেয়ে আসছে, তখন ভয়ঙ্কর ভীত হয়ে উঠলাম—একি ব্যাপার! এই কি মৃত্যু নাকি? ধীরে-ধীরে জ্ঞান লোপ পাচ্ছিল। এই আচ্ছন্ন-ভাবের বিরুদ্ধে সমস্ত মনের জোর দিয়ে যুদ্ধ করেও সজ্ঞান থাকতে পারছিলাম না। সমস্ত দেহ অসাড় হয়ে জ্ঞান হারিয়ে নেতিয়ে পড়বার আগে এই আকস্মিক অবশতার কারণ বুঝতে পারলাম। স্পষ্টভাবে দেখলাম, প্রহরী পিঁপড়েদের একজনের ছ'টি সামনের পায়ে একটি রেডিও-সেটের মতো ছোট যন্ত্র রয়েছে। তার সামনের দিক থেকে একটা পিচকারির মতো নল উঁচিয়ে আছে, আর সেই নল দিয়ে একরকম বাষ্প এসে আমায় আচ্ছন্ন ক'রে ফেলছে। এতক্ষণ সেদিকে লক্ষ্য পড়েনি, তার কারণও ছিল—সে-বিষবাষ্প বাতাসের মতোই বর্ণগন্ধহীন।

"জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে মনে হলো, আমি যেন কোন্ অতলে নেমে চলেছি। চারিদিকে অন্ধকার—গাঢ় অন্ধকার! প্রথমে মনে হলো, এই কি মৃত্যুর পরের অবস্থা! পরের মুহূর্তেই একটি উৎকট দুর্গন্ধ নাকে যাওয়ায় সে-ভয় দূর হয়ে গেল। উৎকট দুর্গন্ধও যে মানুষের মনে আনন্দ দিতে পারে, আগে তা কখনো ভাবিনি। এখন এই দুর্গন্ধ থেকে বুঝলাম যে, আমি বেঁচেই আছি—যদিও পিঁপড়েদের বন্দী। হাত বাড়িয়ে একটি পিঁপড়ের ঠাণ্ডা-গা স্পর্শ পর্যন্ত করলাম! অনেকদূর এই অন্ধকার দিয়ে নেমে গিয়ে হঠাৎ আলো চোখে পড়ল। অনেকটা আমাদের ইলেকট্রিক আলোর মতো; কিন্তু সেই আলো-গুলির চারিধারে কোনো কাচের আবরণ নেই, বৈদ্যুতিক-শক্তিতেও তা জ্বলে না। পাথরের মতো এক-একটি নুড়ি নানাজায়গায় ছড়ানো, তা থেকেই এই আলো বের হয়। পরে জেনেছি, এই আলো-বিজ্ঞানে পিঁপড়েরা মানুষকে অনেকদূর ছাড়িয়ে গেছে। তাপহীন যে-আলো আবিষ্কার করবার চেষ্টায় মানুষের বিজ্ঞান এখনো অক্ষম, পিঁপড়েরা

তাই বের করেছে। সেই আলোর ওপরদিকে একটি অন্ধকার সুড়ঙ্গ চোখে পড়ল, তার মাঝখান দিয়ে তামার একটি 'রড' বসানো। সেই 'রড' বেয়েই আমাদের লিফ্‌টের মতো ঘরটি নেমে এসেছে। বুঝলাম, পৃথিবীর ওপরের স্তর থেকে নেমে একরকম পিঁপড়েদের পাতালেই নেমে এসেছি। বড়-বড় খনিতে যেমন দেখা যায়, এখানেও তেমনি —চারিধারে অনেক সুড়ঙ্গ চলে গেছে। সেই সুড়ঙ্গের পথ দিয়ে অসংখ্য পিঁপড়ে যাতায়াত করছে। সমস্ত সুড়ঙ্গ-পথটি আলোকিত। সে-আলো এত উজ্জ্বল যে, দিন বলে ভ্রম হয়।

"আমার জ্ঞান হলেও হাত-পা তখনো অবশ। আমাকে ঠেলাগাড়ির মতো একটা গাড়িতে পিঁপড়েরা চাপিয়ে দিলে। ভাবলাম, তারা বুঝি ঠেলেই কোথাও নিয়ে যাবে; কিন্তু ছেড়ে দেওয়ামাত্র গাড়িটি আপনা-থেকেই চলতে আরম্ভ করলো। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, গাড়িটিতে না আছে বাষ্পের ইঞ্জিন, না আছে মোটর! প্রথমে এই গাড়ি পিঁপড়েদের বিজ্ঞানের আর-এক কীর্তি বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু পরে এ-গাড়ির রহস্য জানতে পেরে না-হেসে থাকতে পারিনি। গাড়িটি আমাদের ঘোড়ার গাড়ির জাতভাই, শুধু ঘোড়ার বদলে এ-গাড়ি যারা টানে, তাদের নাম শুনলে বিস্মিত হবে। এ-গাড়ির বাহন গণেশের বাহনের মতো বড়-বড় মেঠো ইঁদুর। অতিকায় পিঁপড়েরা এই একটিমাত্র জানোয়ারকে বশ করেছে ও কাজে লাগিয়েছে। মাটির তলায় আর কোন্ জানোয়ারই বা তাদের কাজে লাগতে পারে। এই ইঁদুরগুলিকে কিন্তু কি আশ্চর্যরকম শিক্ষিত তারা করেছে, চোখে না দেখলে তা বিশ্বাস হয় না। মানুষ অনেক জানোয়ার বশ করেছে, কিন্তু পিঁপড়েদের ইঁদুর-বাহনেরা যেভাবে—যেরকম বুদ্ধি খাটিয়ে মনিবদের কাজ করে, মানুষের বশ-করা কোনো জানোয়ারকে তো সেরূপ করতে দেখিনি। এই ইঁদুর দিয়েই পিঁপড়েরা তাদের ছোট-খাটো সমস্ত কাজ করায়। পিঁপড়েদের গাড়ির তলায় প্রায় গুটি-বিশেক ইঁদুর জোতা থাকে। ওপর থেকে তাদের দেখা যায় না। আদেশ পাওয়ামাত্রই তারা শিক্ষিত ঘোড়ার মতো গাড়িটি টেনে

নিয়ে যায়। আর গাড়ির বেগও বড় কম হয় না। মজার কথা এই যে, এই মুষিকদের কোনো চালকের প্রয়োজন হয় না, তারা নিজেরাই যেন জানে যে, কোথায় থামতে হবে! অন্তত আমার বেলা তো তাই হলো। একজায়গায় গিয়ে গাড়ি থেমে গেল। সেখানে পিঁপড়েরা যে-ভাবে আমায় নামিয়ে নিয়ে গেল, তাতে বুঝলাম—তারা আমার আসার কথা আগে-থেকেই জেনে প্রস্তুত হয়ে ছিল। আমাকে তারা যেখানে নিয়ে গেল, সেটি একটি প্রকাণ্ড হলঘরের মতো জায়গা। সুড়ঙ্গটি এখানে চওড়া হয়ে এই আকার নিয়েছে। পিঁপড়েদের নিজস্ব ঘর বলে কিছু নেই। তারা অনেকে মিলে এমনি এক-একটি হল-ঘরে দরকার হলে এসে বিশ্রাম ও আহারাদি করে। আমাকে হল-ঘরের একটি কোণে এনে তারা শুইয়ে দিলে। তখন আমার ক্ষুধায়-তৃষ্ণায়-ক্লান্তিতে শরীরের এমন অবস্থা যে, একটু গড়াতে পারলেই বাঁচি। আমি সেখানে কাত হয়ে পড়লাম। ক'দিন ধরে অজ্ঞান ছিলাম, জানি না। অত্যন্ত ক্ষুধা ও তৃষ্ণা পেয়েছিল, কিন্তু সেকথা জানাবোই বা কাকে এবং জানালেই বা কী হবে! আমার বন্দিজীবন সেইদিন থেকেই আরম্ভ হলো।

"কিন্তু আমি না জানলেও পিঁপড়েরা মানুষের ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা ভোলেনি, দেখা গেল। পিঁপড়েদের ইঁদুর-ভৃত্যের কথা তখনো জানি না। হঠাৎ বড়-বড় গুটি-চার-পাঁচ ইঁদুরকে আমার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে আমি আঁত্‌কে উঠলাম। ইঁদুরগুলি কিন্তু কোনো-রকমে বিচলিত না হয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। তাদের প্রত্যেকের মুখে একটি ক'রে জিনিস। সেগুলি নামিয়ে রেখে তারা আবার চলে গেল। সে-জিনিসগুলি যে আহার্য, প্রথমে তা বুঝতে পারিনি, কৌতূহলভরে সেগুলি নেড়ে-চেড়ে দেখতে-দেখতে একটা জিনিস যেন মুলোর মতো মনে হলো। তখন আর ভাববার অবসর ছিল না। অন্য জিনিসগুলি বাদ দিয়ে সেই মুলোর মতো জিনিসটাতে এক কামড় দিলাম। জিনিসটা কোনো গাছের মূলই বটে, কিন্তু স্বাদ তার মুলোর মতো নয়। স্বাদ যে বিশেষ ভালো, তাও বলতে পারি

না ; কিন্তু সেদিন তাই-ই অমৃতের মতো লেগেছিল। জিনিসটা রসাল, ক্ষুধা-তৃষ্ণা দুই-ই তার দ্বারা কতকটা নিবৃত্ত হলো। খাওয়ার পর ক্লান্তিতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম, বলতে পারি না।

"তারপর পিঁপড়েদের সঙ্গে যে পাঁচবছর কাটিয়েছি, তার বিস্তৃত-বিবরণ দেওয়া সম্ভবপর নয়। অবশ্য একথা জানি যে, বিশদভাবে জানালেও সেই দীর্ঘ-বিবরণ একঘেয়ে লাগবে না। কারণ প্রত্যেক-দিনই ঐ অদ্ভুত জাতের যে-সব নতুন-নতুন ব্যাপার আমি জানতে পেরেছি, মানুষের জ্ঞানের দিক থেকে তার প্রত্যেকটিই চমকপ্রদ! আপাতত সংক্ষেপে পিঁপড়েদের সমাজগঠন প্রভৃতি জানাবার চেষ্টা করবো। কেমন ক'রে পিঁপড়েরা ধীরে-ধীরে আমায় একটু-একটু স্বাধীনতা দিতে শুরু করলে, কেমন ক'রে পিঁপড়েদের নানা ব্যাপার জানবার সুযোগ আমার হলো, কেমন ক'রে শেষপর্যন্ত আমার সেখানে একরকম প্রভাব-প্রতিপত্তি পর্যন্ত হলো, তার বিশদ বর্ণনা আমি করবো না, শুধু পিঁপড়েদের সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে প্রথম যা প্রয়োজন—অর্থাৎ তাদের ভাষা-শিক্ষা—কেমন ক'রে তা আমার হলো, তাই একটু জানাবো।

"পিঁপড়েরা আমায় তখন স্বাধীনতা দিয়েছে। আমি যেখানে-সেখানে বেড়িয়ে বেড়াই, সময়মতো আহার পাই ও নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোই। চোখ দিয়ে দেখে যেটুকু বোঝবার, তার বেশি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারি না। পিঁপড়েদের কোনোদিন শব্দ করতে শুনিনি। তারা কি ক'রে নিজেদের মধ্যে আলাপ করে, কি ক'রে কাজ চালায়, এই ভেবে আমার বিস্ময় লাগে। এমন সময় একদিন কয়েকটি পিঁপড়ে আমার ঘুম-ভাঙার পর আমার বিশ্রাম-স্থানে এসে হাজির হলো। তাদের ভেতর একটি পিঁপড়ের মাথাটি অত্যন্ত বৃহৎ, দেখে বুঝলাম যে, সে সর্দার-টর্দার হবে। বিস্তীর্ণ সেই সুড়ঙ্গ-ঘরের নানা-জায়গায় তখন অন্যান্য পিঁপড়েদের কেউ ঘুমোচ্ছে, কেউ সবে জেগে উঠেছে। বড়-মাথাওয়ালা পিঁপড়েটা আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ কী দেখলে, সে-ই জানে। দেখলাম, তার মুখটা

নড়ছে, কিন্তু কোনো শব্দ সেখান থেকে শুনতে পেলাম না। অনেকক্ষণ এইভাবে দাঁড়িয়ে থেকে সে কী আদেশ করলে জানি না, কিন্তু একটি পিঁপড়ে একটি ছোট গ্রামোফোনের সাউণ্ড-বক্সের মতো যন্ত্র নিয়ে আমার কাছে এগিয়ে এলো। সামনের দু'পা দিয়ে সেই যন্ত্রটি সে হঠাৎ আমার কানে লাগিয়ে দিলে। আমি প্রথমত প্রতিবাদ ক'রে যন্ত্রটি ফেলে দিতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু পরে অনিষ্ট করবার উদ্দেশ্যে এতদিন বাদে তারা নিশ্চয়ই আসেনি, জেনে চুপ ক'রে সব সহ্য করলাম। যন্ত্রটা পরাবার সময় কানে প্রথমটা একটু লাগল, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো, যেন চারিধারে অদ্ভুত কোনো শব্দ শুনছি। প্রথমটা বুঝতে পারলাম না বটে, কিন্তু পরক্ষণেই সামনের দিকে চেয়ে বড়-মাথাওয়ালা পিঁপড়েকে মুখ নাড়তে দেখে সমস্ত রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেল। এতক্ষণ হঠাৎ তার মুখ থেকে শব্দ শুনতে পেলাম। তার মানে অবশ্য বুঝতে পারলাম না বটে, কিন্তু এতদিনে পিঁপড়েদের কথা শুনতে পাওয়ার আনন্দেই তখন আমি বিভোর। মনের আনন্দে নিজেই 'সাবাস ভাই' বলে ফেলেছিলাম। দেখলাম, আমি কথা বলা মাত্র পিঁপড়েটা অমনি এক-প্রকার যন্ত্র তার নিজের কানে লাগালো। বুঝলাম, আমাদের শব্দও সে এইভাবে শোনবার চেষ্টা করছে। পিঁপড়েটা তারপর বহুক্ষণ কথা কইল, কিন্তু তার শব্দ শুনতে পেলেও অর্থ বুঝতে না পেরে মনে হচ্ছিল, এমনভাবে শব্দ শুনতে পেয়েই বা লাভ কি? কিছুক্ষণ বাদে পিঁপড়েটি নিজে থেকেই তাদের ভাষা আমায় শিক্ষা দেওয়ার উপায় ক'রে নিলে। রাত্রের আহার্যের কিছু-কিছু তখনো আমার শয্যাপার্শ্বে পড়ে ছিল, সেই-দিকে একটা পা বাড়িয়ে সে একটা শব্দ করলে, আমিও সঙ্গে-সঙ্গে বললাম—'খাবার।' পিঁপড়েটা পূর্বের মতো শব্দ আর কয়েকবার ক'রে আমায় বুঝিয়ে দিলে যে, খাবারের প্রতিশব্দ পিঁপড়েদের ভাষায় কী হয়।

"এরপর পিঁপড়েদের ভাষা-শেখা আমার খুব তাড়াতাড়িই হতে লাগলো। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সেই বড়-মাথাওয়ালা পিঁপড়েটা

আমার সঙ্গে-সঙ্গে থেকে আমায় কয়েক মাসের মধ্যেই এমন তালিম ক'রে তুললে যে, তাদের ভাষা শুধু বোঝা নয়, কতকটা বলতে পর্যন্ত আমি পারলাম! এখন থেকে পিঁপড়েদের বিস্তারিত-বিবরণ-সংগ্রহ আমার পক্ষে সম্ভবপর হলো।

কানের যে-যন্ত্রের দ্বারা পিঁপড়েদের ভাষা আমি বুঝলাম, তার এবং কেন পিঁপড়েদের শব্দ মানুষ শুনতে পায় না, সে-বিষয়ের একটু ব্যাখ্যা এখানে প্রয়োজন। তোমরা জানো কি না জানি না যে, মানুষের কান দিয়ে আমরা যে-শব্দ শুনতে পাই, তা ছাড়া আরো অনেক শব্দ পৃথিবীতে হচ্ছে। সে-শব্দ এত বেশি তীব্র যে, আমাদের কান তা ধরতেই পারে না। আবার অত্যন্ত ধীর-শব্দও আমরা স্বাভাবিক কান দিয়ে ধরতে পারি না। আমরা যে-শব্দ শুনি, তা মাঝামাঝি আওয়াজ; কিন্তু অতিকায় পিঁপড়েদের আর কিছু না থাক, গলার আওয়াজ এমন প্রচণ্ড যে, মানুষের কান তা ধরতেই পারে না। তাই পিঁপড়েদিগকে আমাদের বোবা বলেই মনে হতো। আমাদের শব্দ করার শক্তি পিঁপড়েদের মতো প্রচণ্ড নয় বলে আমাদের শব্দও পিঁপড়েদের কানে যেত না। যে-যন্ত্র পিঁপড়েরা আমার কানে পরিয়ে দিয়েছিল, সেটিকে শব্দশোধন-যন্ত্র বলা যেতে পারে। তার ভেতর দিয়ে পিঁপড়েদের চড়া-শব্দ নরম হয়ে আমাদের কানের উপযোগী হয়ে যায় বলেই আমি তাদের কথা শুনতে পেয়েছিলাম। আবার আমার মৃদু-শব্দও তাদের কানের মতো চড়া ক'রে নেওয়ার জন্যে পিঁপড়েরা নিজেদের কানে অন্যরকম যন্ত্র ব্যবহার করেছিল। সেদিন থেকে সেই যন্ত্রের সাহায্যেই আমাদের কথাবার্তা চলতে শুরু হয়। আমাদের কানের এই রহস্য বুঝে যে বৈজ্ঞানিক পিঁপড়ে এই যন্ত্র আবিষ্কার করে—শত্রু হলেও তাকে প্রশংসা না ক'রে থাকা যায় না।

"পিঁপড়েদের সমাজ প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষ-কিছু বলবার নেই। সাধারণ ছোট পিঁপড়েরা কীভাবে বাস করে, তা বোধহয় তোমরা জানো। তাদের ভেতর একজন থাকে রানী। সে-ই ডিম পাড়ে ও

তার ডিম থেকেই সমস্ত পিঁপড়ের জন্ম হয়। দু'-একটি পুরুষ-পিঁপড়ে ছাড়া আর বাকি সমস্তই পিঁপড়ের রাজ্যে শ্রমিক, তারা রানীর জন্যে খেটে মরে মাত্র। অতিকায় পিঁপড়েদের সমাজ-ব্যবস্থা প্রায় এই-রকমই, শুধু তাদের ভেতর কোনো রানী নেই। তাদেরও অধিকাংশ পিঁপড়ে শুধু দাসবৃত্তি ক'রে জীবন কাটায়—তাদের না আছে ঘর, না আছে স্ত্রী-পুত্র। কিন্তু তাদের ওপরে একদল পিঁপড়ে থাকে, পালন, শাসন প্রভৃতি সমস্ত কাজ তারাই করে। তারা পিঁপড়েদের রাজবংশ। তারা অনেকটা মানুষের মত স্ত্রী-পুত্র নিয়ে পরিবার বেঁধে থাকে। যা-কিছু বৈজ্ঞানিক গবেষণা, রাজ্য-পরিচালনা, যুদ্ধে নেতৃত্ব —তাদের দ্বারাই হয় এবং তাদেরই ছেলেপুলেদের ভেতর যাদের বুদ্ধি অল্প ও ক্ষমতা কম, তাদের ছেলেবেলা থেকেই দাস ক'রে দেওয়া হয়। দাস-পিঁপড়েরা বিয়েও করে না, তাদের ছেলেপুলে-সংসারও হয় না। তাই বলে তারা অসন্তুষ্টও নয়—আর তারা উৎপীড়িতও হয় না। পিঁপড়েদের রাজবংশের এক-একটি দম্পতীর ছেলেপুলে হয় অসংখ্য। ডিম ফুটে বেরুবার পরই বৈজ্ঞানিকেরা এসে তাদের পরীক্ষা ক'রে যায় এবং প্রাচীন স্পার্টানদের মতো তাদের ভেতর একেবারে যারা অকর্মণ্য, তাদের মেরে ফেলে, অপেক্ষাকৃত নির্বোধদের দাস ক'রে দিয়ে বাকি শিশু-পিঁপড়েদের ভেতর কার মাথা কোন্‌দিকে খেলবে, আগে থেকে বুঝে সেইদিকে তাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যে পাঠিয়ে দেয়। শিশু-অবস্থাতেই প্রত্যেকের শক্তি-বিচারের বিদ্যায় পিঁপড়েরা যে কতদূর অগ্রসর হয়েছে, মানুষ তা ভাবতেই পারে না। পিঁপড়েদের ভেতর রাজা নেই। অনেকটা আমাদের গণতন্ত্রের মতো। তাদের রাজবংশের মেয়ে-পুরুষ সবাই মিলে একসভায় বসে রাজকার্য পরিচালনা করে। সেখানে বিশেষ মতভেদ বা গোলমাল কখনো হয় না। কারণ, যার মাথা ইঞ্জি-নিয়ারিংএ খোলে, সে কখনো রাজনীতিতে মাথা ঘামাতে আসে না।

"পিঁপড়েদের ভেতর বড়লোক কেউ নেই, গরিবও না। যার যা দরকার, রাজভাণ্ডার থেকে সবাই তাই পায়। একদল পিঁপড়ে শুধু

এই কাজেই আছে। পিঁপড়েরা কেউ কিছু সঞ্চয় করে না, সুতরাং অর্থ নিয়ে মারামারি-কাটাকাটি সেখানে নেই। যে-যার নিজের কাজ করতে পেলেই তারা সন্তুষ্ট।

"কিন্তু জ্ঞানে, বিদ্যায়, সমাজ-গঠনে তারা বিশেষ অগ্রসর হলেও কলাবিদ্যা তাদের নেই বললেই হয়। রাজবংশের পিঁপড়েদের মাঝে-মাঝে কাজের অবসরে একত্র হয়ে নাচের মতো একরকম মজলিশ করতে দেখেছি, এ-ছাড়া গান-বাজনা, ছবি-আঁকা বা চৌষট্টিকলার কোনোটিরই তাদের চর্চা নেই।

"স্নেহ, দয়া, মমতা প্রভৃতি বৃত্তিরও তাদের একান্ত অভাব। তারা শুধু ন্যায়বিচারই জানে। কিন্তু ন্যায়-অন্যায়ের জ্ঞানও তাদের অদ্ভুত।

"এখন কী ক'রে সেখান থেকে পালিয়ে এলাম, সংক্ষেপে তা বলে এ-কাহিনী শেষ করবো।

"পিঁপড়েদের ভেতর পাঁচ বৎসর থেকে তাদের ভাষা শিখে তাদের ভেতর প্রতিপত্তি লাভ করা সত্ত্বেও মানুষের সংসর্গের জন্যে মন আমার অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছিল। শুধু পালানো অসম্ভব জেনেই চুপ ক'রে থাকতাম। একদিন কিন্তু অভাবনীয়রূপে সে-সুযোগ এসে গেল। রায়ো-ডি-জানেইরো'র কাছে প্রায়ই ভূমিকম্প হয়। একদিন হঠাৎ সে-ভূমিকম্প একটু ভীষণভাবে দেখা দিল। ভূমিকম্প হাওয়া-মাত্র পিঁপড়েদের নিয়ম—নিচের গর্ত থেকে ওপরে—মাটির ওপরে বেরিয়ে যাওয়া। আমি যেমন সুড়ঙ্গ দিয়ে নেমেছিলাম, সেরকম সুড়ঙ্গ সেখানে আর প্রায় পঞ্চাশটি আছে। ভূমিকম্প আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সার বেঁধে পিঁপড়েরা দলে-দলে বেরিয়ে পড়তে লাগলো। পিঁপড়েদের দলের সঙ্গে আমিও বেরিয়ে পড়লাম। পিঁপড়েরা ব্যস্ত হতে জানে না—শুধু এই ভূমিকম্পেই তাদের যা বিচলিত হ'তে দেখেছি। এক-একদল ক'রে লিফ্‌টের মতো খাঁচায় ঢুকে আমরা ওপরে উঠে এলাম। অন্যান্য অনেকবার দেখেছি, ওপরে উঠতে-না-উঠতেই ভূমিকম্প থেমে যায়; কিন্তু এবারে ভূমিকম্প অত্যন্ত ভীষণ হয়ে উঠলো। আমাদের দল ওপরে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গেই সুড়ঙ্গ-পথটি

ধ্বসে নিচে পড়ে গেল। চারিদিকে তখন ভীষণ বিশৃঙ্খলা ; প্রতি-মুহূর্তে পায়ের তলার মাটি ধ্বসে পড়তে পারে, জেনে পিঁপড়েরা ব্যাকুলভাবে যেদিকে-সেদিকে ছুটতে শুরু করেছে। আমিও প্রাণ-ভয়ে একদিকে ছুট দিলাম। ভূমিকম্পের সঙ্গে-সঙ্গে আকাশে তখন ভয়ানক ঝড়ও উঠেছে। সেইসঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি। খানিকদূর ছোট-বার পর দেখলাম—চারিধারে কোথাও কোনো পিঁপড়ের দেখা নেই। এতদিন পিঁপড়েদের সঙ্গে বাস ক'রে তাদেরই সঙ্গী ও সহায় বলে ভাববার অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল। প্রথমটা সত্যিই অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেলাম। ভূমিকম্পে তখন নানাজায়গায় মাটি ফেটে আগুন ও ধোঁয়া বেরুতে আরম্ভ করেছে। পিঁপড়েদের ভাষায় চিৎকার ক'রে ডাকলাম। এই মানুষশূন্য-আমেরিকায় একমাত্র পরিচিত পিঁপড়েদের আশ্রয়-চ্যুত হয়ে আমি কোথায় যাবো! কিন্তু পরমুহূর্তেই একটি কথা হঠাৎ মনে হওয়ায় আমার কণ্ঠের ডাক আপনিই থেমে গেল। এই তো মুক্তির সুযোগ! পিঁপড়েরা হাজার ভালো ব্যবহার করলেও চিরদিন আমায় নজরবন্দী ক'রে রাখবে, কোনোদিন মানুষের মাঝে ফিরতে দেবে না। আমি যে তাদের অনেক কথা জানি। হয় মৃত্যু, নয় মুক্তির এই তো সুযোগ! পিঁপড়েদের দেখা পাওয়া নয়, কোনোরকমে তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে পালিয়ে যাওয়াই হলো আমার উদ্দেশ্য, প্রাণপণে তাই ছুটতে লাগলাম।

"ভূমিকম্প যখন থামলো, পিঁপড়েদের ঘাঁটি থেকে তখন আমি অনেক দূর এসে পড়েছি। এইবার আমার খোঁজ পড়বে, জেনে ক্লান্তপদেও আরো এগিয়ে চলতে লাগলাম। আমার একমাত্র মুক্তির উপায় সমুদ্র-তীরে পৌঁছে কোনোরকমে ভেলা তৈরি ক'রে সমুদ্রে ভাসা। সে-সমুদ্রে যদি মৃত্যুও হয়, তবুও ভালো, তবু তো আকাশের তলায় ফাঁকা হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিয়ে মরতে পারবো। ইঁদুরের মতো মাটির নিচে মরতে হবে না।

"কেমন ক'রে সমুদ্রতীরে পৌঁছে ভেলা তৈরি ক'রে ভেসে পড়ে-ছিলাম ও কেমন ক'রে আমার উদ্ধার হয়, তার কথা সব সংবাদপত্রেই

বেরিয়েছে; সুতরাং তার আর পুনরাবৃত্তি ক'রে কাহিনী বাড়াবো না।

"পরিশেষে বলতে চাই যে, মানুষ আবার দক্ষিণ-আমেরিকা অধিকার করবার আয়োজন করছে—কিন্তু আমার সে-আয়োজনের প্রতি আর আস্থা নেই। দক্ষিণ-আমেরিকা অধিকার করা তো দূরের কথা, মানুষের বর্তমান অধিকারগুলি এই দুর্ধর্ষ কীটেদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করাই একদিন আমাদের সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে বলে আমার বিশ্বাস। পিঁপড়েদের আমি যে-রকম ক'রে জানবার সুযোগ পেয়েছি, তাতে এরকম বিশ্বাস আমার সহজেই জন্মেছে।"

—

ময়দানবের দ্বীপ



—সকালে ওয়েদার ফোরকাস্ট দেখে, তারপর বিকেলে সাইক্লোন সিগন্যাল দেওয়া হয়েছে জেনেও এভাবে গোঁয়াতুর্মি ক'রে বেরোনো উচিত হয়নি!

ঝড়ের গর্জন, বৃষ্টির ঝাপট ও জলের উন্মত্ত আলোড়নের শব্দের মাঝে বিজয়ের কথাগুলো ঠিক যেন আর্তনাদের মতো শোনালো।

ওয়েদার ফোরকাস্ট! ওয়েদার ফোরকাস্ট কবে আবার মেলে!

কাগজে যা বেরোয় তার উল্টোটাই তো ধরে নিতে হয়! হয়তো পড়লে—ডিপ্রেশন ইন দি বে, স্কোয়ালি ওয়েদার—ঠিক সেদিনই দেখবে দিনে খটখটে রোদ আর রাত্রে ফুটফুটে জ্যোৎস্না—বড়জোর দু-চারটে হাল্কা সাদা মেঘ।—অসীম হেসে বললে, কিন্তু হাসিটা খুব আন্তরিক শোনালো না। উন্মত্ত নদীর ওপর মোটরবোটের স্টিয়ারিং হুইল ধরে ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে পরিহাসের সুরে হাসা একটু শক্ত বোধহয়।

এরকম রাতে বার হওয়া যে একটু বেশিরকম গোঁয়ার্তুমি হয়েছে অসীম মনে মনে এখন স্বীকার করলেও বাইরে প্রকাশ করতে রাজি নয়। আর সত্যিই ঝড় যে এমন ভীষণভাবে দেখা দেবে তা সে বেরুবার সময় আন্দাজ করতেও পারেনি। রাজগঞ্জে তার নদীর ধারের বাগানবাড়ি থেকে সন্ধ্যায় যখন তারা মোটরবোট নিয়ে বেরিয়েছে তখনো আকাশ অবশ্য মেঘে ঢাকা, দমকা হাওয়ায় ঝিরঝিরে বৃষ্টি নদীর ওপর পাতলা উড়ুনির মতো উড়ে উড়ে যাচ্ছে। সাইক্লোন সিগন্যালের কথা জেনেও তাই সে তেমন কিছু ভয় পায়নি। এরকম বৃষ্টি-বাদলে কতদিন তো তারা গঙ্গার ওপর দিয়ে আসা-যাওয়া করেছে। একটু-আধটু ঝড়-বৃষ্টিতে নদীর ওপর মোটরবোট চালাতে মজাই লাগে বরং। কিন্তু দেখতে দেখতে আকাশ-পৃথিবীর চেহারা বদলে গেছে।

দেখা দিয়েছে সত্যিকার তুফান, রীতিমতো সাইক্লোন। নদীর জল উন্মত্ত অজগরের মতো পাক খেতে খেতে ফুঁসছে, অন্ধকারে বৃষ্টির আট পুরু পর্দায় দিগ্বিদিক আচ্ছন্ন, তারই ভেতর হিংস্র দৈত্যের মতো হুঙ্কার দিয়ে দুরন্ত ঝড় যেন সমস্ত পৃথিবীকে ঝাঁকানি দিয়ে তুলে কক্ষচ্যুত ক'রে দিতে চায়!

স্টিয়ারিং হুইল ধরে থাকলে কী হয়, এ-ঝড়ে কোনোরকমে বোট ভাসিয়ে রাখার চেষ্টা ছাড়া আর কিছু করার উপায় নেই। ঝড়ের বেগে পাক খেতে খেতে দিগ্বিদিক জ্ঞান এখন তাদের লোপ পেয়েছে বললেই হয়। যে-কোনো দিকে কত দূরে কূল বোঝা কঠিন। কালির

মতো গাঢ় অন্ধকারে বৃষ্টির ঝাপটায় দুই তীরের সমস্ত আলো একেবারে মুছে গেছে।

মেটেবুরুজ পার হবার পর থেকে আর একটা বিপদও বেড়েছে। এদিকের গঙ্গা অজস্র নৌকো, গাধাবোট, স্টীমার, জাহাজে ভর্তি। তাদের অধিকাংশই এখন তীরের কাছে নিশ্চয় আশ্রয় নিয়েছে। কূলে বোট লাগাতে গিয়ে তাদের একটির সঙ্গে এই অন্ধকারে ধাক্কা লাগলেই সর্বনাশ! মাঝ-নদীতে বয়া ইত্যাদি থাকলেও এবং ঝড়ের তেজ বেশি হলেও সে হিসাবে বিপদ কিছু কম।

কিন্তু নদীর কোথায় মাঝ আর কোথায় কিনারা তারই যে ঠিক নেই! তাদের মোটরবোটের ক্ষীণ আলো এই জমাট অন্ধকারের গায়ে একটা আঁচড় লাগাতেও পারে না, সুতরাং সামনে কিছু পড়লেও সময়মত তা দেখতে পেয়ে নিজেদের বাঁচাতে পারবে এ-ভরসা কম।

নাঃ, বাহাদুরি ক'রে বন্ধুর নিমন্ত্রণ এমন রাতে না রাখতে এলেই হতো। দুঃসাহসের জন্যে তাদের খ্যাতি আছে সত্যি, কিন্তু এরকম সাইক্লোনের মধ্যে অনিবার্য কারণে বন্ধুর বাড়ি পৌঁছোতে না পারলে সে-খ্যাতি নষ্ট হতো না।

অসীমের ভাবনা হঠাৎ বিজয়ের তীক্ষ্ণ চিৎকারে যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল—

—সামলাও, সামলাও, সামনে জাহাজ!—আর সামলাবার সময় কোথায়!

অন্ধকারের ভেতরে আরো জমাট বিশাল খানিকটা অন্ধকার তাদের একেবারে বুকের ওপর এসে পড়েছে।

অসীম জোরে হুইলটাকে একটা পাক দিলে, কিন্তু তবু রক্ষা হলো না। মোটরবোট বাঁক নিয়েও আড়ভাবে গিয়ে পড়ল সেই জমাট অন্ধকারের ওপর।

ঝড়ের গর্জন ছাপিয়ে উঠল দারুণ একটা সজ্ঘর্ষের শব্দ। বিজয় মোটরবোট থেকে ছিট্‌কে জলের ভেতর গিয়ে পড়েছিল। বেকায়দায় পড়ার দরুন প্রথমে বেশ খানিকটা জল খেয়ে হাঁফিয়ে তাকে কাবু

হতে হয়েছে। একটু সামলে নিয়েই সে চিৎকার করলে—অসীম ! অসীম !

সামনের জাহাজের ওপর জল-ঝড়ের ঝাপটার শব্দ ছাড়া কোনো উত্তর কিন্তু শোনা গেল না। তাদের মোটরবোটটা দু-ফালা হয়ে যেখানে ডুবছে সেইদিকে সাঁতরে এগুতে এগুতে সে আবার চিৎকার করলে—অসীম ! তুমি কোথায় ?

জাহাজের নোঙরের শিকলে বাতাসের গোঙানি আর জলের কল্লোল ছাপিয়ে এবার যেন একটা ক্ষীণ সাড়া কোথা থেকে পাওয়া গেল।

বিজয় তখন ভাগ্যক্রমে জাহাজের নোঙরের শিকলটা ধরে ফেলতে পেরেছে। হিমের মতো ঠাণ্ডা জলে হাত-পা অবশ হয়ে যাচ্ছে, ঝড় ও ঢেউয়ের বেগ এমন প্রচণ্ড যে, যে-কোনো মুহূর্তে তাকেও জাহাজের ওপর আছড়ে ফেলতে পারে, তবু শিকলের নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে বিজয় সেই শব্দের দিকে সাঁতরে চলল। কে জানে অসীম হয়তো গুরুতরভাবে জখম হয়েছে ! ভেসে থাকবার ক্ষমতা তার নেই !

—অসীম !—বিজয় আবার ডাকলে।

—কে, বিজয় ?—এবার স্পষ্ট স্বর শোনা গেল অন্ধকারে—আমি তোমারই খোঁজ করছি !

—আমিও তো তাই। তুমি ঠিক আছ ?

—এ-অবস্থায় যতটা থাকা যায়। কিন্তু তুমি কোথায় ?

—আমিও তো তাই জিজ্ঞাসা করছি, ঝড়ে শব্দের গতি ঠিক করা যাচ্ছে না।

—তা না যাক। শোন, বেশিক্ষণ, এ-জলে ভেসে থাকা যাবে না, সামনের স্টীমারে ওঠবার চেষ্টা কর।

কিন্তু স্টীমারে ওঠার কথা বলা যতটা সহজ, কাজে করা ততটা নয়। উঠবে কোথা দিয়ে৷ নোঙরের যে শিকলটা ভাগ্যক্রমে একবার বিজয় ধরতে পেরেছিল এখন সেটা কোন্ দিকে বোঝবার উপায় নেই৷ আন্দাজে বিজয় একদিকে সাঁতরাতে শুরু করল। প্রতিমুহূর্তেই

ভয়, প্রচণ্ড ঢেউ জাহাজের গায়ে আছড়ে ফেলে দেবে বা স্রোতে জাহাজের তলায় টেনে নিয়ে যাবে। ওপর থেকে মুষলধারে বৃষ্টি বিঁধছে তীরের মতো, নিচে ঢেউয়ের ছাঁট চাবুকের মতো গায়ে-মুখে লাগছে। এরই ভেতর অনেকক্ষণ সাঁতরেও বিজয় জাহাজে ওঠার কোনো অবলম্বন খুঁজে পেল না। কে জানে অসীমের অবস্থাও তাই কি না! একবার চিৎকার ক'রে জিজ্ঞাসা করবে? না, কোনো লাভ নেই। এই অবস্থায় কেউ কাউকে সাহায্য করা তো সম্ভব নয়, তা ছাড়া চিৎকার করতে যেটুকু দম প্রয়োজন তাও এখন তার বাঁচানো দরকার উন্মত্ত নদীর সঙ্গে যোঝবার জন্যে। কতক্ষণ তাকে এই অবস্থায় থাকতে হবে, জাহাজে সত্যিই উঠতে পারবে কিনা, কে বলতে পারে।

যদি সত্যিই জাহাজে উঠতে না পারে! ঠাণ্ডা জলের মধ্যেও বিজয়ের অবশ দেহ শিউরে উঠল। মোটর ভাঙবার পর জলে ছিটকে পড়েও সে হতাশ হয়নি। মোটরবোটের সঙ্গে-সঙ্গেই যে চুরমার হয়ে যায়নি তাতেই মনে হয়েছিল এ-যাত্রা বুঝি সে রক্ষা পেয়ে গেল। কিন্তু এখন সে-আশা যে ক্ষীণ হয়ে আসছে ক্রমশই! এই জলেই শেষপর্যন্ত তার সমাধি হবে নাকি?

বিজয় আর একবার শিউরে উঠল। কিন্তু এবার ঠিক মৃত্যুভয়ে নয়, গায়ের ওপর সাপের মতো কি একটা জিনিসের ছোঁয়া লেগে। গঙ্গায় এতবড় সাপ! তার আর আশ্চর্য কী? এই দারুণ দুর্যোগে কোথাও তীর থেকে হয়তো স্রোতে ভেসে এসেছে, এখন আর উঠতে পারছে না।

কিন্তু একি! আবার সাপটা গায়ে ঠেকে কী করে! সাপটা কি এইখানেই সাঁতরাচ্ছে? জলের ভেতর বিষাক্ত সাপ ছোবল দিতে পারে না বলেই তার জানা ছিল, কিন্তু তবু বিশ্বাস নেই! সাঁতরে সরে যেতে গিয়ে হঠাৎ একটা কথা মনে হওয়ায় বিজয় চমকে উঠল।

তারপর ফিরে হাত বাড়াতেই মুঠোয় যা ধরা পড়ল সেটা সাপ নয়, একটা কাছি।

ওঃ—আর একটু হলেই কী আহাম্মুকি সে করতে যাচ্ছিল! ভাগ্য তার হাতে উদ্ধারের উপায় এগিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও সে তা হেলায় যাচ্ছিল ফেলে।

শরীর অবশ ও ক্লান্ত হলেও বিজয় প্রাণের দায়ে কোনোরকমে কাছি বেয়ে এবার ওপরে উঠল। যেটুকু খাড়াই উঠতে হলো তাই থেকেই সে বুঝলে যে জাহাজটি খুব বড় নয়, রেঙ্গুন প্রভৃতি বন্দরে যে-সব জাহাজ কলকাতা থেকে যাতায়াত করে তারই একটি হবে বোধহয়। কিন্তু আশ্চর্য! জাহাজের ওপরের ডেকেও একটি আলো নেই কেন? ঝড়-জলে জাহাজের আলো নিভিয়ে রাখার তো কোনো কারণ নেই!

ব্যাপারটা অদ্ভুত হলেও এখন তা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নয়। অসীমের খোঁজ করাই আগে দরকার। রেলিঙের ওপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে বিজয় দু-হাত চোঙের মতো ক'রে মুখে লাগিয়ে চিৎকার ক'রে অসীমের নাম ধরে ডাকতে যাবে, এমন সময় তার পিঠে একটা চাপড় পড়ল।—একি, অসীম! তুমি উঠেছ!

—হ্যাঁ, জলের ফাঁড়াটা মনে হচ্ছে কেটেছে, এখন এই ভিজে কাপড়-চোপড় ছেড়ে একটু আশ্রয় পাওয়া দরকার। নইলে নিমো-নিয়ার ফাঁড়া আর কাটবে না। কিন্তু কোথায় আশ্রয় চাইব তা তো বুঝতে পারছি না। সব তো অন্ধকার!

—আমিও তাই অবাক হচ্ছি। জাহাজে যেন লোকজন নেই! ভুতুড়ে জাহাজের মতো সবাই ছেড়ে চলে গেছে!

—ভূতই হোক আর মানুষই হোক, আমাদের আজ এদের অতিথি হতেই হবে। চল, দেখা যাক।

দু-জনে খানিকটা এগিয়ে যাবার পর এক-সার কেবিনের আভাস অন্ধকারে দেখতে পাওয়া গেল।

অসীম তার একটার দরজায় ধাক্কা দিলে;—প্রথমে আস্তে, তারপর জোরে। কিন্তু কোনো সাড়াশব্দ ভেতর থেকে পাওয়া গেল না। এক-এক ক'রে সমস্ত দরজায় ধাক্কা দিয়েও ফল হলো তথৈবচ।

বিজয় হতাশ হয়ে বললে—সত্যি, ব্যাপারটা ভারি অদ্ভুত তো! সারা রাত এই ভিজে কাপড়েই থাকতে হবে নাকি!

—সেইরকমই তো মনে হচ্ছে। তবু সহজে হাল ছাড়লে চলবে না। এত বড় জাহাজে একটা লোকের সঙ্গে দেখা হবে না, একটা দরজা খোলা পাব না, এ কি হতে পারে!

দু-জনে আরো খানিকটা এগিয়ে গিয়ে একটা সিঁড়ি অন্ধকারে পেয়ে গেল। সিঁড়িটি সম্ভবত ওপরের ডেকের। উঠতে যাচ্ছে, এমন সময় বিজয় অসীমের হাতে টান দিয়ে বললে—দাঁড়াও, ওদিকের একটা কামরার দরজার ফাটল দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে না?

—তাই তো!

আর কোনো কথার দরকার হলো না। দু-জনেই অন্ধকারে হোঁচট খেতে খেতে সেইদিকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল। কাছে যেতে দরজার ফাঁকের আলোটা খুব স্পষ্ট দেখা গেল। তীক্ষ্ণ সড়কির মতো অন্ধকার কেটে সে-আলোর দীর্ঘ রেখা বেরিয়ে এসেছে।

অসীম সজোরে দরজায় ধাক্কা দিয়ে ইংরেজিতে বললে—কে আছ, দরজা খোল! আমরা বিপন্ন!

এবারে একবারের বেশি ধাক্কা দিতে হলো না। আস্তে আস্তে দরজা খুলে গিয়ে দেখা গেল প্রকাণ্ড একটি কেবিন-ঘর।

অন্ধকারের পর অত্যন্ত উজ্জ্বল আলোয় প্রথমটা দু-জনের চোখ ধাঁধিয়ে গেছল। ধাঁধা একটু কাটতেই ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকে তারা অবাক হয়ে গেল।

কেবিনটির চেহারা ঠিক হাসপাতালের অস্ত্রোপচারের ঘরের মতো। তিন-চারটি সেইরকম সাদা অপারেটিং টেব্‌ল চতুর্দিকে পাতা। চারি-দিকে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, ওষুধ-বিষুধের শিশি-পত্র।

কিন্তু ঘরের দরজা খুললে কে? কাউকেও দেখা যাচ্ছে না।

এদিক-ওদিক চেয়ে খুঁজতে গিয়ে প্রথমে বিজয় সভয়ে চিৎকার ক'রে উঠল।

যেদিকের দরজা দিয়ে তারা ঢুকেছে সেইদিকের দেয়ালে তাদের

এতক্ষণ চোখ পড়েনি বলেই এ-দৃশ্য তারা প্রথমটা দেখতে পায়নি।

সেখানে সারি-সারি তিনটি মানুষের মাথা-কাটা শব কাত ক'রে সাজানো। তার পাশে একটা টেবিলে তাদেরই তিনটি মুণ্ড বসানো কাচের পাত্রে।

সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপার এই যে, সে-মুণ্ডগুলি যেন দেহ থেকে এইমাত্র আলাদা করা হয়েছে। এখনো সেগুলি একেবারে তাজা, ঠিক জীবন্ত মুখের মতো উজ্জ্বল দৃষ্টি নিয়েই চেয়ে আছে। যন্ত্রণার এতটুকু বিকৃতিও সে-মুখে নেই, এইটেই সবচেয়ে আশ্চর্য!

কিন্তু এ-সব কথা দাঁড়িয়ে ভাববার তখন সময় নয়। বিজয় সভয়ে চিৎকার ক'রে ওঠবার পরেই দু-জনে দরজা দিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসেছিল। তারপর সেখান থেকে সবেগে অন্যদিকে পালানো সম্বন্ধে কোনো পরামর্শের দরকার হয়নি।

কিন্তু পালিয়ে যাবে কোথায়? আবার সেই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে জাহাজের বাইরের রেলিঙের ধারে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে সেই কথাই তাদের মনে হলো একসঙ্গে।

অতি কষ্টে উন্মত্ত নদী থেকে যে-জাহাজে আশ্রয় পাওয়া গেছে তা পরিত্যাগ করা মানে মৃত্যু। অথচ এই দৃশ্য দেখার পর এরকম জাহাজে রাতটুকু কোনোরকমে কাটাবার কল্পনাও ভয়ঙ্কর। কী পৈশাচিক বিভীষিকাময় রহস্য এ-জাহাজে আছে কে জানে!

অসীম প্রথম কথা বললে, গলার স্বর তার আপনা থেকে নিচু হয়ে গেছে।

—এখন কী করা যায়!

কিন্তু কর্তব্য তাদের নিজেদের স্থির করবার দরকার হলো না। হঠাৎ অসীম টের পেলে একটা লোহার মতো শক্ত হাত পেছন থেকে তার গলার টুঁটি চেপে ধরেছে। বরফের মতো সে-হাত শীতল, কিন্তু কী দানবের মতো শক্তি তাতে! অসীম দুর্বল নয়, সাধারণ বাঙালি ছেলের চেয়ে গায়ের জোর তার অনেক বেশি। কিন্তু নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে বুঝে প্রাণপণে দু-হাতে সে-বজ্র মুষ্টি খুলতে গিয়ে একটা



একটা লোহার মতো শক্ত হাত পেছন থেকে…

আঙুলও সে সরাতে পারলে না। সত্যিই সে-হাত যেন লোহা দিয়ে তৈরি!

দম বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে চেতনা লোপ পাবার আগে সে একবার কোনোমতে অস্ফুট চিৎকার করে উঠল—বিজয়!

কিন্তু কে উত্তর দেবে? বিজয় তখন এইরকম আর একটি বজ্রমুষ্টি থেকেই কোনোরকমে ফস্‌কে পালাতে গিয়ে জাহাজের রেলিং থেকে ছিট্‌কে নিচের নদীতে গিয়ে পড়েছে।

২

একেবারে সরাসরি গল্পের স্রোতে ভাসবার উৎসাহে বিজয় আর অসীমের কোনো পরিচয় দিতেই ভুলে গেছি। অমন ঝড়ের রাতে যারা মোটরবোটে বেরোয় তারা যে সাহসী, ডানপিটে ছেলে সে-কথা অবশ্য না বলতেই বোঝা যায়। রাজগঞ্জের একটি বাগানবাড়িতে তাদের থাকার কথাও বলা হয়েছে। তবু তাদের আর-একটু পরিচয় বোধহয় দেওয়া দরকার।

কলকাতা ছেড়ে রাজগঞ্জে তারা শুধু শখ ক'রে থাকে না। বাড়িটা অসীমের। সেখানে একটি ছোটখাটো ল্যাবরেটরি বসিয়ে সে তার বন্ধু বিজয়কে নিয়ে বছরখানেক ধরে একটি গবেষণা চালাচ্ছে। অসীম তার আগের বছরেই এঞ্জিনিয়ারিং পাশ ক'রে বেরিয়েছে, বিজয় এখনো বিজ্ঞানের ছাত্র।

ল্যাবরেটরিতে কাজ যে খুব বেশি হয় তা নয়। খেলাধুলো, শিকার ও নানারকম ফুর্তির ব্যাপারেই তাদের উৎসাহ বেশি। অসীমের টাকাকড়ির অভাব নেই। পৈতৃক সম্পত্তি যা আছে তার আয় বেশ মোটা রকমের। সুতরাং একটা ছোটখাটো ল্যাবরেটরি শখ ক'রে অনায়াসে সে চালাতে পারে। বিজয় তার ছেলেবেলার সঙ্গী ও বন্ধু। অসীমের সকল কাজের সে দোসর।

এইবার যে-ঝড়ের রাত্রে তারা পরম দুঃসাহসে মোটরবোটে কলকাতায় রওনা হয়েছিল তার পরের দিনের কথা বলি।

বেলা প্রায় এগারোটা হবে। কলকাতার জল-পুলিশের বড় সাহেবের ঘরে বেয়ারা একটি কার্ড ও একটি চিঠি দিয়ে গেল।

চিঠিটি একজন নামজাদা মস্তবড় সরকারী কর্মচারীর। তাতে একটি ছেলের পরিচয় দিয়ে পুলিসের বড় সাহেবকে অনুরোধ করা হয়েছে তিনি যেন যথাসাধ্য ছেলেটিকে সাহায্য করেন।

মিঃ ব্র্যাডক চিঠি পড়বামাত্র বেয়ারাকে দিয়ে ছেলেটিকে ডাকিয়ে পাঠালেন।

তাঁর ঘরের দরজা ঠেলে এবার যে ছেলেটি ঘরে ঢুকল সে আমাদের পূর্বপরিচিত। তবু এই অবস্থায় তাকে চেনা শক্ত। মনে হয় যেন হাসপাতালের বিছানা ছেড়ে কোনো দুর্ঘটনায়-জখম-হওয়া রোগী পালিয়ে এসেছে কোনোরকমে। মাথায়-পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, মুখে-হাতে পটি লাগানো, চোখ জবাফুলের মত লাল—এ-ই যে আমাদের আগের রাত্রের পরিচিত বিজয় তা কে বলবে!

মিঃ ব্র্যাডকও প্রথমটা এই মূর্তি দেখে অ্যাম্বুলেন্স ডাকবেন না বসতে বলবেন, বোধহয় ঠিক করতে পারেননি।

খানিক অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে থাকবার পর তিনি তাকে বসতে ইঙ্গিত ক'রে বললেন—যে অবস্থায় আপনি দেখা করতে এসেছেন তাতে আপনার মনের জোরের প্রশংসা করতে হয়। যাই হোক, আপনার পরিচয় এবং ঘটনার খানিকটা বিবরণ এই চিঠিতেই পেয়েছি। তবু আপনার মুখ থেকে আরো একটু বিস্তারিত খবর শুনতে চাই। আপনার বন্ধুর এখনো কোনো পাত্তা পাওয়া যায়নি বলছেন?

বিজয় মাথা নেড়ে বললে—না, এবং সহজে পাওয়া যাবে বলেও মনে হয় না। সেইজন্যেই আপনার কাছে আসা।

মিঃ ব্র্যাডক একটু হেসেই বললেন—দেখুন যে-রকম রহস্যময় জাহাজের ব্যাপার আপনি বলছেন সে-রকম কথা শুধু আজগুবি

গল্পেই শোনা যায়। আপনাদের দেখার কোনো ভুল হয় নি তো?

বিজয় ম্লান হেসে বললে—সে-দেখা যদি ভুল হয় তাহলে আমার মাথার এই ব্যাণ্ডেজটাও ভুল!

মিঃ ব্র্যাডক খানিক চুপ ক'রে কি যেন ভাবলেন, তারপর জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার কি বিশ্বাস আপনার বন্ধু সেই জাহাজেই বন্দী হয়েছেন? তিনিও যে জলে ছিটকে পড়েন নি এবং ঝড়ের মধ্যে ডুবে যান নি তার ঠিক কী!

—একেবারে ঠিক কিছুই নেই—বিজয় ধীরে ধীরে বলতে লাগল—তবে, ওই তুফানের ভেতর ও ওপর থেকে সে জলে পড়লে আমি টের পেতাম বলেই মনে হয়। আমি জলে ঠিক্‌রে পড়ার পর অনেকক্ষণ ওই জাহাজের চারধারেই সাঁতরে আবার ওপরে ওঠবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত ও আহত হয়ে প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় স্রোতে ভেসে গেছি।

—আপনি এ-যাত্রা বড় জোর বেঁচে গেছেন। নদী থেকে কেমন ক'রে কোথায় উঠলেন?—মিঃ ব্র্যাডক জিজ্ঞাসা করলেন।

—ভাগ্যক্রমে আমি ভাসতে ভাসতে একটা গাধাবোটের গায়ে ঝোলানো কাছিতে গিয়ে জড়িয়ে যাই। আমার চিৎকারে প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় সেখানকার মাঝি-মাল্লা আমায় উদ্ধার করে। শরীরের নানা জায়গায় মারাত্মক না হলেও বেশ চোট লেগেছিল। সেজন্য সকালে ঝড় থামবার পরে ডাক্তারখানায় ব্যাণ্ডেজ করিয়েই এই ধান্দায় বেরিয়েছি।

মিঃ ব্র্যাডক আবার খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললেন—দেখুন, ব্যাপারটা এমনই অদ্ভুত যে, আপনার কথায় বিশ্বাস করব কিনা এখনো ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। তবু যে-কটি ছোট জাহাজ এখন কলকাতার বন্দরে আছে সেগুলির খোঁজ আমি নিয়ে দেখছি।

মিঃ ব্র্যাডক এবার টেবিলের ওপর থেকে ফোনটা তুলে একটা নম্বর জানালেন।

—হ্যালো, রিভার ট্র্যাফিক ইনস্পেক্টর্স অফিস?

—দেখুন, কাল কলকাতায় যে-কটি বাইরের জাহাজ ছিল ও এখনো আছে তার একটা লিস্ট চাই।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পর অপর দিক থেকে বোধহয় উত্তর এল।

মিঃ ব্র্যাডক একটা প্যাড টেনে নিয়ে বাঁ হাতে ফোন ধরে ডান হাতে লিখতে লাগলেন—এস্. এস্. ব্রিটানি, মায়া, ভিক্টোরিয়া, নায়াৎস্থ…

হঠাৎ মিঃ ব্র্যাডককে যেন একটু উত্তেজিত দেখা গেল। লেখা থামিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন বেশ একটু চঞ্চলভাবে—কী বললেন? 'এস্. এস্. মান্না?' যাবার নির্দিষ্ট তারিখের আগেই ঝড়ের মধ্যে কাল চলে গেছে? কবে যাবার কথা ছিল? আরো ছু-দিন পরে? কত টনের জাহাজ? হ্যালো—কোথা থেকে এসেছিল?…হ্যাঁ,—ক্যাপ্টেনের নাম কী?…কী বললেন—আমেরিকান জাহাজ?…

আরো ছু-একটা প্রশ্নের পর ফোনটা এবার নামিয়ে দিয়ে মিঃ ব্র্যাডক স্তব্ধ হয়ে খানিকটা বসে রইলেন। তাঁর কপালে তখন চিন্তার রেখা পড়েছে।

—এখন কী মনে হচ্ছে মিঃ ব্র্যাডক?—বিজয় জিজ্ঞাসা করলে একটু যেন শ্লেষের খোঁচা দিয়েই।

—সত্যিই ভারি আশ্চর্য!—মিঃ ব্র্যাডক ধীরে ধীরে বললেন—জাহাজটার গতিবিধি কেমন রহস্যময় ঠেকছে। যাত্রী-জাহাজও নয়, আবার মাল-জাহাজ বলেও মনে হচ্ছে না। তিন দিন হলো কলকাতায় এসে নোঙর ফেলেছে, আবার এখান থেকে যেদিন রওনা হবার কথা তার ছু-দিন আগেই কাল শেষরাত্রে সরে পড়েছে।…

বিজয় কথার মধ্যে বাধা দিয়ে বললে—সরে পড়তে এখনো নিশ্চয় পারে নি। কাল শেষরাত্রে যদি পাড়ি দিয়ে থাকে তাহলে এর মধ্যে সাগর-দ্বীপ পেরিয়ে কতদূর আর গেছে!

মিঃ ব্র্যাডক এবার একটু হাসলেন, বললেন—আপনি যা বলতে চাইছেন তা বুঝতে পেরেছি; কিন্তু উপায় নেই, খোলা সমুদ্রে তাকে

ধরবার মতো আমাদের কোনো জাহাজ কি পাহারায় আছে! আর থাকলেও তাকে ধরতাম কিসের জোরে! আপনার এই নালিশের ওপর নির্ভর ক'রে একটা বিদেশী জাহাজকে রোখা যায় কি? কী প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমাদের আছে?

কথাটা যুক্তিযুক্ত সন্দেহ নেই। বিজয় তাই চুপ ক'রে রইল।

মিঃ ব্র্যাডক আবার বললেন—ব্যাপারটার সন্ধান নেওয়া ছাড়া আর কিছু আমরা আপাতত করতে পারি না। জাহাজটা ম্যানিলা থেকে এসেছে বলে লিখেছে, ফিরে যাবার কথা সেইখানেই। ম্যানিলাতে বেতার খবর পাঠাচ্ছি, তার আগে কাস্টম্‌স অফিসে একবার খোঁজ নিয়ে দেখি।

মিঃ ব্র্যাডক ফোনটা আবার তুলে নিলেন। কিন্তু ফোনে কথা-বার্তার পর মুখ তাঁর আরো গম্ভীর হয়ে উঠেছে দেখা গেল।

বিজয়ের দিকে ফিরে তিনি উত্তেজিতভাবে বললেন—শুনলেন তো! টাটা কোম্পানি থেকে ইস্পাতের একটা বড় অর্ডারের ডেলিভারি নিতে নাকি এস্. এস্. মান্না এসেছিল। ম্যানিলা থেকে আমেরিকান জাহাজ এল কলকাতায় টাটার কাছে ইস্পাত কিনতে! কলকাতায় সেখান থেকে কোনো মাল অথচ আনে নি—নাঃ, ব্যাপারটা ভারি গোলমেলে তো! তবে, কাল রাতে কোন্ জাহাজের সঙ্গে আপনাদের মোটরবোটের ধাক্কা লেগেছিল সেটা বোধহয় এখন অনুমান করা শক্ত নয়।

—তাতে সুবিধে কী হলো বুঝতে তো পারছি না। মান্না তো এখন যাকে বলে পগার পার!

—বিজয় বেশ একটু তিক্ত স্বরেই বললে।

তার দিকে চেয়ে সহানুভূতির স্বরে মিঃ ব্র্যাডক বললেন—আপনার মনে যে কী হচ্ছে তা বুঝতে পারছি, কিন্তু ব্যস্ত হয়ে কোনো লাভ তো নেই! আপনি আমায় ঠিকানা দিয়ে বাড়ি যান,—আপনার বিশ্রামের এখন দরকার অত্যন্ত বেশি। আমি কতদূর কী করতে পারি দেখি। তেমনি কিছু খবর পেলেই আপনাকে জানাবো।

—দেখুন, কাল কলকাতায় যে-কটি বাইরের জাহাজ ছিল ও এখনো আছে তার একটা লিস্ট চাই।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পর অপর দিক থেকে বোধহয় উত্তর এল।

মিঃ ব্র্যাডক একটা প্যাড টেনে নিয়ে বাঁ হাতে ফোন ধরে ডান হাতে লিখতে লাগলেন—এস্. এস্. ব্রিটানি, মায়া, ভিক্টোরিয়া, নায়াৎস্থ…

হঠাৎ মিঃ ব্র্যাডককে যেন একটু উত্তেজিত দেখা গেল। লেখা থামিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন বেশ একটু চঞ্চলভাবে—কী বললেন? 'এস্. এস্. মান্না?' যাবার নির্দিষ্ট তারিখের আগেই ঝড়ের মধ্যে কাল চলে গেছে? কবে যাবার কথা ছিল? আরো দু-দিন পরে? কত টনের জাহাজ? হ্যালো—কোথা থেকে এসেছিল?…হ্যাঁ,—ক্যাপ্টেনের নাম কী?…কী বললেন—আমেরিকান জাহাজ?…

আরো দু-একটা প্রশ্নের পর ফোনটা এবার নামিয়ে দিয়ে মিঃ ব্র্যাডক স্তব্ধ হয়ে খানিকটা বসে রইলেন। তাঁর কপালে তখন চিন্তার রেখা পড়েছে।

—এখন কী মনে হচ্ছে মিঃ ব্র্যাডক?—বিজয় জিজ্ঞাসা করলে একটু যেন শ্লেষের খোঁচা দিয়েই।

—সত্যিই ভারি আশ্চর্য!—মিঃ ব্র্যাডক ধীরে ধীরে বললেন—জাহাজটার গতিবিধি কেমন রহস্যময় ঠেকছে। যাত্রী-জাহাজও নয়, আবার মাল-জাহাজ বলেও মনে হচ্ছে না। তিন দিন হলো কলকাতায় এসে নোঙর ফেলেছে, আবার এখান থেকে যেদিন রওনা হবার কথা তার দু-দিন আগেই কাল শেষরাত্রে সরে পড়েছে।…

বিজয় কথার মধ্যে বাধা দিয়ে বললে—সরে পড়তে এখনো নিশ্চয় পারে নি। কাল শেষরাত্রে যদি পাড়ি দিয়ে থাকে তাহলে এর মধ্যে সাগর-দ্বীপ পেরিয়ে কতদূর আর গেছে।

মিঃ ব্র্যাডক এবার একটু হাসলেন, বললেন—আপনি যা বলতে চাইছেন তা বুঝতে পেরেছি; কিন্তু উপায় নেই, খোলা সমুদ্রে তাকে

ধরবার মতো আমাদের কোনো জাহাজ কি পাহারায় আছে! আর থাকলেও তাকে ধরতাম কিসের জোরে! আপনার এই নালিশের ওপর নির্ভর ক'রে একটা বিদেশী জাহাজকে রোখা যায় কি? কী প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমাদের আছে?

কথাটা যুক্তিযুক্ত সন্দেহ নেই। বিজয় তাই চুপ ক'রে রইল।

মিঃ ব্র্যাডক আবার বললেন—ব্যাপারটার সন্ধান নেওয়া ছাড়া আর কিছু আমরা আপাতত করতে পারি না। জাহাজটা ম্যানিলা থেকে এসেছে বলে লিখেছে, ফিরে যাবার কথা সেইখানেই। ম্যানিলাতে বেতার খবর পাঠাচ্ছি, তার আগে কাস্টম্‌স অফিসে একবার খোঁজ নিয়ে দেখি।

মিঃ ব্র্যাডক ফোনটা আবার তুলে নিলেন। কিন্তু ফোনে কথা - বার্তার পর মুখ তাঁর আরো গম্ভীর হয়ে উঠেছে দেখা গেল।

বিজয়ের দিকে ফিরে তিনি উত্তেজিতভাবে বললেন—শুনলেন তো! টাটা কোম্পানি থেকে ইস্পাতের একটা বড় অর্ডারের ডেলিভারি নিতে নাকি এস্. এস্. মান্না এসেছিল। ম্যানিলা থেকে আমেরিকান জাহাজ এল কলকাতায় টাটার কাছে ইস্পাত কিনতে! কলকাতায় সেখান থেকে কোনো মাল অথচ আনে নি—নাঃ, ব্যাপারটা ভারি গোলমেলে তো! তবে, কাল রাতে কোন্ জাহাজের সঙ্গে আপনাদের মোটরবোটের ধাক্কা লেগেছিল সেটা বোধহয় এখন অনুমান করা শক্ত নয়।

—তাতে সুবিধে কী হলো বুঝতে তো পারছি না। মান্না তো এখন যাকে বলে পগার পার!

—বিজয় বেশ একটু তিক্ত স্বরেই বললে।

তার দিকে চেয়ে সহানুভূতির স্বরে মিঃ ব্র্যাডক বললেন—আপনার মনে যে কী হচ্ছে তা বুঝতে পারছি, কিন্তু ব্যস্ত হয়ে কোনো লাভ তো নেই! আপনি আমায় ঠিকানা দিয়ে বাড়ি যান,—আপনার বিশ্রামের এখন দরকার অত্যন্ত বেশি। আমি কতদূর কী করতে পারি দেখি। তেমনি কিছু খবর পেলেই আপনাকে জানাবো।

মিঃ ব্র্যাডক তাঁর কথা রাখলেন। সেদিন রাত্রেই আন্দাজ দশটার সময় রাজগঞ্জের বাগানবাড়িতে ফোনের ঘণ্টা বেজে উঠল। জলে ভেজা শরীরে চোট খাওয়ার দরুন বিজয়ের তখন বেশ জ্বর এসেছে। তবু সে নিজে গিয়েই ফোন ধরলে···হ্যালো মিঃ দে, আমি মিঃ ব্র্যাডক। ম্যানিলা থেকে এইমাত্র ফিরতি বেতার খবর এসেছে, মান্না বলে কোনো জাহাজ সেখান থেকে এক বছরে ছাড়ে নি। হ্যাঁ, ক্রমশই ব্যাপারটা আরো দুর্বোধ্য হয়ে উঠছে! আপনি কাল একবার আসতে পারেন? না, জ্বর নিয়ে আসবেন না, আমিই একজন লোক পাঠাবো না-হয়—কতকগুলো বিষয় আরো প্রশ্ন করবার আছে। গুড্‌নাইট!

৩

পরের দিন সকালে বিজয়ের জ্বরটা অবশ্য ছেড়ে গেল, কিন্তু শরীর তার তখনো অত্যন্ত দুর্বল। সেই অবস্থায় অত্যন্ত উদ্বিগ্নভাবে তাকে সকাল এবং দুপুরটা কাটাতে হলো।···

বিজয় আশা করেছিল সকালেই মিঃ ব্র্যাডক বোধহয় কোনো লোক পাঠাবেন। তাঁর কাছে এ-বিষয়ে আরো খোঁজ-খবর পাবার আশাই সে করছিল। কিন্তু বিকেল চারটে পর্যন্ত কারুর দেখা নেই।

সন্ধ্যায় জ্বরটা আবার যখন তার ঘুরে এসেছে এবং নিজের ঘরে লেপমুড়ি দিয়ে সে শুতে বাধ্য হয়েছে, তখন চাকর এসে একটি কার্ড ও চিঠি দিয়ে গেল।

মিঃ ব্র্যাডক লোকেশবাবু নামে একজন গোয়েন্দা কর্মচারীকে তার সঙ্গে দেখা করতে পাঠিয়েছেন। আধাবয়সী রোগা লম্বা একটি লোক, লোকেশবাবুকে দেখলে গোয়েন্দার বদলে নিরীহ স্কুলমাস্টার বলেই মনে হয়। ঘরে ঢুকে তার অবস্থা দেখে প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে তিনি বললেন—আপনার এই জ্বরের ওপর কষ্ট দিতে আসা বোধ হয় আমার উচিত হলো না।

—না এলেই কষ্ট বরং আরো বেশি হতো।—বিজয় লেপের ভেতর থেকে বললে—সকাল এবং দুপুর উদ্বিগ্নভাবে অপেক্ষা করেই বোধহয় জ্বরটা আমার বেড়েছে। সকালে এলেন না কেন?

—সকালেই আসতাম। কিন্তু আপনার এই ব্যাপারের একটা সূত্র পেয়ে সন্ধান নিতে গিয়েই আর আসা হয়ে ওঠে নি।

বিজয় এবার উত্তেজিতভাবে লেপ ফেলে বিছানার ওপর উঠে বসল—কোনো সূত্র পেয়েছেন নাকি! খোঁজ পেয়েছেন এস্. এস্. মান্নার?

—আপনি অত উত্তেজিত হবেন না।—লোকেশবাবু একটু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন—এমন কিছু সূত্র সে নয়, আর তাছাড়া শেষ পর্যন্ত সে খেই হারিয়েই গেছে।

—হারিয়ে গেছে!—কিন্তু ব্যাপারটা কী আমায় খুলে বলুন।—বিজয়ের পক্ষে উত্তেজনা দমন করা তখন সত্যিই শক্ত।

লোকেশবাবু এবার একটু বিব্রত হয়ে বললেন—কিন্তু জ্বরের ওপর আপনার পক্ষে এরকম উত্তেজনা কি ভালো?

—ভালো-মন্দর কথা এখন রেখে দিন—বিজয় বেশ একটু বিরক্ত হয়েই বললে—মন্দ যদি কিছু হয় আপনার এই লম্বা ভূমিকার চোটেই হবে; কী হয়েছিল বলুন তাড়াতাড়ি!

লোকেশবাবু অনেকটা হতাশভাবে এবার বললেন—তবে শুনুন। কাল রাত্রেই মিঃ ব্রাডক আমাকে ডাকিয়ে এস্.এস্. মান্নার রহস্যের কথা জানিয়ে আমায় এ-ব্যাপারের সন্ধান নেবার ভার দেন। সমস্ত কথা শুনে আমার মনে হয় যে, যে-জেটিতে মান্না ক-দিন নোঙর করে মাল বোঝাই করেছিল সেখান থেকে তার কিছু বৃত্তান্ত পাওয়া যেতে পারে। রাত্রেই জেটিতে গিয়ে যে-সব কুলি মান্নায় ইস্পাত বোঝাইয়ের কাজে লেগেছিল তাদের সর্দারের বাড়ির ঠিকানা আমি জোগাড় করি। কাল রাত্রে তাকে খুঁজেও বার করি। কিন্তু সে মান্না সম্বন্ধে বিশেষ কোনো খবরই দিতে পারে না। তার কাছে শুধু এইটুকু জানতে পারি যে মান্নায় কয়েকজন দেশী খালাসি কাজ করে।

—আজ সকালে উঠেই আমি সেইজন্যে 'ইণ্ডিয়ান সী-মেন্‌স অ্যাসোসিয়েশনে' গিয়ে হাজির হই, কত দিন আগে কোন্ কোন্ দেশী খালাসি মান্নার কাজ নিয়েছে তার রেকর্ড সংগ্রহ করবার জন্যে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, মান্না বলে কোনো জাহাজের নামই তাদের দপ্তরে নেই। বোঝা যায়, কোন দেশী খালাসি অন্তত কলকাতা থেকে মান্নায় কাজ নেয় নি।

সেখান থেকে হতাশ হয়ে চলে আসছি, এমন সময় একটি লোক এসে আমায় তার সঙ্গে যেতে ইশারা করে। খানিকদূর গিয়ে নির্জন জায়গায় সে আমায় বলে যে মান্নার খবর পাবার উপায় সে আমায় বোধহয় বলে দিতে পারে। তবে, সে তার জন্যে কিছু চায়।

—লোকটা বেকার খালাসি। কাজের খোঁজেই সী-মেন্‌স অ্যাসোসিয়েশনের অফিসে গেছল। সেখানে আমার কথাবার্তা সে শুনেছে এবং তারপর আমার পিছু নিয়েছে।

—তার খবর কতদূর দামী আগে থেকে বুঝতে না পারলেও লোকটাকে আমি কয়েকটা টাকা দিই। খুশি হয়ে সে তখন বলে, মান্নার একজন খালাসির খোঁজ সে আমায় দেবে। আমায় শুধু তার সঙ্গে যেতে হবে। তার সঙ্গে যেতে যেতে আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি যার কথা বলছ সে যে মান্নার খালাসি তা ঠিক জানো তো?

—লোকটা তখন স্বীকার করলে যে একেবারে নিশ্চিন্তভাবে সে কিছু জানে না, কিন্তু নানা কারণে তার সন্দেহ হয়েছে যে সেই খালাসি যে-জাহাজ থেকে নেমেছে তার কিছু রহস্য আছে। আমার মুখে মান্নার কথা শুনে তারপর তার ধারণা হয়েছে সে হয়তো মান্না জাহাজেই ছিল।

—লোকটাকে টাকা-কটা বৃথাই দেওয়া হয়েছে মনে হলেও এই সামান্য সূত্রটুকুও তখন ছাড়তে পারলাম না। লোকটার কাছে সেই যা সংবাদ পেলাম তা সত্যিই একটু রহস্যজনক। এই খালাসিটি বছর-

পাঁচেক আগে কলকাতা থেকে উধাও হয়। কোন্ জাহাজে সে কাজ নিয়েছে, কোথায় গেছে কিছুই জানা যায় না। তারপর পাঁচ বৎসর বাদে কলকাতায় হঠাৎ সে মাত্র কয়েকদিন হলো ফিরেছে। এখনো বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনের কাছে তার এই ক-বৎসরের কোনো কথা সে ভাঙে নি। কোন্ জাহাজে সে কাজ করেছে, কোথায় ছিল এসব প্রশ্নের উত্তরে এমন সব উল্টো-পাল্টা কথা সে বলে যা শুনলে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক।

—আপাতত খালাসিটা একটা দেশী হোটেলে এসে উঠেছে। সেই হোটেলেই আমরা চললাম।

—সেখানে পৌঁছে দেখলাম, খিদিরপুরের নোংরা বস্তি অঞ্চলে অত্যন্ত দরিদ্র একটি হোটেলখানা। টিনের চাল দেওয়া মাটির একটি দোতলার নিচে চা, রুটি, মাংস প্রভৃতি তৈরি ও খুচরো বিক্রি হয়, ওপরের কয়েকটি খালাসি শ্রেণীর লোকেদেরই ভাড়া দেবার জন্যে বরাদ্দ।

বিজয় এতক্ষণ নিঃশব্দে লোকেশবাবুর কথা শুনছিল, এইবার তাঁকে থামতে দেখে অধীরভাবে বললে—তারপর, তারপর ?

লোকেশবাবু একটু হেসে বললেন—তারপর আর কিছু নেই।

—কিছু নেই মানে! সে কি মান্নার খালাসি নয় ?—বিজয়ের গলা উত্তেজনায় তখন চড়ে গেছে।

—তার দেখাই পেলাম না, তো জানব কী ক'রে ?

—দেখাই পেলেন না !—বিজয় হতাশভাবে বললে।

—না,—শুনলাম আগের রাত্রে কাউকে কিছু না জানিয়ে সে নাকি উধাও হয়ে গেছে।

—তার খোঁজ তাহলে আগে করা দরকার।

—দরকার নাও হতে পারে। হয়তো সে সত্যিই মান্নার খালাসি নয়। যে-লোকটা আমাকে খবর দিয়েছিল সে ভুল করে বা ইচ্ছা করে ঠকাবার জন্যে ওকথা বলেছিল এমনও হতে পারে।

বিজয় খানিক গুম হয়ে বসে থেকে কি যেন ভাবলে, তারপর

আবার লেপমুড়ি দিয়ে আগের মতো শুয়ে পড়ে বেশ একটু বিরক্তির সঙ্গে বললে—এই খবরটুকু দেবার জন্যেই কি মিঃ ব্র্যাডক আপনাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন ?

লোকেশবাবু একটু হেসে বললেন—না, আরো দরকার আছে। আপনি আমাদের ওপর বিরক্ত হচ্ছেন বুঝতে পারছি। কিন্তু তখনি কী করতে পারি বলুন! সে-খালাসির আগের রাত্রে পালিয়ে যাওয়া তো আমরা বন্ধ করতে পারতাম না।

—কিন্তু এখন তো তার খোঁজ করতে পারেন। আপনাদের দৃষ্টি এড়িয়ে একটা মাছি গলে যেতে পারে না, একটা জলজ্যান্ত আস্ত মানুষ এই শহর থেকে সরে পড়বে, আপনারা সন্ধান পাবেন না, এমন কখনো হতে পারে!

—গালাগাল দিতে গিয়ে আমাদের যে প্রশংসাটুকু ক'রে ফেললেন তার জন্যে ধন্যবাদ।—লোকেশবাবু হেসে বললেন—কিন্তু আমরাও সবজান্তা সর্বশক্তিমান ভগবান নই, একটা ফেরারি লোককে খুঁজে বার করতে সময় লাগে। তার আগে আপনাকে গোটাকতক কথা জিজ্ঞাসা করবার আছে।

—যা বলবার আমি কাল মিঃ ব্র্যাডককেই জানিয়ে এসেছি; তারপরেও আপনাদের আর কিছু খবর আমি দিতে পারব বলে মনে করি না। তবু যা জিজ্ঞাসা করবার আছে করুন, আমি প্রস্তুত। বিজয়ের কথা শুনে মনে হলো, লোকেশবাবুকে আপাতত বিদায় দিতে পারলেই সে বাঁচে।

লোকেশবাবু বিজয়ের মনের কথা হয়তো বুঝলেন, কিন্তু মুখে কোনো ভাবান্তর তাঁর দেখা গেল না। প্রসন্ন মুখেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা, জাহাজের ধারে আপনারা যখন পালিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন পেছন থেকে ক-জন আপনাদের আক্রমণ করে ?

—তা আমি বলতে পারব না, সেই অন্ধকারে কিছুই দেখবার অবসর পাই নি।

একটু চুপ ক'রে থেকে লোকেশবাবু আবার জিজ্ঞাসা করলেন—আপনাকে কেউ কি ঠেলে জলে ফেলে দেয়, না কারুর হাত থেকে ফস্‌কে জলে গিয়ে পড়েন ?

—যে আমায় ধরবার চেষ্টা করেছিল তার হাত ফস্‌কেই টাল সামলাতে না পেরে আমি জলে পড়ে যাই। কিন্তু এমন নিরর্থক প্রশ্নে কী লাভ আমি বুঝতে পারছি না। কিভাবে আমি জলে পড়েছিলাম তা জানলে আসল সমস্যার মীমাংসার কিছু সুবিধে হবে কি ?

—হতেও পারে হয়তো।

লোকেশবাবু উত্তরে যেভাবে হাসলেন তাতে বিজয়ের যেন আরো গা জ্বলে গেল।

লোকেশবাবু আবার বললেন—আপনার মেজাজ এখন জ্বরের দরুন বোধহয় খারাপ, তবু আর-একটা প্রশ্ন আপনাকে করতে হচ্ছে—আপনার ঘরে যে তিনটি কাটামুণ্ড দেহ দেখেছিলেন, তাদের গায়ে কোনো পোশাক ছিল কি ?

—ছিল, ছিল, সাদা নাবিকের পোশাক ছিল। বিজয় এবার আবার লেপ ফেলে উঠেই বসেছে দেখা গেল বিরক্তিতে।—হয়তো আমার জ্বরের জন্য মেজাজ খারাপ হতে পারে, কিন্তু আপনি বিনা জ্বরেই প্রলাপ বকছেন মনে হচ্ছে। মাথা-কাটা শবের পোশাক থাকা না-থাকায় কী আসে যায় ?

—হয়তো যায়।—নমস্কার। বলে একটু হেসে লোকেশবাবু চলে যাচ্ছিলেন।

বিজয় তাঁকে ফিরিয়ে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে—আমার একটা কথা জিজ্ঞাসা করবার আছে।

—বলুন।

—এই ফেরারি খালাসি যে-হোটেলে ছিল তার ঠিকানাটা বলে যাবেন ?

ঠিকানাটা বলে দিয়ে লোকেশবাবু বিদায় নিলেন।

বিজয় হাঁক দিয়ে চাকরকে ডেকে হুকুম দিলে—পাঁচ গ্রেন কুইনিন আর এক গ্লাস জল, শিগ্‌গির।

তারপর নিজের মনেই বললে—বাজে বকিয়ে জ্বরটা বাড়িয়ে দিয়ে গেল।

৪

কুইনিনের গুণে কিংবা আপনা থেকে, যে কারণেই হোক বিজয়ের জ্বরটা তার পরদিন সকালেই ছেড়ে গেছে দেখা গেল।

বলা বাহুল্য, বিজয়কেও আর বিছানায় নয়, দেখা গেল একেবারে খিদিরপুরের একটি নোংরা রাস্তায় একটি হোটেলখানায়।

কিন্তু হোটেলখানায় তখন কোনো সুবিধা তার হলো না। হোটেলওয়ালা আগের দিনই পুলিসের গন্ধ পেয়ে বেশ একটু ভড়কে গিয়েছে। আজ তার মুখে একেবারে তালাচাবি দেওয়া। বিজয় তার কাছ থেকে কোনো কথাই বার করতে পারলে না।

পুলিসের লোক ভেবে বিজয়কে সে ফেরারি খালাসির ঘরখানা দেখালে বটে, কিন্তু না দেখালেও কোনো ক্ষতি ছিল না। কারণ দু-ধারে টিনের পার্টিশন দেওয়া সেই দোতলার খুপরি ঘরটিতে অতি বড় ধুরন্ধর গোয়েন্দাও কোনো সূত্র খুঁজে পেত না। মাত্র এক রাত্রি সেখানে বাস ক'রে, ফেরারি খালাসি কোনো চিহ্নই রেখে যায় নি।

হোটেলখানায় অন্য কোনো লোকের কাছেও পলাতক খালাসির কোনো খবর সংগ্রহ করতে পারলে না। আসলেই তারা কেউ কিছু জানে না, না পুলিসের হাঙ্গামার ভয়ে তারা মুখ বুজে রইল তা বলা শক্ত।

হোটেলখানা থেকে ব্যর্থ হয়ে বিজয় আবার যখন মিঃ ব্র্যাডকের অফিসে গেল, তখন তার মন সত্যি ভেঙে পড়েছে। অসীমের খোঁজ

কি সত্যই তাহলে পাওয়া যাবে না! সেই ঝড়ের রাতের ভয়ঙ্কর জাহাজ কি সত্যই তার সমস্ত রহস্য নিয়ে চিরদিনের মতো তাদের আয়ত্তের বাইরে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে! অসীম প্রাণে বেঁচে আছে কিনা এটুকুও কি সে জানতে আর পারবে না!

মিঃ ব্র্যাডক তার কার্ড পেয়েই বিজয়কে ডেকে পাঠালেন।

বিজয় ঢুকে চেয়ারে বসবার পর তিনি বললেন—আমি সকালেই আপনাকে ফোন ক'রে পাই নি। জ্বর থেকে উঠেই আজ সকালে বেরুনো আপনার ভালো হয় নি।

বিজয় একটু অধৈর্যের সঙ্গে বললে—না বেরিয়ে কী করি বলুন, আপনারা ব্যাপারটাকে যে-রকম হাল্কাভাবে নিচ্ছেন!

—হাল্কাভাবে নিচ্ছি! বলেন কি! এর মধ্যে আমরা কতদূর কী করেছি জানেন?

—কী আর করেছেন!—বিজয়ের গলার স্বর বেশ তিক্ত—সামান্য একটা খালাসি, তারই পাত্তা আপনারা পেলেন না!

—আপনি নিজে চেষ্টা ক'রে পেলেন কি?

বিজয় পেছন থেকে আর একজনের গলার আওয়াজ পেয়ে চমকে ফিরে তাকিয়ে বেশ একটু অবাক হয়ে গেল। একজন সাধারণ খালাসির স্পর্ধা তো বড় কম নয়! মিঃ ব্র্যাডকের খাসকামরায় ঢুকে তাদের মুখের ওপর সে কথা বলছে কোন্ সাহসে!

বিজয় অত্যন্ত গম্ভীর মুখে তাচ্ছিল্যের স্বরে বললে—আমি চেষ্টা করেছি কে বললে?

খালাসির স্পর্ধার আরো বেশি পরিচয় এবার পাওয়া গেল। এগিয়ে এসে একটা চেয়ার টেনে তার পাশেই সে বসে পড়ে আবার বললে—কে আবার বলবে, আমি জানি, আপনি তো হোটেলখানা থেকেই আসছেন।

বিজয় তার কথার উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞাসুভাবে একবার মিঃ ব্র্যাডকের দিকে তাকাল। তাকাবার অর্থ এই যে, এই খালাসিটার স্পর্ধা আপনি সহ্য করছেন কী ক'রে!

মিঃ ব্র্যাডককে তবুও কোনো উচ্চবাচ্য না করতে দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হলেও খালাসিকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা ক'রে, মিঃ ব্র্যাডককে উদ্দেশ্য ক'রেই সে বললে—আমি সেখানে গেছলাম বটে, কিন্তু আমার চেষ্টা আর আপনাদের চেষ্টায় তফাত থাকা উচিত। আমি খোঁজ পাই নি বলে আপনারা পাবেন না?

—কেন পাব না! মিঃ ব্র্যাডক সেই খালাসির দিকে চেয়েই একটু হেসে বললেন—আমরা খোঁজ পেয়েছি। খোঁজ তো দূরের কথা, তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আর সেই কথাই তো আপনাকে বলতে যাচ্ছিলাম।

—তারপর! কী জানা গেল তার কাছে?—বিজয় গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করলে।

সেই খালাসিটা এবার উত্তর দিল—জানা গেল যে এস্. এস্. মান্নার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। বোম্বাইয়ের এক জাহাজে সে কাজ করত। কাজের মেয়াদ ফুরোবার আগেই কিছু চুরি-টুরি ক'রে এখানে পালিয়ে এসেছে। সেইজন্যে গা-ঢাকা দেবার চেষ্টায় ছিল।

বিজয়ের মুখ দেখে তার মনের ভাব অনুমান ক'রে মিঃ ব্র্যাডক বললেন—অত হতাশ হবেন না। এ লক্ষ্যটা ফস্‌কে গেছে বটে, কিন্তু আমরা এমন সব জিনিস জানতে পেরেছি যা আপনি কল্পনাও করতে পারেন না।

—আমার কিছু কল্পনা করবার দরকার নেই। নিজের চোখে আমি যা দেখেছি তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আপনারা কী জানতে পেরেছেন শুনি! বিজয়ের কথা বলার ধরনে বোঝা গেল তাঁদের ওপর বিশেষ আস্থা তার নেই।

মিঃ ব্র্যাডক সেটুকু বুঝেই একটু হেসে বললেন—আমরা প্রথম টাটা কোম্পানির কাছেই খোঁজ নিয়েছি। যে ব্যাঙ্কের মারফত তারা ইস্পাতের অর্ডার ও তার দাম পেয়েছে, তাদেরও বাদ দিই নি। তাতে ইস্পাতের খরিদ্দার হিসাবে ম্যানিলার একটি কোম্পানির নাম পাওয়া গেছে।...

মিঃ ব্রাডকের কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বিজয় বললে—কিন্তু সে-রকম কোনো কোম্পানি ম্যানিলায় নেই, এই তো আপনারা জেনেছেন?

—আপনি ঠিকই ধরেছেন, তবে আমরা আরো বেশি কিছু জেনেছি। সেই কোম্পানি এ পর্যন্ত শুধু ভারতবর্ষ নয়, বার্মা, শ্যাম, বোর্নিও প্রভৃতি দেশ থেকে অনেক টাকার মাল কিনে নিজেদের জাহাজ বোঝাই ক'রে নিয়ে গেছে। ইস্পাত, তামা, টিন প্রভৃতি ধাতুর ওপর তাদের নজর যেন বেশি।

কিন্তু এ-রকম ভুতুড়ে কোম্পানি সম্বন্ধে এতদিন কারো কোনো সন্দেহ জাগে নি কেন?

—সন্দেহ না জাগার কারণ এই যে, টাকাকড়ির ব্যাপারে তাদের ব্যবহার খুব ভালো। কারুর টাকা কখনো মারা পড়ে নি, সুতরাং সন্দেহের কোনো অবসরই হয় নি। জিনিসের ঠিকমতো দাম বুঝে পেলে খরিদ্দারের ঘরের খবর আর কোন্ ব্যবসাদার নেয়!

বিজয় তবু একটু ব্যঙ্গের স্বরে বললে—আপনারা অনেকখানি জেনেছেন বুঝলাম, কিন্তু আমাদের তাতে কী সুবিধা হলো? সে ভুতুড়ে কোম্পানির কাউকে কি এখন ধরা যাবে?

—তা বোধহয় যাবে না!

খালাসির কথা এসব কথাবার্তার মাঝে বিজয় খানিকক্ষণ ভুলেই গেছল। এবার মাঝখান থেকে তার ফোড়ন পাড়ার আস্পর্ধায় চটে গিয়ে সে খিঁচিয়েই উঠল একরকম—তাই যদি না যায় তবে এই পণ্ডশ্রম কেন?

খালাসিটি দাঁতখিঁচুনি খেয়েও নির্বিকারভাবে বললে—পণ্ডশ্রম না-ও হতে পারে কোম্পানির আসল আস্তানা যদি জানা যায়!

—যদি জানা যায় তবে!—তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের স্বরে কথাগুলো বলে বিজয় উঠে পড়ল,—আপনার সময় আর নষ্ট করব না মিঃ ব্র্যাডক, আমি উঠি। ভুতুড়ে কোম্পানির আস্তানা জানলে আশা করি আমায় খবর দেবেন।

—উঠছেন কেন? আসল খবরই যে আপনাকে বলা হয় নি।

—এর পরও আবার আসল খবর আছে নাকি?

—আছে বই কি!—মিঃ ব্র্যাডক চেয়ার থেকে উঠে পাশের শেল্‌ফ থেকে একটা খবরের কাগজের ফাইল টেবিলের ওপর ফেলে বললেন —আপনি নিয়মিতভাবে খবরের কাগজ পড়ে থাকেন বোধহয়?

—নিয়মিত না হলেও পড়ে থাকি।—বিজয় জবাব দিলে।

মিঃ ব্র্যাডক কাগজের ফাইলটা উল্টোতে উল্টোতে একটা পাতা বার ক'রে বিজয়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন—দেখুন দিকি এ খবরটা আপনার নজরে পড়েছিল কি না? বেশিদিনের কথা নয়, মাত্র মাসখানেক আগের।

বিজয় খবরটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে—এ আর এমন কী আশ্চর্য খবর? প্রশান্ত মহাসাগরে অমন জাহাজডুবি মাঝে মাঝে কি হয় না?

—আপনি খবরটা ভালো ক'রে তাহলে পড়ে দেখেন নি। নিচের মন্তব্যটুকু পড়লেই বুঝবেন ব্যাপারটা খুব স্বাভাবিক ও সাধারণ নয়। এক বছরের মধ্যে পাঁচটি বড় বড় জাহাজ প্রশান্ত মহাসাগরে ওই-রকম নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। সবগুলিই ঝড়-জলে ডুবে গিয়েছে এমন কথাও বলা চলে না, কারণ ছুটি জাহাজ নিরুদ্দেশ হবার সময় ঝড়-জলের কোনো চিহ্নই ছিল না বলে লিখেছে।

খবরটা একবার ভালো ক'রে পড়ে বিজয় বললে—ব্যাপারটা খুব আশ্চর্য হতে পারে, কিন্তু এর সঙ্গে আমাদের সমস্যার কী সম্পর্ক আছে বুঝতে পারছি না। আপনি বলতে চান, এসব জাহাজ দৈব দুর্ঘটনায় নষ্ট হয় নি, আরো কিছু রহস্য আছে ভেতরে। হয়তো আপনি আরো বলতে চান, এসব আপনার সেই ভুতুড়ে কোম্পানির কাজ। কিন্তু তারা কে? কী তাদের অভিপ্রায়, কোথায় তারা থাকে?

—তাই বার করবার চেষ্টাই তো হচ্ছে।

—করুন আপনারা সে চেষ্টা, সে আপনাদের দায়। কেঁচো খুঁড়তে

খুঁড়তে আপনারা যদি গোখ্‌রো বার ক'রে ফেলে থাকেন, আপনারা বুঝবেন। কিন্তু আমার কেঁচোর সন্ধানই দরকার।

—কেঁচোর সন্ধান হয়তো গোখ্‌রোর পেটেই পাওয়া যাবে।

—তার মানে আপনারা বলতে চান ঝড়ের ভেতর কলকাতার গঙ্গায় সেদিন যে অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছে, তার সঙ্গে প্রশান্ত মহাসাগরের এইসব জাহাজডুবি ব্যাপারের যোগাযোগ আছে?—বিজয় নিজে থেকেই হেসে উঠল।

—যোগাযোগ আছে বলছি না, কিন্তু দুটি রহস্যের ধারা এক জায়গায় গিয়ে মিশেছে বলে মনে হচ্ছে।

—বেশ তাই না-হয় জানা গেল, কিন্তু এই দুই রহস্যের মূলে পৌঁছবার উপায় ভেবেছেন কি?

মিঃ ব্র্যাডক হেসে বললেন—ভেবেছি বই কি! বার করুন লোকেশবাবু আপনার কাগজ-পত্র।

লোকেশবাবু!

হতভম্ব হয়ে বিজয় পাশের খালাসির দিকে তাকালে। ছি, ছি, কী বোকাই সে বনে গেছে! এতক্ষণ ধরে পাশে বসে কথা কয়েও লোকেশবাবুর ছদ্মবেশ সে ধরতে পারে নি! মিঃ ব্র্যাডকের ঘরে তাঁর সহজ চালচলন দেখেই তো তার বোঝা উচিত ছিল, যদিও লোকেশবাবু নকল দাড়ি গোঁফ ও পোশাকে চেহারা একেবারে বেমালুম বদলে ফেলেছেন।

লোকেশবাবু একটি ড্রয়ার টেনে কয়েকটি খবরের কাগজ কাটা ও একটি ম্যাপ ততক্ষণে বার করেছেন। বিজয়ের দিকে ফিরে একটু হেসে তিনি বললেন—আপনার লজ্জা পাবার কোনো কারণ নেই বিজয়বাবু; নিখুঁত ছদ্মবেশ করাই আমাদের পেশা, সে ছদ্মবেশ ধরা পড়লেই আমাদের লজ্জার কথা। আপনি হোটেলখানায় তাই আমায় চিনতে পারেন নি। তবে এখানে আপনার বোঝা উচিত ছিল।

—আপনি আজ হোটেলখানায় ছিলেন নাকি?

—ছিলাম বই কি! তবে সে খালাসির সন্ধানে নয়। কাল রাত্রেই সে শিয়ালদা স্টেশনে ধরা পড়েছে। মান্নার অন্য কোনো খবর পাওয়া যায় কি না তাই দেখছিলাম। যাক সে কথা।

ম্যাপটি ও খবরের কাগজের টুকরোগুলি বিজয়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে তারপর লোকেশবাবু বললেন—এই ম্যাপে কতকগুলি চিহ্ন দেওয়া আছে দেখতে পাবেন। প্রশান্ত মহাসাগরে পাঁচটি জাহাজ কোথায় কোথায় নিরুদ্দেশ হয়েছে এগুলি তারই নির্দেশ-চিহ্ন। অবশ্য একেবারে নির্ভুল নয়। কিন্তু তা না হলেও একটা বিষয় লক্ষ্য করবার মতো। চিহ্নগুলি মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন, তাদের কোনোটিই পশ্চিমে ১৮০° ডিগ্রি ও পূর্বে ১৪০° ডিগ্রি লঙ্গিচিউডের বাইরে পড়ে না। উত্তর দক্ষিণেও তাদের সীমা হলো বিষুবরেখা থেকে দক্ষিণের ২০° ডিগ্রি ল্যাটিচিউড। অর্থাৎ সবক'টি জাহাজই এই জায়গাটুকুর মধ্যে নিরুদ্দেশ হয়েছে।

—'জায়গাটুকু' আর বলবেন না!—বিজয় একটু হেসে বললে—গোটা ভারতবর্ষ ওই জায়গাটুকুর মধ্যে ধরে যায় অনায়াসে।

—তা অবশ্য যায়, তবু সমস্ত প্রশান্ত মহাসাগরের তুলনায় ওটুকু জায়গা আর কতখানি! এবং ওই জায়গার মধ্যে পাঁচ-পাঁচটা জাহাজ নিরুদ্দেশ হওয়া আশ্চর্য নয় কি?

—এই আশ্চর্য ব্যাপারটা আর কারো মাথায় আসে নি আপনারা বলতে চান? যাদের জাহাজ গেছে তাদেরও নয়?

—তা তো বলছি না। হয়তো আমরা ছাড়াও আরো কেউ এ নিয়ে ভাবছে। কিন্তু আপাতত আমাদের তা দেখবার বিষয় নয়।

—আপাতত আপনাদের দেখবার বিষয় যে কী আমি বুঝতে পারছি না। আপনারা যে জায়গাটুকু নির্দেশ করেছেন তার মধ্যে যে রহস্যই থাক, তার সন্ধান নেবার অধিকারই তো আপনাদের নেই। কলকাতার জলপুলিশ তো আর প্রশান্ত মহাসাগরে হানা দিতে পারে না!

—তা তো পারেই না। পারলে আর আপনাকে ডেকে এসব কথা

বোঝাবার দরকার কী ছিল! পুলিসকে কি কখনো বাইরের লোক ডেকে পরামর্শ ক'রে কাজ করতে দেখেছেন?—লোকেশবাবুই এবার একটু বিদ্রূপের স্বরে বললেন।

—তাহলে আমার বেলায় এই বিশেষ অনুগ্রহটুকু করবার হেতু?

—করবার হেতু এই যে, কলকাতার জলপুলিশ যেখানে যেতে পারে না, সেখানে আপনি অনায়াসে যেতে পারেন, যদি আপনার বন্ধুপ্রীতি অবশ্য আন্তরিক হয়।

শেষের কথার শ্লেষটুকু গায়ে না মেখে বিজয় সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে—সত্যই যদি কোনো রহস্য ওখানে থাকে তাহলেও ওই বিশাল প্রশান্ত মহাসাগরে আমি একলা তা খুঁজে বার করতে পারব আপনারা মনে করেন?

লোকেশবাবু গম্ভীর মুখে বললেন—মানুষ ওর চেয়েও দুরূহ কাজে হাত দিয়েছে বিজয়বাবু! তা ছাড়া আপনি একলা নন, আপনার পেছনে সাহায্য করবার লোক থাকবে।

—কিন্তু আপনাদের ধারণা যে আগাগোড়া ভুল নয় তার নিশ্চয়তা কী? আমার বন্ধুর সন্ধান যে আমি সেখানেই পাব তারই বা ভরসা কী!

—ভরসা হয়তো খুব বেশি নেই, আমাদের ধারণাও হয়তো ভুল, কিন্তু এছাড়া আর কোনো উপায়ও দেখা যাচ্ছে না। এখন আপনি নিজে বুঝে দেখুন।

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বিজয় বললে—বেশ! আমি যাব। কোথায় আমায় যেতে হবে প্রথম?

হাতের পেন্সিল দিয়ে ম্যাপের একটা জায়গা দেখিয়ে মিঃ ব্র্যাডক বললেন—এই ফিনিক্স দ্বীপপুঞ্জে।

ফিনিক্স দ্বীপপুঞ্জে!

মানচিত্রের ওপর অনায়াসে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া যায় বটে, কিন্তু আসলে সেখানে পৌঁছনো যে কী ব্যাপার এই দু-মাসে বিজয় তা হাড়ে হাড়ে বুঝেছে।

দু-মাস ধরে তার জাহাজেই কাটছে। প্রথম কলকাতা থেকে জাহাজে মেলবোর্ন যাবার সময় তার মন্দ লাগে নি নেহাত। তখনো মনে আশা বুকে সাহস ছিল। তখনো ভরসা ছিল অসীমের খোঁজ বোধহয় পাওয়া গেলেও যেতে পারে।

কিন্তু যত দিন গেছে—তত তার সমস্ত আশা ভরসা ক্ষীণ হয়ে এসেছে। সমুদ্রের অসীম বিশাল রূপ দিনের পর দিন দেখে দেখেই বোধহয় তার মন হতাশ হয়ে উঠেছে। তার নিজের অসহায় অবস্থা সে যেন ক্রমশ ভাল ক'রে বুঝতে পেরেছে। কোন্ আজগুবি রহস্যের সন্ধানে সে নিরর্থক চলেছে? একা সে কী-ই বা করতে পারে! মিঃ ব্র্যাডক আর লোকেশবাবু অবশ্য ভরসা দিয়েছেন যে তার পেছনে সাহায্য করবার লোক থাকবে। কিন্তু সে ভরসার আর দাম কতটুকু! এ রহস্যের সন্ধান কোন্ দিক দিয়ে করা যেতে পারে তাঁরা তো কোনো হদিশ দিতে পারেন নি।

শুধু কলকাতা থেকে জাহাজে ওঠবার সময় লোকেশবাবু তাকে একটি সীলমোহর-করা লেফাফা দিয়েছিলেন, এবং বলে দিয়েছিলেন মেলবোর্ন থেকে ফিনিক্স দ্বীপপুঞ্জে যাবার জন্যে হনলুলুর জাহাজে ওঠবার দু-দিন পরে যেন এ লেফাফা খোলা হয়। তার আগে এ লেফাফা খোলা বারণ।

কেন যে বারণ তা লোকেশবাবু বলেন নি। বিজয়ের তখনই মনে হয়েছিল লেফাফা নিয়ে এই রহস্য একটু বাড়াবাড়ি। আসলে কোনো কিছুই জানবার নেই বলেই তাঁরা কিছু একটা রহস্যের আবরণ সমস্ত ব্যাপারটার ওপর দিতে চাচ্ছেন।

মনে মনে সে একটু বোধহয় হেসেছিল। তাকে এই নিরুদ্দেশ যাত্রায় পাঠাবার জন্যে সত্যি এ-রকম ছলের দরকার ছিল না। সে নিজের গরজে যেতে রাজি হয়েছে, কারুর কথায় নয়।

পথে অনেকবার লেফাফাটা খুলে ভেতরে কী আছে দেখবার তার লোভ হয়েছে। কিন্তু সে-লোভ সে সম্বরণ করেছে। সামান্য একটু ব্যাপার বই তো নয়! দেখাই যাক না তাঁদের কথামতো কাজ ক'রে।

মেলবোর্ন থেকে হনলুলুর জাহাজে ওঠার পর থেকে কিন্তু তার কৌতূহল সত্যিই অদম্য হয়ে উঠেছে। আর ছু-দিন বাকি, এতকাল ধৈর্য ধরে থাকবার পর ছু-দিন তার অসহ্য হয়ে উঠেছে।

মনে মনে অবশ্য তার দৃঢ় বিশ্বাস যে লেফাফার ভেতর তেমন কিছু নেই, তবে, সেইটুকু চাক্ষুষ দেখে জানার ব্যস্ততা দমন করা তার পক্ষে এখন অত্যন্ত শক্ত হয়ে উঠেছে।

সকালে মেলবোর্ন থেকে জাহাজ ছাড়বার পর সন্ধ্যাবেলা ডেকে রেলিঙের ধারে দাঁড়িয়ে বিজয় এই চিঠির কথাই ভাবছিল। মাত্র একদিন আগুপিছুতে এমন কী ক্ষতিবৃদ্ধি আর হতে পারে। হনলুলুর জাহাজে উঠে চিঠি খোলাটাই ছিল মিঃ ব্র্যাডক আর লোকেশবাবুর উদ্দেশ্য—সে একদিন আগেই হোক বা পরেই হোক। মনকে এই-ভাবে বুঝিয়ে বিজয় আর এক মুহূর্ত ধৈর্য ধরতে পারলে না। তৎক্ষণাৎ ছুটল তার কেবিনের দিকে। চিঠিটার রহস্যের মীমাংসা এখন হয়ে যাক, তারপর আসল রহস্য উদ্ধারের উপায় ভালো ক'রে ভাবা যাবে। চিঠিটার দরুন যে অনিশ্চয়তার মধ্যে সে রয়েছে সেটা না কাটালে সত্যি কোনো কিছু নিজে থেকে ভাববার শক্তিও সে পাচ্ছে না।

হনলুলুর এই জাহাজে বিজয় খুব ভালো একটি কেবিন ভাগ্যক্রমে পেয়ে গেছে। এ পথে খুব ভালো জাহাজের গতায়াত বিশেষ নেই। মেলবোর্নে কয়েকদিন দেরি ক'রে ফেলার দরুন ডাক-জাহাজে ওঠা তার হয়ে ওঠে নি। সেইজন্যে সাধারণ একটি জাহাজেরই সে টিকিট নিয়েছিল। এবং যাত্রীজাহাজ এটি নয়, মাল বওয়াই এর আসল কাজ, সেইসঙ্গে উপরি-রোজগারের জন্যে কয়েকটি ক'রে যাত্রী তারা

নিয়ে থাকে। বিজয় সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিটই করেছিল, কিন্তু এ জাহাজে সেকেণ্ড ক্লাস মাত্র দুটি। সে দুটিই এবারে ভর্তি থাকায়, তাকে অনুগ্রহ ক'রে ফার্স্ট ক্লাস কেবিনটিই ব্যবহার করবার অধিকার দেওয়া হয়েছিল।

কেবিনটির অন্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বেশি হোক বা নাই হোক সেটি একেবারে আলাদা হওয়ায় বিজয়ের বড় সুবিধে মনে হয়েছিল। কারুর সঙ্গে সম্বন্ধ নেই। ইচ্ছে করলে দিনের পর দিন সে নিজের ঘরেই কাটিয়ে দিতে পারে—এটা তার কাছে মনের বর্তমান অবস্থায় বেশি লোভনীয়।

কিন্তু সুবিধে হওয়ার বদলে কেবিনটি আলাদা হওয়া তার পক্ষে এমন উল্টো হয়ে দাঁড়াবে কে জানত!

লেফাফাটি বার ক'রে পড়বার জন্যে কেবিনের ভেতর ঢুকেই বিজয় অবাক হয়ে গেল। কেবিনের দরজা বেরুবার সময় সে যে আলাদা চাবি দিয়ে বন্ধ ক'রে গেছল সে কথা তার মনে আছে। অথচ এখন দরজা খোলার এক স্টুআর্ড ছাড়া আর কারো কাছে ডবল চাবি থাকবার কথা নয়। স্টুআর্ড যদি কোনো কারণে ঘর খুলেও থাকে তাহলেও যাবার সময় বন্ধ না ক'রে সে নিশ্চয় যাবে না।

তাহলে দরজা খুলল কে! জাহাজেও চোর আছে নাকি?

বিজয় ঘরের জিনিসপত্র বেশ তন্ন-তন্ন ক'রে মিলিয়ে দেখল। না, ট্রাঙ্ক প্রভৃতি সমস্ত জিনিসই তার ঠিক আছে। কিছুই খোয়া যায় নি। দেখে সে খানিকটা প্রথমে নিশ্চিন্ত হলো।

তার মনে হলো, হয়তো স্টআর্ডই কোনো কারণে ঢুকে, যাবার সময় দরজা বন্ধ করতে ভুলে গেছে।

কিন্তু এ ভুল তার অ্যাটাচিকেসটি খুলতে গিয়ে ভাঙল। অ্যাটাচি-কেসটি যথাস্থানেই আছে বটে, কিন্তু তারও চাবি খোলা। উদ্বিগ্ন হয়ে ভেতর থেকে সীলমোহর-দেওয়া লেফাফাটি বার করতে গিয়েই সে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

লেফাফাটি সেখান থেকে উধাও হয়ে গেছে!

ব্যাপারটা এমন অদ্ভুত যে বিমূঢ় হয়ে খানিকক্ষণ নিজের চিন্তাধারাগুলিকে গুছিয়ে নিতেই পারলে না। অনেকগুলি প্রশ্নের মীমাংসা করা তার দরকার। প্রথমত, আর সব জিনিস থাকতে শুধু তার এই চিঠিখানি চুরি করবার এত দায় কার পড়তে পারে? দ্বিতীয়ত, চিঠিখানি যদি কারুর কাছে এত দামীই হয়, তবু তার সন্ধান সে কেমন ক'রে পেলে? চিঠির কথা মিঃ ব্র্যাডক আর লোকেশবাবু ছাড়া আর কারুর জানবার কথা নয়। লোকেশবাবু তাকে কলকাতা থেকে জাহাজে ওঠবার সময় যখন চিঠিটি দেন তখন কেবিনে তারা দু-জন ছাড়া আর কেউই ছিল না। চিঠিটি সেই সময়েই সে অ্যাটাচিকেসের একটি খাপে ভরে রাখে। তারপর এই এতদিনের মধ্যে কোনোদিন নিজেও সে অ্যাটাচিকেস খোলে নি।

না, ব্যাপারটা যতই ভাবা যায় ততই যেন আরো গোলমেলে হয়ে ওঠে। চিঠিটি খোয়া যাওয়ার সবচেয়ে বিপদ এই যে এখন সে সত্যিই সব দিক দিয়ে একেবারে অকূল পাথারে পড়ল। চিঠিটির ভেতর দামী কোনো কথা থাক বা না থাক, তা থেকে নিজের ভবিষ্যৎ গতিবিধি ঠিক করবার সে খানিকটা ইঙ্গিত নিশ্চয়ই পেত। কিন্তু এখন এই অজানা সমুদ্রে মিছিমিছি ঘুরে বেড়ানোই তার সার।

চিঠিটি আবার উদ্ধার হবে এমন আশাও তো নেই। কিন্তু সত্যিই কি নেই? এই সমুদ্রের মাঝখানে জাহাজ থেকে জাদুবলে চিঠিটি উধাও হয়ে যায় নি, সে জানে। যে চিঠিটা সরিয়েছে সে যেমন লোকই হোক, এই জাহাজেই আছে এবং জাহাজ দশদিন বাদে কোনো বন্দরে ঠেকবার আগে পর্যন্তও থাকবে। কিন্তু এই দশদিনে তবু তাকে চিনে বার করবে সে কী ক'রে!

কেই বা সে হতে পারে! নাবিক বা কর্মচারীদের কেউ বোধহয় নয়। তাদের বাদ দিলে থাকে ক-জন যাত্রী। তাদের মধ্যেই কেউ খুব সম্ভবত এ চিঠিটি সরিয়েছে।

অন্ধকারে এবার যেন বিজয় একটু আলোর রেখা দেখতে পেল। চিঠি খোয়া যাওয়াটা দুর্ভাগ্যের বদলে এবার তার অনেকটা সৌভাগ্য

বলেই মনে হয়। যে চিঠি সরিয়েছে সে নিশ্চয়ই শত্রুপক্ষের লোক—সেই ভুতুড়ে কোম্পানি ও জাহাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না হলে এ চিঠির ওপর তার নজর দেবার কোনো মানেই হয় না। সুতরাং যে রহস্যের সন্ধান তার কাছে এতদিন অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল, সমস্ত প্রশান্ত মহাসাগর ঘুরেও সে নিজের চেষ্টায় বার করতে পারত কিনা সন্দেহ, সে সূত্র ভাগ্য আপনা থেকে তার হাতে একরকম তুলে দিয়ে গেল বললেই হয়। এখন এই কয়জন যাত্রীর মধ্যে আসল লোকটি খুঁজে বার করলেই হয়। সে কাজ কঠিন বটে, কিন্তু একেবারে অসাধ্য বোধহয় নয়, কারণ, বিজয় মনে মনে হিসাব ক'রে দেখলে, সকল শ্রেণীর যাত্রী ধরে সাতজন এই জাহাজে আছে। এই সাতজনের ভেতর আসল লোকটিকে কোনোমতেই কি বার করা যাবে না?

চিঠিও ফিরে পাওয়ার জন্যে আর তার কোনো আগ্রহ নেই, তার চেয়ে চোরের সন্ধানই তার কাছে এখন বেশি দরকার। চিঠিচোরের মারফতই সে একেবারে রহস্যের কেন্দ্রে গিয়ে পৌছতে পারবে।

যাত্রীদের কারুর সঙ্গে এখনো তার তেমন পরিচয় হয় নি বটে, তবু তাদের সকলকেই সে দেখেছে। মনে মনে তাঁদের চেহারাগুলো একবার আউড়ে গেল। প্রথমত, ডেকের চারজন দরিদ্র যাত্রী। এক-জন ম্যালে, দুটি চীনে ও একজন পর্তুগীজ। এদের বোধহয় বাদ দেওয়া যায়। ম্যালে লোকটিকে ঠিক গরিব বলা চলে না, অত্যন্ত কঞ্জুস বলেই সে যে দ্বিতীয় শ্রেণীর বদলে ডেকে চলেছে তার আসবাব-পত্র দেখলে এইরকম সন্দেহ হয়। সকালবেলা জাহাজে ওঠার পর তার সঙ্গে বিজয়ের খানিকক্ষণ আলাপও হয়েছিল। ফিনিক্স দ্বীপ-পুঞ্জেরই একটি দ্বীপে তার নারকেল-ছোবড়ার ব্যবসা। ব্যবসার খাতিরে সে মেলবোর্নে এসেছিল।

যাই হোক, ম্যালে লোকটি কৃপণ হলেও এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বলে মনে হয় না। তারপর বাকি থাকে চীনে দু-জন আর পর্তুগীজ। পর্তুগীজটিকে তো অনায়াসেই বাতিল করা যায়। মত্তাবস্থায় জাহাজে উঠে সেই যে সে বিছানায় গিয়েছে এখনো তার ওঠবার নাম নেই।

আর চীনে তুটি নেহাতই মজুর শ্রেণীর। অস্ট্রেলিয়ায় নামতে না পেরে হনলুলুতে কাজের আশায় চলেছে।

ডেকের ক-জনকে বাদ দিলে দ্বিতীয় শ্রেণীর তু-জন ও প্রথম শ্রেণীর একজন মাত্র বাকি থাকে। বিজয়ের মনে হয় সন্ধানের ক্ষেত্র তার এই তিনজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। দ্বিতীয় শ্রেণীর তু-জন যাত্রীর মধ্যে একটি বৃদ্ধ অস্ট্রেলিয়ান আছে। তুপুরে খাবার টেবিলে বসে আলাপ ক'রে বিজয় তাঁর সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র জেনেছে যে, সারাজীবন কঠোর পরিশ্রম ক'রে তিনি যা রোজগার করেছেন, সমস্তই ব্যয় করেছেন প্রশান্ত মহাসাগরের একটি ছোট দ্বীপ কেনবার জন্যে। বিয়ে-থা তিনি করেন নি, সংসারে আর কোনো দায় বা বন্ধন নেই। এই দ্বীপটিই তাঁর জীবনের স্বপ্ন ও সাধনা। জীবনের বাকি ক-টা বছর এই দ্বীপে শান্তিতে কাটিয়ে দিতে তিনি চান, এবং সেই উদ্দেশ্যেই এই জাহাজে চলেছেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর অপর যাত্রীটির কথা মনে হতেই কিন্তু বিজয়ের মনে প্রথম একটু খট্‌কা লাগল। লোকটি দো-আঁশলা ফিলিপিনো, চাল-চলন সাজ-পোশাকে একেবারে মস্ত ধনীর মতো, অথচ কী তুঃখে যে ডাকজাহাজ ছেড়ে এই আধা-মাল-বওয়া জাহাজে এবং প্রথম শ্রেণী ছেড়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে চলেছেন তা বোঝা যায় না।

এই লোকটির ওপর একটু বেশি নজর দেওয়ার সংকল্প ক'রে এবার প্রথম শ্রেণীর অপর যাত্রীটির কথা ভাবতে যাবে, এমন সময় তার দরজায় টোকা পড়ল।

বিজয় একটু আশ্চর্য হয়ে বললে—ভেতরে আসুন—

দরজা খুলে যিনি ভেতরে এলেন তাঁকে দেখে কিন্তু বিজয় আরো বেশি আশ্চর্য হয়ে গেল।

তিনিই সেই প্রথম শ্রেণীর যাত্রী। বিজয়ের চিন্তার বিষয় জানতে পেরেই যেন তিনি নিজে থেকে এসে হাজির হয়েছেন।

বিজয় তার বিস্ময় গোপন করবার কোনো চেষ্টা না করেই বললে—আসুন···তাঁর নামটা না-জানার দরুন তাঁকে কোনো সম্বোধন না

ক'রেই থামতে হলো। ভদ্রলোক নিজে থেকেই কিন্তু বিজয়ের কথাটা শেষ ক'রে দিলেন।

—মঁসিয়ে দুবাস্, আমার নাম মঁসিয়ে দুবাস্। আপনার নাম মিঃ বিজয় দে,—কেমন, তাই নয় ?

বিজয় ঘাড় নাড়ল।

মঁসিয়ে দুবাস্ এবার বিজয়ের কাছে একটা চেয়ারে গিয়ে বসলেন। নাম না বললেও, শুধু কথার টান থেকেই মঁসিয়ে দুবাস্ যে ইংরেজ নয়, ফরাসি, তা হয়তো বিজয় বুঝতে পারত। কিন্তু এভাবে হঠাৎ গায়ে পড়ে আলাপ করতে আসার অর্থ কী ?

মঁসিয়ে দুবাস্ই সে রহস্যের মীমাংসা ক'রে দিলেন।

—আপনি নিশ্চয় খুব আশ্চর্য হচ্ছেন, মিঃ দে···

—তা একটু হয়েছি বই কি—বিজয় স্বীকার করলে।

মঁসিয়ে দুবাস্ একটু হেসে পকেট থেকে একটা লেফাফা বার ক'রে বিজয়ের হাতে দিয়ে বললেন—এইটে আপনাকে দেবার জন্যেই আমায় আসতে হলো।

বিজয় প্রথমটা চমকে উঠেছিল লেফাফা দেখে, কিন্তু সেটি হাতে নিয়ে বুঝতে পারলে তার সে হারানো লেফাফা এটি নয়। এটি 'কেব্‌লগ্রাম' অর্থাৎ বেতারে পাঠানো টেলিগ্রামের খাম। ওপরে তার নাম লেখা।—আপনার ও 'কেব্‌লগ্রাম' খুলে দেখার লোভ আমি সংবরণ করতে পারি নি···

—আপনি খুলে দেখেছেন? কী দেখেছেন?—বিজয়ের গলার স্বর বেশ একটু উত্তেজিত ও কঠিন।

মঁসিয়ে দুবাস্ কিন্তু শান্তভাবেই বললেন—আপনি যা দেখেছেন তাই—দেখেছি সাদা কাগজ। সত্যি কথা বলতে কি, সেইজন্যেই নিজে থেকে এ লেফাফা আপনাকে দিতে এসেছি—আপনার কাছে এই অদ্ভুত ব্যাপারের কোনো অর্থ পাওয়া যায় কিনা জানবার জন্যে। নইলে ভুল ক'রে এ কেব্‌ল আমার ঘরে ফেলে গেছে ভেবে স্টুআর্ডকে দিয়েই আপনাকে পাঠাতে পারতাম।

একটু চুপ ক'রে থেকে বিজয়ের মুখের ভাব লক্ষ্য ক'রে মঁসিয়ে দুবাস্ আবার বলতে লাগলেন—কেব্‌লগ্রামের খামে সাদা কাগজ ভরে ভুল কামরায় রাখা কিরকম রসিকতা বোঝা শক্ত। রসিকটি কে জানি না, কিন্তু তাঁর রসিকতার আরো পরিচয় আছে। আমার অসাক্ষাতে আমার আসবাবপত্রও তিনি ঘেঁটে দেখেছেন টের পেলাম।

বিজয়ের মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল—আপনারও জিনিসপত্র ঘেঁটেছে! কিছু গেছে নাকি?

মঁসিয়ে দুবাস্ একটু হেসে বললেন—আপনার কথায় বোঝা যাচ্ছে আপনার ঘরও বাদ যায় নি। কিন্তু আমাদের দু-জনকেই সমস্ত জাহাজের মধ্যে বাছাই করবার কারণ কী! আমাদের মধ্যে কোথাও কোনো যোগাযোগ আছে বলে তো জানি না!

বিজয় একটু পরিহাস ক'রে বললে—আমরা যা জানি না, অপরে হয়তো তা জানে।

মঁসিয়ে দুবাস্ হেসে বললেন—সত্যি কথা বলতে কি, আমি প্রথম আপনাকেই সন্দেহ করেছিলাম।

—বাঃ, আপনার বিচারবুদ্ধি তো বেশ! আপনার জিনিসপত্র লুকিয়ে ঘেঁটে, আমি নিজেই নিজের নামের লেফাফা আপনার ঘরে রেখে গেছলাম, আপনি মনে করেন?

—তা বটে!—মঁসিয়ে দুবাস্ হেসে বললেন—তবে এই সূত্রে আমাদের আলাপ হয়ে গেল এটা সৌভাগ্য বলতে হবে। এই হতভাগা জাহাজে কথা বলবার লোকের অভাবে হাঁফিয়ে উঠতে হয়।

বিজয় এ-কথার কোনো উত্তর দিলে না। ফরাসি ভদ্রলোকের বেশি ঘনিষ্ঠ হবার কথাটা তার খুব পছন্দ নয়। কিন্তু মঁসিয়ে দুবাসের পরের কথায় সে চমকে উঠল।

মঁসিয়ে দুবাস্ তখন বলছিলেন—অবশ্য এক হিসাবে এ পথে এখন জাহাজে রওনা হওয়াটাই ভুল হয়েছে।

বিজয় বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—তার মানে?

মঁসিয়ে দুবাস্ তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে বললেন—বাঃ, গত

ক-দিনের ভেতর সমুদ্রের এদিকে যে কাণ্ড হয়েছে তাতে ভয় পাওয়া তো স্বাভাবিক।

—কী কাণ্ড হয়েছে? বিজয় উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল।

—আশ্চর্য, আপনি জানেন না! কেন, মেলবোর্নে খবরের কাগজ দেখেন নি?

বিজয় সত্যি বিদেশে এসে খবরের কাগজ দেখবার কথাটা ভাবে নি। লজ্জিতভাবে তাই জানালে।

মঁসিয়ে তুবাস্ যেন একটু সন্দিগ্ধভাবেই তার দিকে তাকিয়ে বললেন—আপনি তাহলে অজানা সাবমেরিনের টর্পেডোতে 'নেভাদা' জাহাজডুবি, গিলবার্ট দ্বীপপুঞ্জের কাছে অদ্ভুত এরোপ্লেন দেখতে পাওয়া, তাই নিয়ে জাপানের ওপর সন্দেহ, এবং অস্ট্রেলিয়া ও জাপানের মধ্যে রাগারাগি, এসব কিছুই জানেন না?

বিজয় তখন স্তব্ধ হয়ে গেছে। সে শুধু মাথা নেড়ে জানালে সে জানে না।

মঁসিয়ে তুবাস্ হঠাৎ কি ভেবে পরে বললেন—দাঁড়ান, আমার কাছে মেলবোর্নের দু-খানি আগেকার কাগজ আছে, আমি আপনাকে এনে দেখাচ্ছি।

মঁসিয়ে তুবাস্ বেরিয়ে গেলেন। বিজয়ের মনে তখন হাজার রকম চিন্তা জট পাকিয়ে গেছে। সুদূর কলকাতায় জলপুলিসের অফিসে বসে মিঃ ব্র্যাডক কি সত্যিই রহস্যের এমন খেই ধরতে পেরেছিলেন যা এইসব বড়-বড় দেশে কেউ জানে না? সত্যিই কি এসব সেই ভুতুড়ে কোম্পানির কাজ? এই প্রশান্ত মহাসাগরে এত বড় দুঃসাহসী অজানা শক্তি কে আছে! এত বড় বিশাল ব্যাপারের সঙ্গে তার ও অসীমের সমস্যার সম্বন্ধ কী!

তার ভাবনার মাঝখানেই মঁসিয়ে তুবাস্ খবরের কাগজগুলো নিয়ে হাজির হলেন। তারপর তার পাশে বসে পড়ে উত্তেজিতভাবে কাগজ খুলে বিজয়কে পড়বার অবসর না দিয়ে নিজেই বলে যেতে লাগলেন—এই দেখুন 'নেভাদা' জাহাজডুবির বিবরণ। অস্ট্রেলিয়া

থেকে পশম নিয়ে যাচ্ছিল ক্যানাডায়, পথে ঝড়ের মুখে একটু পিছিয়ে গিয়ে পড়ে, ফিজি পার হবার পর। হঠাৎ রাত্রে টর্পেডোর আঘাতে জখম হয়ে জাহাজ ডুবে যায়। মাঝি-মাল্লা সবাই জাহাজের সঙ্গে ডুবেছে, শুধু তিনজন কোনোরকমে একটি লাইফবোটে আশ্রয় নিয়ে সমুদ্রে ভেসে পড়ে। দশ দিন দশ রাত্রি তাদের কাটে জলের ওপর; আহার নেই, খাবার জল নেই, সে দারুণ অবস্থা কল্পনাই করতে পারেন না। শেষে আর-একটি জাহাজ যখন তাদের দেখতে পেয়ে তুলে নেয়, তখন দু-জন কাবার হয়ে গেছে, বাকি একজনের অবস্থাও সঙিন। তার কাছে জাহাজডুবির যে বিবরণ পাওয়া যায় তা অনেকে বিশ্বাসই করতে চায় নি। দুঃখে, কষ্টে, উপবাসে সমুদ্রে এতদিন কাটিয়ে তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে বলেই অনেকের ধারণা। সে নাকি জাহাজ ডোবার সময় অজানা অদ্ভুত চেহারার একদল লোককে ছোট ছোট একরকম নতুন ধরনের নৌকোয় তাদের জাহাজে উঠতে দেখেছে। তারা নাকি ডুবন্ত জাহাজ লুট করতেই এসেছিল।

এই ঘটনার ক-দিন পরে গিলবার্ট দ্বীপের কাছে ক-টি এরোপ্লেন দেখা যায়। তাদের গড়ন সাধারণ এরোপ্লেন থেকে একেবারে আলাদা। অস্ট্রেলিয়ার একটি ক্রুজার জাহাজ তখন সেখানে টহলে গিয়েছিল। য়ুরোপের বা আমেরিকার কোনো দুঃসাহসী দল প্রশান্ত মহাসাগর আকাশ পার হচ্ছে ভেবে বেতারে তাদের অভিনন্দন জানায়। কিন্তু এরোপ্লেনগুলি থেকে কোনো সাড়া পাওয়া যায় না, বরং তাড়াতাড়ি সরে পড়বার জন্যেই যেন তারা অন্যদিকে মোড় নিয়ে গতিবেগ বাড়িয়ে দেয়। ক্রুজার জাহাজটি একটু আশ্চর্য হয়ে তারপর বেতারে নানা জায়গায় খোঁজ নেয়, কিন্তু য়ুরোপ আমেরিকার সমস্ত দেশ এবং জাপান ওরকম কোনো জাহাজের কথা অস্বীকার করে।

মঁসিয়ে দুবাস্ ক্লান্ত হয়েই বোধহয় খানিক বাদে থামলেন।

বিজয় জিজ্ঞাসা করলে—এ ব্যাপারে জাপানকে সন্দেহ করার কারণ?

মঁসিয়ে হুবাস্ একটু যেন হাসলেন।—জাপান ছাড়া প্রশান্ত মহাসাগরে আর এ-রকম কোনো শক্তির কথা তো জানা নেই।

—জাপান কী বলেছে এ বিষয়ে ?···বিজয় জিজ্ঞাসা করলে।

—কিছুই এসব ব্যাপারের জানে না—এছাড়া আর কী বলবে !

বিজয় খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে—এসব ব্যাপার থেকে একটা বড়রকমের গণ্ডগোল বাধতে পারে তাহলে ?

মঁসিয়ে হুবাস্ বললেন—পারেই তো। তবে এখনো আসল ব্যাপারটা কী, এবং সত্যিকার দোষ কার, ঠিক বুঝতে পারা যাচ্ছে না বলেই সবাই চুপ ক'রে আছে।

বিজয় এবার কিছুই যেন জানে না সেইরকম ভান ক'রে বললে—কিন্তু একটা জাহাজডুবি আর ক-টা এরোপ্লেন দেখতে পাওয়া—এ আর এমন কী গুরুতর ব্যাপার! তাও জাহাজডুবির বিবরণ ঠিক কি না কেউ জানে না, সেটা সেই নাবিকের বিকারের প্রলাপও তো হতে পারে! হয়তো জাহাজ থেকে পড়েই ডুবে গেছল।

—একটা জাহাজডুবি! বলেন কী?—মঁসিয়ে হুবাস্ বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন—এই সমুদ্রের এই অঞ্চলে এ পর্যন্ত কতকগুলি জাহাজ নিরুদ্দেশ হয়েছে জানেন ?

—না, সে আর আমি জানব কী ক'রে! কিন্তু আমাদের ভাষায় একটা কথা আছে, আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে দরকার নেই।

মঁসিয়ে হুবাস্ হেসে ফেলে বললেন—কথাটা ভালো। কিন্তু আমরা আপাতত জাহাজের যাত্রী বলেই জাহাজের খবর আমাদের রাখা ভালো।

—আপনি কি মনে করেন, আমাদের জাহাজেরও কোনো বিপদ হতে পারে ?

—হওয়া অসম্ভব অন্তত নয়। সে যাই হোক আমাদের নিজেদের রহস্যটিই আগে মীমাংসা করা দরকার। আমাদের দু-জনের কামরা ঘাঁটাঘাঁটি ক'রে 'কেব্‌লগ্রাম' দিয়ে কে রসিকতা করলে সেটা বার করতে হবে। আপনি আর আমি যদি একসঙ্গে চেষ্টা করি···

কথার মাঝখানে দরজার কাছে একটা ক্ষীণ শব্দ পেয়ে হঠাৎ থেমে পড়ে মঁসিয়ে ছুবাস্ একলাফে উঠে গিয়ে কামরার দরজাটা খুলে ফেললেন। বাইরের করিডোর অন্ধকার। সেই অন্ধকারেও কিন্তু একটা দীর্ঘ মূর্তি বিদ্যুৎগতিতে সরে গেল বলে টের পাওয়া গেল।

বিজয় মঁসিয়ে ছুবাসের পেছনেই এসে দাঁড়িয়েছিল। দু-জনে তৎক্ষণাৎ মূর্তিটি যেদিকে সরে গেছে সামনের সেই খোলা ডেকের দিকে তাকে অনুসরণ করলে। কিন্তু তারা ডেকে গিয়ে পৌঁছবার আগেই রেলিং টপ্‌কে সে নিচে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

বিজয় নিজেও রেলিং টপ্‌কে নিচের ডেকে যাবার উদ্যোগ করছিল, কিন্তু মঁসিয়ে ছুবাস্ তাকে হাত ধরে নিরস্ত করলেন।

—আপনার যাওয়া বৃথা, নিচের ডেকে এখন আর তাকে খুঁজে পাবেন না। হায়রানিই সার হবে।

বিজয় উত্তেজিতভাবে বললে—কিন্তু আমি ক্যাপ্টেনকে এখুনি একথা জানাচ্ছি। এর একটা বিহিত দরকার।

—কিন্তু ক্যাপ্টেনের বিহিত করবার কী আছে! সে কাকে কী প্রমাণে ধরবে বলুন?

কথাটা সত্যি বলে বুঝে বিজয় চুপ ক'রে রইল। তারপর বললে—কিন্তু কিছুই আমাদের করবার নেই?

—আছে বই কি। কিন্তু আমাদের শত্রু যে-ই হোক—খুব চতুর। করিডোরের আলোটা পর্যন্ত কেমন আগে থাকতে নিভিয়ে রেখেছে দেখতে পাচ্ছেন না? তাকে সোজা পথে নয়, ফাঁদ পেতে ধরতে হবে, এবং ফাঁদ পাততে হলে সকলের মধ্যে জানাজানি না হওয়াই ভালো।

বিজয় খানিকক্ষণ কোনো কথা বললে না; অন্ধকারে কালো সমুদ্রের ঢেউ যেখানে গর্জন ক'রে জাহাজের গায়ে এসে আছড়ে পড়ে আলোময় ফেনা হয়ে উঠেছে সেইদিকে তাকিয়ে কী যেন সে ভাবছিল।

খানিক বাদে মুখ না ফিরিয়েই সে বললে—আমি কিন্তু এখনো

বুঝতে পারছি না, এ জাহাজে আমাদের এ-রকম শত্রু কোথা থেকে আসবে।

মঁসিয়ে দুবাস্ গম্ভীর হয়ে বললেন—সেটা আমি কতকটা বোধহয় বুঝতে পারছি।

বিজয় হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে একটু বিরক্তির স্বরে বললে—কিন্তু আমাদের দু-জনকে একসঙ্গে জড়াবার মানে কী?

—সেটা আমিও বুঝতে পারছি না—বলে মঁসিয়ে দুবাস্ হাসলেন।

৬

সে রাত্রে ঘুম কি আর আসতে চায়!

কেবিনটির যে নির্জনতা বিজয় গোড়ায় সৌভাগ্য বলে মনে করেছিল তাই তার কাছে অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠল।

অস্বস্তিটা যে কিসে তা ঠিক সে অবশ্য জানে না। স্পষ্ট কোনো ভয় তার নেই। কেউ তার শারীরিক কোনো অনিষ্ট করতে চায় বলেও তার ধারণা নয়। তবু কেবিনের বাইরে অন্ধকারে কি যেন নামহীন একটা বিষাদ, সমুদ্রের কালো জল মন্থন ক'রে জাহাজের একঘেয়ে চলার শব্দে কি যেন একটা আতঙ্কের আভাস আছে বলে তার মনে হয়।

জাহাজটা যেন ধাতু আর কাঠের যন্ত্র-মাত্র নয়, বিশাল একটা জীবন্ত প্রাণী, কূলহীন সমুদ্রের মাঝে ভয়ঙ্কর একটা ভবিষ্যতের দিকে নিজের ইচ্ছায় চলেছে।

অনেকক্ষণ ধরে নানারকম চেষ্টা করেও ঘুমোতে না পেরে বিজয় শেষে উঠে পড়ল। তারপর মনের অস্বস্তিটা জোর ক'রে জয় করবার জন্যেই বেরিয়ে গেল ডেকের ওপর। মনের অস্বাভাবিক ছম্‌ছমে ভাবটা সেখানে সত্যি কেটে গেল।

চাঁদের আলো নেই, কিন্তু অগুন্‌তি তারায় আকাশে যেন আলোর

রোমাঞ্চ হয়েছে। সেই তারা-ছিটানো অন্ধকারেরই যেন কোন্ গোপন গহ্বর থেকে হু-হু ক'রে বাতাস বইছে ঝড়ের মতো। আকাশের দিকে তাকিয়ে খানিক সে হাওয়ার ভেতর দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে মনে হয় যেন সমুদ্রের ওপর দিয়ে জল ঠেলে নয়, তারায় ভরা আকাশের নিচে হাওয়ার ভরেই তাদের জাহাজ ভেসে চলছে শূন্যপথে।

পৃথিবী-ছাওয়া এই তারা-ছিটোনো সুন্দর অন্ধকারের মধ্যে কোথাও কোনো ভয়ঙ্কর রহস্য ঘনিয়ে উঠছে একথা বিশ্বাস করতেই প্রবৃত্তি হয় না, কিন্তু সেকথা বেশিক্ষণ ভুলে থাকার জো কী!

এই প্রশান্ত মহাসাগরেরই কোনো আজানা কোণে এমন দুর্বোধ্য জটিল একটা ষড়যন্ত্র ও পৈশাচিক আয়োজন চলছে যার আঁচ শুধু পৃথিবীর বড়-বড় দেশের গায়েই নয়, তার মতো সাধারণ একটি ছেলের জীবনেও লেগেছে। নগণ্য এই মাল-বওয়া জাহাজটাও সে ভয়ঙ্কর রহস্যের ছোঁয়াচ থেকে রক্ষা পায় নি।

ব্যাপারটা আগাগোড়া ভাবলে কিন্তু কোনো কূলকিনারাই পাওয়া যায় না। ঝড়ের রাত্রে গঙ্গার জেটিতে বাঁধা সেই লোমহর্ষক দৃশ্য আর প্রশান্ত মহাসাগরে জাহাজডুবি ও এরোপ্লেনের আবির্ভাব, এইসব ব্যাপারের যোগাযোগ থাকা কেমন যেন আজগুবি বলেই মনে হয়।

কিন্তু তবু যোগাযোগ যে কিছু একটা আছে অস্বীকার করা যায় না একেবারে। সেই যোগসূত্রে সেও এমনভাবে কোথায় জড়ায় যে তার ঘরেও গুপ্তচরকে আড়ি পাততে হয়!

গুপ্তচর অবশ্য শুধু তার ওপর নয়, মঁসিয়ে দুবাসের ওপরেও নজর দিয়েছে। সুতরাং মঁসিয়ে দুবাস্ এই রহস্যের সঙ্গে কোনোভাবে জড়িত এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। শুধু, সম্পর্কটা তাঁর কী প্রকারের তা এখনো ধারণার অতীত।

মঁসিয়ে দুবাসের কথা মনে হতেই নিজের অজান্তে বিজয় ডেকের অপর প্রান্তে দৃষ্টি ফিরিয়েছিল। সেইখানে মঁসিয়ে দুবাসের কেবিনে এত রাত্রে আলো দেখে সে একটু অবাক হয়ে গেল। দুবাস্ কি

এখনো তারই মতো জেগে আছেন নাকি! না, আলো জ্বেলে রেখে ঘুমোনই তাঁর অভ্যাস।

সন্ধ্যারাত্রের ঘটনাটা মনে পড়ায় বিজয় একটু উদ্বিগ্নই হয়ে উঠল। এই গভীর রাত্রে আবার কেউ তার ঘরে হানা দেয় নি তো? না, ব্যাপারটার একটু খোঁজ নেওয়া দরকার।

খুব সন্তর্পণে পা টিপে টিপে মাঝখানের ডেকের অংশটুকু পার হয়ে বিজয় মঁসিয়ে ডুবাসের কেবিনের পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

কেবিনের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। দরজার ওপরকার ভেন্টিলেটর দিয়েই ভেতরকার আলো দেখা যাচ্ছে।

দরজা বেয়ে উঠে ভেন্টিলেটর দিয়ে উঁকি মেরে দেখবে কিনা বিজয় এটা স্থির করতে পারল না। দরজার বাইরে খানিক কান পেতে থাকার পর কিন্তু কৌতূহল দমন করা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল।

ভেতরে মৃদু কি-রকম একঘেয়ে শব্দ শোনা যাচ্ছে।

সামান্য একটু লাফ দিয়ে হাত বাড়িয়ে সে ভেন্টিলেটরের খাঁজটা ধরে ফেললে। তারপর হাতের ভরে উঠে ভেন্টিলেটরের ফাঁক দিয়ে ভেতরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই চমকে উঠল।

ঘরে মঁসিয়ে ডুবাস্ ছাড়া আর কেউ অবশ্য নেই। কিন্তু তিনি করছেন কী?

যে যন্ত্রটি সামনে নিয়ে মঁসিয়ে ডুবাস্ তন্ময় হয়ে কাজ করছিলেন সেটি যে বেতার সংবাদ পাঠাবার একটি ক্ষুদে সেট, তা বিজয় প্রথম দর্শনেই বুঝেছিল।

এই গভীর রাত্রে গোপনে সেট নিয়ে মঁসিয়ে ডুবাস্ কোনো নির্দোষ পরীক্ষা করছেন বলেও তার মনে হলো না। এ-রকম বেতার সেট কেবিনে লুকিয়ে রাখাই বেশ সন্দেহজনক। বেতারে কোনো গোপন সংবাদ পাঠানো ছাড়া তার আর কোনো সার্থকতাই থাকতে পারে না।

মঁসিয়ে ডুবাসের হঠাৎ কোথায় কী এমন গোপন সংবাদ পাঠাবার তাড়া হতে পারে বিজয় ভেবে পেল না।

ব্যাপারটা সম্বন্ধে ভবিষ্যতে ভালো ক'রে সন্ধান নেওয়াই যুক্তিযুক্ত

বুঝে বিজয় সন্তর্পণে নেমে যাবার উপক্রম করছিল, কিন্তু এমন একটা ফ্যাসাদ তাতে বাধবে কে জানত!

নামতে গিয়ে বেকায়দায় একটা পা কাঠের মেঝেতে হড়কে গিয়ে বিজয় সশব্দে মাটিতে পড়ে গেল।

সামলে উঠে সরে পড়বার চেষ্টা করবার আগেই দেখা গেল—মঁসিয়ে তুবাস্ দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন।

বিজয় কৈফিয়ত দেবার মতো কোনো কথাই খুঁজে না পেয়ে তখন বিমূঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে। মঁসিয়ে তুবাস্ই প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের সঙ্গে মোলায়েম ক'রে বললেন—একি, মিঃ দে—আপনি! অন্ধকারে আপনার কেবিন চিনতে পারছিলেন না বুঝি?

—না না, তা নয়, আপনার ঘরে আলো দেখে ভাবলাম—বিজয় আমতা আমতা ক'রে তার কথা শেষ করবার আগেই মঁসিয়ে তুবাস্ হেসে বললেন—ভাবলেন আবার বুঝি গুপ্তচর আমার কামরায় হানা দিয়েছে?

এবার বিজয়কে একরকম জোর করেই নিজের ঘরে টেনে নিয়ে গিয়ে তুবাস্ আবার বললেন—আমাকে এভাবে সাহায্য করতে আসার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ মিঃ দে! কিন্তু একটা ভুল ক'রে ফেলেছেন যে!

মঁসিয়ে তুবাসের মোলায়েম কণ্ঠস্বর ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠল এবার—জানলা দিয়ে আড়ি পেতে দেখাটা আপনার ঠিক উচিত হয় নি। বিশেষ ক'রে আপনি যা দেখেছেন তার একটা দর্শনী আছে বড়রকম!

বিজয় এতক্ষণে তার ভ্রমে ধরা পড়ার সংকোচটা কাটিয়ে উঠেছে। মঁসিয়ে তুবাসের বিদ্রূপে বরং বেশ একটু উষ্ণই সে হয়ে উঠল।

—দর্শনীটা শুনতে পাই?—সে দাঁতে দাঁত চেপে বললে।

—দর্শনীটা আপনার স্বাধীনতা। আপনি যা দেখেছেন তার মানে আপনি বুঝেছেন কি না জানি না, কিন্তু তবু আপনাকে ছেড়ে দিতে আর আমি পারব না।

—আপনি আমায় জোর ক'রে ধরে রাখবেন?—বিজয় মঁসিয়ে ডুবাসের দিকে চেয়ে হেসে উঠল। মঁসিয়ে ডুবাসের মতো শান্তশিষ্ট একটা লোককে সে এক হাতের মুঠোতেই কাবু করতে পারে।

কিন্তু হাসি তার মুখেই মিলিয়ে গেল পরমুহূর্তে। মঁসিয়ে ডুবাস্ বিদ্যুৎগতিতে পকেট থেকে একটি পিস্তল বার ক'রে বললেন—হ্যাঁ, জোর ক'রে ধরে রাখব, এমনকি দরকার হলে প্রাণে মেরেও।

বিজয় খানিক নীরবে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মঁসিয়ে ডুবাসের কঠিন মুখ ও হাতের পিস্তলের দিকে লক্ষ্য ক'রে বললে—আপনার বেতার সেট এমন দামী আমি জানতাম না। কিন্তু একেবারে প্রাণে না মারলে আপনি এ কামরায় পিস্তলের ভয় দেখিয়ে আমায় বন্দী ক'রে রাখবেন কতক্ষণ? সকাল হলেই তো খোঁজ পড়বে, আপনার ঘরেও স্টুআর্ড আসবে নানা কাজে।

মঁসিয়ে ডুবাস্ হাসলেন—এ জাহাজের সেরকম সকাল আর আসবে না।

—তার মানে?—বিজয়ের গলা এবার ভয়ে উত্তেজনায় সত্যি কেঁপে গেল—এ জাহাজও কি তাহলে আজকেই ডুববে! আপনি তাহলে কি প্রশান্ত মহাসাগরের সেই গোপন রাজ্যের একজন? বেতারে কি তাদেরই আপনি খবর পাঠাচ্ছিলেন?

—একটি ছাড়া আপনার সব অনুমানই সত্য। আমি সেই গোপন রাজ্যেরই লোক, বেতারে আমি নিজেদের যুদ্ধজাহাজেই এ জাহাজের সন্ধান দিয়েছি। কিন্তু জাহাজ আমরা ডোবাবো না, অমন বেহিসাবী আহাম্মুক আমরা নই। একটা জাহাজের দাম আমাদের কাছে অনেক।

বিজয় উত্তেজিতভাবে এর উত্তরে কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ঠিক সামনের দিকে চেয়ে একটি অদ্ভুত ব্যাপার দেখে সে মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল।

এ কেবিনের দুটি দরজা। যে দরজা দিয়ে সে ঢুকেছে তার বিপরীত দিকের দরজাটির ওপরকার ভেন্টিলেটর-জানলায় একজোড়া চোখ স্পষ্টভাবে তখন দেখা যাচ্ছে।

চোখজোড়া যারই হোক, এ সময় সে যে তার বন্ধু একথা বুঝতে বিজয়ের দেরি হলো না। লোকটি মুখে আঙুল দিয়ে ইশারা ক'রে তার বিশ্বাস আরো দৃঢ় করে দিয়েছে তখন। মুহূর্তের মধ্যে নিজের বিস্ময় সামলে নিয়ে মঁসিয়ে দুবাস্‌কে অন্যমনস্ক রাখবার জন্যেই বিজয় আবার কথা শুরু ক'রে দিলে।

—জাহাজ আপনারা ডোবাবেন না, কিন্তু যাত্রী আর মাঝি-মাল্লাদের কী গতি হবে? তাদের কি মেরে ফেলা হবে?

মঁসিয়ে দুবাস্ বললেন—না, অকারণে নিষ্ঠুর আমরা হই না। লাইফবোটে ছেড়ে দেওয়া হবে। বেতারে জাহাজডুবির খবরও চারিধারে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। তার পরেও যদি তারা উদ্ধার না হয়, সে তাদের ভাগ্য।

—বুঝলাম, অসীম আপনাদের করুণা! কিন্তু সবাইকে যদি ছেড়ে দেন তাহলে আমার বেলায় নিয়মের ব্যতিক্রম হবে কেন?

—হবে, আপনার নিজের দোষে! আপনি বড় বেশি জেনে ফেলেছেন—মঁসিয়ে দুবাস্ একটু শুষ্ক হাসি হেসে বললেন—আমাদের এখনো অনেক জাহাজ এইভাবে সংগ্রহ করতে হবে। জাহাজের ভেতর থেকেই আমরা বেতারে তার অবস্থানের সংবাদ নিজেদের জনকে জানাই, এ খবর বাইরে প্রচার হওয়া আমাদের অভিপ্রায় নয়। আপনাকে তাই ছেড়ে দেওয়া সম্ভব নয়।

—কিন্তু আপনারা কে? কোথায় আপনাদের আস্তানা? কী আপনাদের উদ্দেশ্য?—মুখে যন্ত্রের মতো কথা বললেও বিজয় একাগ্রভাবে পিছনের জানলার দিকেই এতক্ষণ লক্ষ্য রেখেছিল। সেখানে প্রথমে দুটি পা নিঃশব্দে বেরিয়ে এসেছিল, তারপর দেহটিকে সন্তর্পণে গলিয়ে দিয়ে যে লোকটি নেমে এল তাকে চিনতে পেরেই বিস্ময়ে বিজয়ের গলা শেষ দিকটা কেঁপে গেল।

সত্যি কথা বলতে কি, এই অবস্থায় এই লোকটির আবির্ভাব সে কল্পনাই করতে পারে নি।

লোকটি আর কেউ নয়,—নগণ্য ডেকের প্যাসেঞ্জার সেই ম্যালে।

বিজয়ের গলার স্বরে বা চোখের দৃষ্টিতে, যা থেকেই হোক, বিপদের আভাস পেয়ে মঁসিয়ে তুবাস্ সেই মুহূর্তে পেছু ফিরে তাকালেন। কিন্তু তখন আর সময় নেই।

ম্যালের জোরালো একটি ঘুসিতে মঁসিয়ে তুবাসের হাতের পিস্তল দূরে ছিটকে পড়ে গেল। বিজয় তাড়াতাড়ি সেটা কুড়িয়ে নিয়ে উত্তেজিত স্বরে বললে—কাপ্তেনকে একটি খবর দেওয়া দরকার। বেতার-খবর পেয়ে শত্রুপক্ষের জাহাজ আজ রাত্রেই আমাদের আক্রমণ করতে আসছে। মঁসিয়ে তুবাস্ প্রশান্ত মহাসাগরের সেই দুশমনদের দলের লোক!

মঁসিয়ে তুবাস্ তখন ঘুসি-খাওয়া হাতের ব্যথায় কাতর হয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়েছেন। কিন্তু সেই অবস্থাতেই তিনি বিদ্রূপ ক'রে হেসে উঠলেন—আমি তো দুশমনদের লোক; আপনি যাকে বিশ্বাস ক'রে কথাগুলো বলছেন, তার পরিচয়টা ঠিক জানেন কি মিঃ দে? আপনার চিঠি চুরি, আমাদের নামে মিথ্যে 'কেব্‌লগ্রাম' পাঠাবার মূলে কে জানেন?—মঁসিয়ে তুবাস্ উত্তেজিতভাবে ম্যালের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন—এই!

বিজয় ম্যালে লোকটির দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল। লোকটিকে এ অবস্থায় হাসতে দেখে সত্যি তার অবাক লাগল।

মঁসিয়ে তুবাস্ জোর গলায় আবার বললেন—এসব কথা ও অস্বীকার করুক দেখি কেমন পারে!

ম্যালে লোকটি আগের মতোই হেসে বললে—অস্বীকার তো করছি না।

বিজয় হতভম্ব হয়ে একবার মঁসিয়ে তুবাস্ একবার সেই ম্যালের দিকে তাকালে।

এ আবার কী রহস্য!



ম্যালের জোরালো একটি ঘুসিতে খসিয়ে দুবাসের হাতের পিস্তল…

বিজয় সত্যি থতমত হয়ে গেছল। এ অবস্থায় চট্ ক'রে কর্তব্য নির্ধারণ করা শক্ত বইকি! এদের দু-জনের কাকে সে বিশ্বাস করবে? দু-জনের কাউকেই বিশ্বাস করা যায় কি?

মঁসিয়ে দুবাস্ বিজয়ের দ্বিধার সুযোগ নিয়েই দাঁড়িয়ে উঠে বললেন—শুনলেন তো! এখন আপনি ইচ্ছে করলে একে দিয়ে কাপ্তেনকে খবর দিতে পারেন; কিন্তু তাতে প্রশান্ত মহাসাগরের দুশমনদের কোনো কিনারা হবে না, আমার এত কষ্টে পাতা ফাঁদ শুধু ব্যর্থ হয়ে যাবে।

বিজয় ম্যালে লোকটির দিকে তাকাল। সে নীরবে তখনো দাঁড়িয়ে আছে। মুখে শুধু তার একটু যেন ঘৃণা ও বিদ্রূপের হাসি।

—আপনার কিসের ফাঁদ? এই জাহাজ ধরিয়ে দেওয়ার ফাঁদ তো!—বিজয় উষ্ণস্বরে মঁসিয়ে দুবাস্‌কে জিজ্ঞাসা করলে।

এতক্ষণে মঁসিয়ে দুবাস্ হেসে উঠলেন, বললেন—আপনি সরল মনে তাহলে আমার সব কথাই বিশ্বাস করেছেন! আপনি কি সত্যি মনে করেন আমি দুশমনদের দলের লোক, বেতারে তাদের খবর দিয়ে ডেকে আনছিলাম?

—তাহলে আপনার এ-সব কথা বলার মানে কী? আপনি বেতারের সেট নিয়ে করছিলেনই বা কী?—বিজয়ের স্বরে একসঙ্গে বিস্ময়, সন্দেহ, বিমূঢ়তা সবই তখন ফুটে উঠেছে।

মঁসিয়ে দুবাস্ গম্ভীর হয়ে ম্যালেকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন—এই লোকটির জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। একে ধরবার জন্যেই আমার এই ফাঁদ। শুনুন মিঃ দে—প্রশান্ত মহাসাগরের দুশমনদের গুপ্তচর আমি নই,—গুপ্তচর এই!

বিজয়ের মুখে তখন আর কথা নেই।

—তাই যদি হয়, তাহলে আপনি কী করতে চান?—ম্যালে লোকটি তেমনি অদ্ভুতভাবে হেসে জিজ্ঞাসা করলে।

বিজয় অবাক হয়ে তার দিকে চাইতেই মঁসিয়ে দুবাস্ আবার বিজয়কে উদ্দেশ ক'রে বললেন—আপনার ওপরই এখন সব নির্ভর

করছে মিঃ দে ; পিস্তল আপনার হাতে, আপনি ইচ্ছে করলে এখন অনায়াসে একে ধরে রাখতে পারেন। দোহাই আপনার, এমন সুযোগ হেলায় নষ্ট করবেন না। প্রশান্ত মহাসাগরের রহস্য উদ্ধারের এমন সূত্র আর পাওয়া যাবে না।

—কিন্তু আপনাকেই বা আমি বিশ্বাস করব কী বলে? খানিক আগে আপনি তো আমাকেই পিস্তল দেখিয়ে শাসাচ্ছিলেন!

—আপনি এখনো বুঝতে পারেন নি মিঃ দে!—মঁসিয়ে দুবাস্ ব্যাকুলভাবে বললেন—সে শুধু একটা ছল মাত্র! আমি এই লোকটির জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম; আমি জানতাম, আজ রাত্রে সে একবার আমার ঘরে হানা দিতে আসবে। তার আগেই যখন হঠাৎ আপনি এসে পড়ে আমার মতলব ভেস্তে দিলেন, তখন আপনাকে ছেড়ে দেওয়া যায় না, অথচ সব কথা বুঝিয়ে বলার সময় এবং সুযোগ নেই, কারণ যে-কোনো মুহূর্তে এই গুপ্তচর এসে পড়তে পারে। সেই-জন্যই আপনাকে শাসাবার ভান ক'রে আমি সময় কাটাচ্ছিলাম। হাত থেকে বেটপ্কা ওর ঘুসিতে পিস্তলটা ছিটকে না গেলে আমার ফন্দি সফলও হতো।

এতগুলো কথা এক নিশ্বাসে বলে ফেলে মঁসিয়ে দুবাস্ উদ্গ্রীব-ভাবে বিজয়ের মুখের দিকে তাকালেন। বিজয়ের বিমূঢ়তা কিন্তু তখনো কাটে নি। সে আবার জিজ্ঞাসা করলে—কিন্তু আপনার ঘরে যে আজ রাত্রেই গুপ্তচর হানা দেবে সে-কথা এমন নিশ্চিতভাবে আপনি জানলেন কী করে?

—জানলাম এইজন্যে যে ওদের মতলব হাসিল করার পথে আমিই একমাত্র বাধা। আমি ওদের সম্বন্ধে এত কথা জানি ও ওদের সময় এত অল্প যে আজ রাত্রেই আমাকে সরাবার চেষ্টা না করলে সব আয়োজন পণ্ড হতে বাধ্য!

বিজয় আবার ম্যালের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালে। আশ্চর্য, লোকটা তখনো নির্বিকারভাবে হাসছে। রাগ বা ভয়ের আভাস কিছুই তার মুখে নেই। এ অভিযোগ সত্য কি মিথ্যা তার মুখ দেখে

বলা যায় না। তবু সকল দিক থেকে বিচার ক'রে বিজয়ের মন তার বিরুদ্ধেই এখন গেছল।

তা সত্ত্বেও সে মঁসিয়ে দুবাস্‌কে শেষবার প্রশ্ন করলে—কিন্তু আপনি কোথায় বেতার-সংবাদ পাঠাচ্ছিলেন, আর আপনিই বা কে সেটা তো জানতে পারলাম না।

মঁসিয়ে দুবাস্ হেসে বললেন—সেটাও আপনার জানা দরকার? শুনুন তাহলে। আমি বেতারে খবর পাঠাচ্ছিলাম কাছাকাছি একটি অস্ট্রেলিয়ান যুদ্ধ-জাহাজকে আমাদের সাহায্যে আসবার জন্য, আর অস্ট্রেলিয়ার হয়ে সমুদ্রপথে গোয়েন্দাগিরিই আমার কাজ। বিশেষ ক'রে এখানকার এই ঘটনাগুলির তদন্তের জন্যই আমি ও আমার কয়েকজন সঙ্গী এদিকের জলপথে কিছুদিন থেকে ঘুরছি।

—তা বেশ করছেন গোয়েন্দা মশাই!—বিদ্রূপের সুরে ম্যালে এবার বলে উঠল—কিন্তু অস্ট্রেলিয়ান যুদ্ধ-জাহাজে খবর পাঠিয়েও বিশেষ সুবিধে করতে পেরেছেন বলে মনে হচ্ছে না!

—তার মানে?—আপনা থেকেই বিজয়ের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

সামনের খোলা দরজা দিয়ে দূরের অন্ধকার সমুদ্রের দিকে আঙুল দেখিয়ে ম্যালে লোকটি গম্ভীর স্বরে বললে—তার মানে প্রশান্ত মহাসাগরের দুশমন আমাদের শিয়রে এসে হাজির। ওই দেখুন তার নিশানা।

সত্যই সে-মুহূর্তে কিছু দূরের আকাশ উজ্জ্বল একটা আতসবাজির আলোয় যেন ঝল্‌সে গেল। ক্ষণিকের জন্য হলেও, সে-আলোয় অদূরে সমুদ্রে বিশাল একটি অদ্ভুত চেহারার জাহাজও দেখা গেল।

আতসবাজির আলো মিলিয়ে যেতেই শোনা গেল কামানের গর্জন ও তার সঙ্গে-সঙ্গেই বিজয়ের মাল-বওয়া জাহাজে অসাধারণ একটা ব্যস্ততার সাড়া পাওয়া গেল। ঘুমন্ত জাহাজ যেন চমকে জেগে উঠে আসন্ন বিপদে দিশেহারা হয়ে পড়েছে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে পর-পর ঘটনায় বিজয় একটু বুঝি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। সে-অন্যমনস্কতায় এমন ফল হবে সে নিশ্চয় ভাবে নি।

হঠাৎ চমকে উঠে সে টের পেল তার অন্যমনস্কতার সুযোগে পিস্তলটা ছিনিয়ে নিয়ে সেই ম্যালে রুখে দাঁড়িয়েছে।

মঁসিয়ে হুবাস্ আকস্মিক বিপদে হতভম্ব হয়ে বোধহয় পালাবার চেষ্টায় ছিলেন। দরজার কাছাকাছি তিনি ইতিমধ্যে এগিয়েছিলেন, কিন্তু চৌকাঠ পার হওয়া আর তাঁর হলো না।

—সাবধান মঁসিয়ে হুবাস্! জীবনের মায়া থাকলে দরজার বাইরে যাবার চেষ্টা করবেন না!—ম্যালে বজ্রস্বরে হেঁকে উঠল।

মঁসিয়ে হুবাস্‌কে অগত্যা থামতেই হলো। ম্যালের হুকুমে তিনি আস্তে আস্তে সভয়ে ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন।

এবারে বিজয়ের দিকে ফিরে ম্যালে যা আদেশ করলে তাতে প্রথমটা বিজয় কী করা উচিত ঠিক ক'রে উঠতে পারলে না। ম্যালের আদেশ—সেই কামরার খাটে পাতা বিছানার চাদর ছিঁড়ে মঁসিয়ে হুবাস্‌কে বাঁধতে হবে। গুলিভরা পিস্তলের বিরুদ্ধে মিছিমিছি গোঁয়ার্তুমি করা মূর্খতা বুঝেই শেষ পর্যন্ত আর আপত্তি সে করতে পারলে না। মনে মনে নিজেকে নির্বুদ্ধিতার জন্য গাল দিতে দিতে সে-আদেশ তাকে পালন করতেই হলো। মঁসিয়ে হুবাস্‌কে অবিশ্বাস ক'রে এই ম্যালেকেই সে কিনা বন্ধু মনে করেছিল!

মঁসিয়ে হুবাস্‌কে আষ্টেপৃষ্ঠে শুধু বাঁধাই হলো না, চিৎকার যাতে তিনি না করতে পারেন সেজন্যে তাঁর মুখে বেশ ক'রে কাপড়ও গুঁজে দেওয়া হলো। কিন্তু বাঁধা শেষ হবার পর ম্যালে যা হুকুম করলে তাতেই বিজয় আশ্চর্য হলো সবচেয়ে বেশি।

তার ধারণা ছিল মঁসিয়ে হুবাস্‌কে এইভাবে বেঁধে কামরায় ফেলে যাওয়াই ম্যালের উদ্দেশ্য। কিন্তু তার বদলে মঁসিয়ে হুবাসের মাথার দিকটা নিজে তুলে নিয়ে বিজয়কে সে পায়ের দিকটা ধরে সামনের দরজা দিয়ে বাইরে যেতে হুকুম করলে।

এ আদেশও পালন করা ছাড়া উপায় নেই। বিজয় সামনে আর পিছনে ম্যালে,—এইভাবে ধরাধরি ক'রে তারা মঁসিয়ে হুবাস্‌কে ওপরের ডেক দিয়ে যখন নিয়ে যাচ্ছে, তখন নিচে তাদের জাহাজে

বেশ সোরগোল পড়ে গেছে। দুশমনদের জাহাজ প্রায় আধ মাইলের ভেতরে। জোরালো ছুটি সার্চলাইট হিংস্র লোলুপ দৃষ্টির মতো ক্ষণে-ক্ষণে মাল-জাহাজের ওপর বুলিয়ে সে-জাহাজ ক্রমশই এগিয়ে আসছে।

অজানা একটা আতঙ্কে বিজয়ের বুক সত্যিই একবার কেঁপে উঠল। কী রহস্য আছে এই জাহাজের ভেতরে, কী আছে তার ভাগ্যে? এই ম্যালেই বা কোথায়, কী উদ্দেশ্যে তাদের নিয়ে চলেছে?

উদ্দেশ্য যাই হোক ম্যালের গন্তব্যস্থান খানিক বাদেই জানা গেল। নিচের ডেকে গোলমাল হলেও ওপরের ডেক তখনো নির্জন নিস্তব্ধ। সেই নির্জন ডেকের একপ্রান্তে তেরপল-ঢাকা একটি লাইফবোটের কাছে এসে ম্যালে তাকে থামতে বললে। তারপর তেরপল সরিয়ে লাইফবোটের ভেতর মঁসিয়ে দুবাস্‌কে হাত-পা-বাঁধা অবস্থায় নামিয়ে দিতে বলতেই বিজয় প্রথম বেঁকে দাঁড়াল। মঁসিয়ে দুবাসের কাতর দৃষ্টি সামনের একটি আলোয় হঠাৎ চোখে পড়তেই বোধহয় তার এই পরিবর্তন।

হঠাৎ রুখে দাঁড়িয়ে বিজয় বললে—না, কিছুতেই এ অত্যাচার আমি হতে দেব না, আমায় গুলি ক'রে ফেললেও না!

ম্যালে একটু শ্লেষের হাসি হেসে বললে—অত্যাচারটা কোথায় দেখছেন? খানিক বাদে এ জাহাজের সবাইকে যেখানে আশ্রয় নিতে হবে, সেইখানেই তো মঁসিয়ে দুবাস্‌কে রেখে যাচ্ছি। অবশ্য আপনার যদি আপত্তি থাকে তাহলে এই অবস্থায় এঁকে জলেও ফেলে দিতে পারি।

শেষ দিকের বিদ্রূপটুকু গায়ে না মেখে বিজয় অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—সবাইকে কি সত্যিই এই লাইফবোটেই তুলে দেওয়া হবে?

ম্যালে তেমনি অদ্ভুতভাবে হেসে বললে—শুধু এইটিতে নয়, আরো যে-ক'টি লাইফবোট জাহাজে আছে সবক'টিতে। সুতরাং বুঝতে পারছেন, মঁসিয়ে দুবাস্‌কে একটু বেঁধে কষ্ট দেওয়া ছাড়া আর

কোনো অত্যাচার তাঁর ওপর হচ্ছে না। বরং তাঁকে প্রাণে বাঁচবার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে।

এরপর বিজয় আর আপত্তি করবার কিছু পেল না। হতাশভাবে ম্যালের সঙ্গে ধরাধরি করে মঁসিয়ে দুবাস্‌কে লাইফবোটের ভেতর নামিয়ে দিয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে—এবার আমার সম্বন্ধে কী ব্যবস্থা করতে চান?

—আপনাকে তো আর ছেড়ে দিতে পারি না! আপনি—মঁসিয়ে দুবাসের ভাষায় বলতে গেলে, বড় বেশি জেনে ফেলেছেন। আপনাকে আমার সঙ্গেই থাকতে হবে—এই জাহাজে।

তারপর বিজয়কে আর কথা বলবার অবসর না দিয়ে ম্যালে তাকে একরকম টানতে টানতেই ওপরের ডেকের পিছনকার একটি ছোট কুঠরিতে নিয়ে গিয়ে দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ক'রে দিলে। সে ঘরে ঢুকতে আর একটু দেরি হলে কী হতো বলা যায় না। কারণ পরমুহূর্তেই সমস্ত জাহাজ ঘন-ঘন বন্দুকের আওয়াজে, মানুষের চিৎকারে, ভীত যাত্রীদের দ্রুত ছুটোছুটির শব্দে সরগরম হয়ে উঠল। ওপরের ডেকের যাত্রীরাও তখন উঠতে আরম্ভ করেছে।

যে ঘরটিতে বিজয় বন্দী হয়েছিল সেটি জাহাজের একটি ভাঁড়ার ঘর বিশেষ, মাঝিমাল্লা ও যাত্রীদের ব্যবহার করবার তোয়ালে প্রভৃতি জিনিস সেই ঘরে জমা থাকে। অত্যন্ত সংকীর্ণ ঘর। একটি কাচের জানলা, তার একদিক খোলা। বন্দী অবস্থায়ও বিজয় সেইটি দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখবার লোভ সংবরণ করতে পারলে না।

কিন্তু সে দৃশ্য এমন হবে সে কল্পনাও করতে পারে নি।

তীব্র সার্চলাইটের আলোয় সমস্ত জাহাজ আলোকিত। সেই আলোয় দেখা গেল, অদ্ভুত আকারের গুটি-সাতেক বোট দুশমনদের জাহাজ থেকে মাল-জাহাজের গায়ে এসে ভিড়েছে।

সেই বোটগুলি থেকে জাহাজের রেলিং টপকে যারা ওপরে উঠেছিল তাদের দেখেই বিজয় সবচেয়ে বিস্মিত হলো। এত বড় বিশাল, এমন অদ্ভুত চেহারার মানুষ বিজয় কখনো কল্পনাও করে নি। সাত

ফুট লম্বা লোক পৃথিবীতে বিরল নয়, কিন্তু সবাই যাদের লম্বায় সাত ফুটের ওপরে, এমন অদ্ভুত জাত সারা পৃথিবীতে আর কোথায় আছে! শুধু তাদের আকারের বিশালতা নয়, তাদের যুদ্ধের কায়দাও বিজয়কে অবাক ক'রে দিলে। তাদের চলা-ফেরা যেন একেবারে কলের নিয়মে; তার মধ্যে এতটুকু ত্রুটি কোথাও নেই! এমন নিখুঁত সামরিক শিক্ষা কোথাও আছে বলে বিজয় ভাবতে পারে নি।

দুশমনেরা জাহাজে চড়াও হবার পর খানিকক্ষণ মাল-জাহাজের যাত্রীরা দুর্বলভাবে বাধা দেবার চেষ্টা করলে, কিন্তু সে-চেষ্টার আর কী দাম! দেখতে দেখতে সব আবার নিস্তব্ধ হয়ে গেল। খানিক বাদে দেখা গেল এক-এক ক'রে লাইফবোটগুলি অসহায় মাঝিমাল্লা যাত্রীতে বোঝাই ক'রে দুশমনেরা সমুদ্রে ভাসিয়ে দিচ্ছে। ওপরকার ডেকের যে লাইফবোটটিতে মঁসিয়ে দুবাস্‌কে ফেলে রাখা হয়েছিল সেটিও বাদ পড়ল না শেষ পর্যন্ত। বিজয় আশা করেছিল মঁসিয়ে দুবাস্‌কে বাঁধা অবস্থায় দেখে হয়তো একটা গোলমাল উঠবে। কিন্তু যাত্রীরা সবাই তখন নিজেদের ভয়ে ভাবনায় দিশাহারা। কোনো কিছু লক্ষ্য করলেও তা নিয়ে মাথা ঘামাবার কারো সময় নেই।

ম্যালেও এতক্ষণ বিজয়ের সঙ্গে জানলা দিয়ে সমস্ত লক্ষ্য করছিল। শেষ লাইফবোট সমুদ্রে ভাসিয়ে দেবার পর তাকে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে দেখে বিজয় বিদ্রূপ ক'রে জিজ্ঞাসা করলে—এখন তুমি নিশ্চিন্ত, না? মঁসিয়ে দুবাস্‌ জাহাজ থেকে বিদায় হওয়ায় বিপদ কাটল। কেমন?

ম্যালে কেমন যেন একটু অন্যমনস্কভাবে হেসে বললে—বিপদ? না, বিপদ তো সবে আরম্ভ!

যেন ম্যালের কথার প্রমাণ স্বরূপই সেই মুহূর্তে তাদের ছোট কুঠরির দরজায় সজোরে একটা ঘা পড়ল। দরজা থরথর ক'রে কেঁপে উঠল সে প্রচণ্ড ঘায়ে।

একবার, দু-বার, তিনবার। দরজার পাল্লা সে-আঘাতে এখুনি বুঝি চৌচির হয়ে ফেটে যাবে। পায়ের আঘাত নয়, কেউ যেন লোহার

বড় মুগুর দিয়ে দরজায় ঘা দিচ্ছে বলে বিজয়ের মনে হলো। নইলে মানুষের পায়ে এত শক্তি থাকতে পারে না।

লোহার দরজা হলে কী হতো বলা যায় না, সামান্য কাঠের দরজা কতক্ষণ সে ঘা সইতে পারে। দেখতে দেখতে অজানা শত্রুর লাথিতে মড়মড় শব্দে ছিটকিনি-শুদ্ধ উপড়ে দরজা ভেঙে গেল।

দরজা ভাঙবার আগেই ম্যালে একটি অদ্ভুত কাজ করেছিল—বিজয়কে কামরার এক কোণে জোর ক'রে বসিয়ে দিয়ে, কামরার স্তূপাকার কাপড়ের ভেতর থেকে একটি চাদর নিয়ে তাকে বেশ ক'রে ঢাকা দিয়ে দিয়েছিল। নিজেও সে আপাদমস্তক একটি চাদর মুড়ি দিয়ে এক কোণে লুকোতে দেরি করে নি।

বিজয়ের কাছে এই চাদর মুড়ি দিয়ে বাঁচবার চেষ্টা নেহাত পাগলামি বলেই মনে হয়েছিল অবশ্য। কিন্তু তখন আপত্তি ক'রে কোনো লাভ নেই বুঝে সে চুপ ক'রে গেছে।

আশ্চর্য ব্যাপার। শেষ পর্যন্ত শুধু এই চাদর মুড়ি দিয়েই এ-যাত্রা ধরা পড়বার হাত থেকে বাঁচা যাবে, বিজয় কল্পনাও করতে পারে নি। কিন্তু তাই ঘটল।

ভাঙা দরজায় সবলে আরো দু-চারটে ঘা দিয়ে একেবারে চূর্ণ ক'রে যে মূর্তিটি ভেতরে ঢুকল চাদরের সামান্য ফাঁক দিয়ে তাকে দেখেই বিজয়ের চক্ষুস্থির। চেহারার বিশালতার দিক দিয়ে মানুষ না বলে তাকে দানব বলাই উচিত। সৈনিক হিসাবে তার পোশাক-পরিচ্ছদও অদ্ভুত, মনে হয় যেন কোনো জাদুঘর থেকে মধ্যযুগের কোনো বিরাট বর্মাচ্ছাদিত মূর্তি হঠাৎ জীবন্ত হয়ে বেরিয়ে এসেছে। এ-যুগের সৈনিকেরা মাথায় লোহার টুপি ব্যবহার করে বটে, কিন্তু সর্বাঙ্গে এ-রকম বর্ম ব্যবহারের রেওয়াজ মধ্যযুগের পর থেকেই উঠে গেছে। মধ্যযুগের সৈনিকেরাও অবশ্য এমন বিশাল ছিল না। তাদের সঙ্গে এই মূর্তির আরেকটি তফাত অস্ত্রের দিক দিয়ে। পোশাক মধ্যযুগের হলেও এ সৈনিকের অস্ত্র একেবারে আধুনিক। তার হাতে পিস্তল, বন্দুক নয়—একেবারে আসল লিউইস গান।

লিউইস গানের মতো ভারি অস্ত্র যেভাবে অনায়াসে হাতে ধরে আছে তাতেই তার অসীম আসুরিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তবে, তার আসুরিক শক্তির তারিফ করবার মতো মনের অবস্থা তখন বিজয়ের নয়। তারই দিকে উঁচিয়ে ধরা সাক্ষাৎ-মৃত্যুর মতো লিউইস গানের নলের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে তখন সে ঘেমে উঠেছে।

কয়েক মুহূর্ত কিভাবে কাটল বলা যায় না। দানব সৈনিকের মুখ একেবারে মড়ার মুখের মতো নির্বিকার। কী যে সে ভাবছে, বা কী মতলব আঁটছে সে মুখ দেখে বোঝা যায় না। মাথার শিরস্ত্রাণের তলায় তার চোখদুটি জ্বলছে বলে মনে হয়।

সে জ্বলন্ত চোখ ঘরের এক কোণ থেকে আর-এক কোণ পর্যন্ত ঘুরল, সেইসঙ্গে লিউইস গানের নলের মুখ। মনে হলো যেন দু-সেকেণ্ডের জন্যে সে জ্বলন্ত চোখ বিজয়ের ওপর নিস্তব্ধ হয়ে রইল। এখন শুধু ঘোড়াটি একবার টিপে দেবার অপেক্ষা।

কিন্তু ঘোড়া সে টিপলে না। কী বুঝে বলা যায় না, হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে কলের মতো মাপা পা ফেলে দানব-সৈনিক চলে গেল। তার শরীরের বর্মের ঝঞ্ঝনা ক্রমশ দূরে মিলিয়ে গেল।

সৈনিক চলে যাবার পরও অনেকক্ষণ পর্যন্ত বিজয় তার গায়ের ঢাকা সরিয়ে বেরুতে সাহস করলে না। সামান্য একটু চাদর ঢাকা দিয়ে শত্রুর দৃষ্টি সে এড়িয়ে গেছে এ কথা তখনো সে বিশ্বাস করতে পারছে না। কে জানে,—দানব-সৈনিকের চলে যাওয়া হয়তো একটা ছল মাত্র। যে-কোনো মুহূর্তে সে আবার ফিরে আসতে পারে।

কিন্তু সৈনিক আর ফিরল না। ওপরের ডেকে কারুর সাড়াশব্দও আর পাওয়া গেল না।

খানিক বাদে দেখা গেল ম্যালেই তার কোণ থেকে বেরিয়ে ভাঙা দরজা ভেজিয়ে দিচ্ছে। তার দেখাদেখি বিজয়ও চাদর সরিয়ে উঠে দাঁড়াল এবং তার কাছে সবচেয়ে যা আশ্চর্য বোধ হয়েছে সে কথাটা তৎক্ষণাৎ না জানিয়ে পারলে না।

—সৈনিকটা কি কানা না হাবা ?—সে জিজ্ঞাসা করলে।

ম্যালে তার দিকে ফিরে একটু হেসে বললে—এ-রকম সন্দেহ কেন ?

—কেন ? সামান্য একটু চাদর ঢাকা দিয়ে নইলে তাকে ফাঁকি দেওয়া যায় ?

ম্যালের কাছে কোনো উত্তর না পেয়ে বিজয় আবার বললে—কানা সে নয়, তা তো জ্বলজ্বলে দুটো চোখ দেখেই বোঝা গেল। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে দৈত্যের মতো চেহারা হলেও মনে তার একটা ছেলের বুদ্ধিও নেই।

ম্যালে আবার হেসে বললে—বুদ্ধি বেশি থাকলে কি আপনি খুশি হতেন ?

বিজয় এবার হেসে ফেলে বললে—না, তাহলে তো তার কথা আলোচনা করবার সুযোগ পেতাম না। এতক্ষণ গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যেতাম। কিন্তু আকারে হাতি, বুদ্ধিতে গাধা, এ কোন্ জাতের মানুষ ?

ম্যালে কৌতুকের সুরে বললে—একজনকে দেখে একেবারে জাতের বিচার ক'রে ফেলছেন কেন ? আমাদের সৌভাগ্যক্রমে এইটি হয়তো ওদের মধ্যে সবচেয়ে নীরেট !

—তা হতে পারে বটে—বিজয়কে স্বীকার করতে হলো। পরমুহূর্তেই হঠাৎ একটা কথা মনে হওয়ায় সে একেবারে চমকে উঠল। সত্যি এদিক দিয়ে ব্যাপারটা তো সে এতক্ষণ ভেবেই দেখে নি !

ম্যালের দিকে খানিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে সে কঠিন স্বরে বললে—সৌভাগ্য আমার হতে পারে, কিন্তু আপনার বেলা তো সৌভাগ্যের কথা ওঠে না। আপনি তো এদেরই দলের লোক। আপনার লুকোবার কী দরকার ছিল আমি বুঝতে পারছি না।

—বোঝা এমন কিছু শক্ত নয়—ম্যালের মুখে চোখে কৌতুকের আভাস—আমি এদের দলের লোক হতে পারি, কিন্তু দলের সবাই তো আমায় তাই বলে চেনে না ! চেনে কি না পরীক্ষা করতে গিয়ে বিপদে পড়াটা বুদ্ধিমানের কাজ তো নয়।

বিজয়কে এ-কথার যুক্তিও স্বীকার করতে হলো। কিন্তু মনের ধোঁকা তবু তার কাটল না। সে আবার জিজ্ঞাসা করলে—কিন্তু নিজেদের দলে কী জাতের সৈনিক কাজ করে আপনি জানেন না?

—জানি না কে বললে? কিন্তু জানলেই আপনাকে বলতে হবে এমন কোনো কথা নেই।—বলে ম্যালে আবার হাসতে লাগল।

সে-হাসিতে রীতিমতো চটে গিয়ে অধৈর্যের স্বরে বিজয় বললে—আপনাকে কিছুই বলতে হবে না। আপনি এখন আমায় নিয়ে কী করতে চান তাড়াতাড়ি ক'রে ফেলুন। আপনাদের দলপতির কাছে ধরিয়ে দেবেন তো?

—সে-রকম কোনো বাসনা তো নেই!—আবার ম্যালের মুখে সেই গা-জ্বালানো হাসি।

—তবে কী করতে চান—? বিজয় রাগে স্থান-কাল ভুলে গিয়ে প্রায় চিৎকার ক'রে উঠল।

ম্যালে তাড়াতাড়ি তার মুখে হাত চাপা দিয়ে গলা নামিয়ে বললে—চুপ, চুপ! এখনি শুনতে পেলে বিপদ হবে!

—বিপদ আমার হয় হবে। আপনার তো নয়!—বিজয় একেবারে বেপরোয়া।

ম্যালে শান্ত স্বরে বললে—বিপদ আমারও।

—আপনারও বিপদ! আপনি ঠাট্টা করছেন নাকি? বিজয় যেন দাঁত খিঁচিয়ে উঠল।

—ঠাট্টা করব কেন? আমি যদি বলি আমি ওদের দলের লোক নই—?

—ওদের দলের লোক নই!—বিজয় অবাক হয়ে খানিকক্ষণ আর কথাই বলতে পারলে না। তারপর মাথা নেড়ে ধীরে ধীরে বললে—আমি আপনার কথা বিশ্বাস করতে পারছি না। যদিও দুশমনদের দলের লোক হিসাবেও আপনার অনেক আচরণের মানে বোঝা সত্যি একটু কঠিন।

—বিশ্বাস করতে পারছেন না কেন?—ম্যালের মুখে আবার কৌতুকের হাসি ফিরে এসেছে দেখা গেল।

—পারছি না এইজন্যে যে, আপনি কেন তাহলে আমার কামরা থেকে গোপনে চিঠি চুরি করেছিলেন, কেন মঁসিয়ে দুবাসের জিনিস-পত্র ঘেঁটে সেখানে আমার নামে সাদা কাগজ ভরে কেব্‌লগ্রামের লেফাফা রেখে দিয়েছিলেন…

বিজয়ের কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে ম্যালে বললে—এগুলো যে আমারই কাজ এ-বিষয়ে আপনি নিঃসন্দেহ তাহলে?

—নিশ্চয়ই!—বিজয় জোর গলায় বললে—হাতে-হাতে আপনি ধরা পড়েন নি বটে, কিন্তু নিজ মুখেই স্বীকার করেছেন মনে নেই?

—বেশ, স্বীকার না-হয় করলাম, তারপর বলুন…

বিজয় ম্যালের মুখের দুর্বোধ্য হাসি একটুখানি লক্ষ্য ক'রে বললে—তারপর মাঝখানে মঁসিয়ে দুবাসের ঘরে জানলা টপ্‌কে ঢোকা, বেকায়দায় ফেলে পিস্তলের ভয় দেখিয়ে আমায় দিয়ে মঁসিয়ে দুবাস্‌কে বাঁধানো ও লাইফবোটে তুলে দেওয়া! আপনি যদি দুশমনের দলের লোক না হন তাহলে এসবের মানে কী?

—এসবের মানে ঠিক উল্টোটা হতে পারে কিনা ভেবে দেখেছেন কি?

—ঠিক উল্টো হতে পারে! কেমন ক'রে?—বিজয় ম্যালের গলার গম্ভীর স্বরে একটু হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞাসা করলে।

ম্যালে তেমনি গম্ভীর স্বরে বললে—বলছি শুনুন। ধরুন, এই জাহাজে দুশমনদের একজন ধূর্ত চর আছে বলে জানা গেল। তার ওপরও নজর রাখবার কেউ আছে—এ ভয়টা তাকে পাওয়ানো দরকার, অথচ সন্দেহটা তার যাতে ভুল জায়গায় পড়ে তারও ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

বিজয় কথার মাঝে বাধা দিয়ে বললে—দুশমনদের চর আপনি মঁসিয়ে দুবাস্‌কে বলছেন তো?

ম্যালে মাথা নেড়ে সায় দিতে বিজয় আবার জিজ্ঞাসা করলে—কিন্তু তাকে ভয় পাওয়ানো দরকার কেন?

—ভয় পাওয়ানো দরকার এইজন্যে যে, ভয় পেলে সে তাড়াতাড়ি নিজের কাজ হাসিল করবার চেষ্টা করবে এবং ভুল লোকের কাছে বেশি সাবধান হবার চেষ্টা ক'রে আসল লোকের কাছে ধরা পড়বে। মঁসিয়ে দুবাসের বেলা ঠিক তাই হয়েছে। তার ঘরের জিনিসপত্র ঘাঁটা দেখেই তার সন্দেহ হয় কেউ তার ওপর নজর রাখছে। আপনার নামের কেব্‌লগ্রামের খাম নিজের ঘরে দেখে ও তার ভেতর সাদা কাগজ পেয়ে তার কাছে রহস্যটা আরো গাঢ় হয় ও আপনার ওপর সন্দেহ পড়ে। কেব্‌লগ্রাম দিতে যাওয়ার নামে সে আপনার সঙ্গে আলাপ করে এবং ব্যাপার দেখে তার সন্দেহ আরো দৃঢ় হয়। সেদিন আপনার কামরার দরজায় মিছিমিছি আড়ি পাতার ভান করি। বেশি চালাক বলে মঁসিয়ে দুবাস্ সেটাও আপনার একটা কারসাজি বলে মনে করবে আমি জানতাম। তার ধারণা হয় আপনি নিজে সাধু সাজবার জন্যে নিজের দলের কোনো লোক দিয়ে ওরকম করিয়েছেন। তারপর রীতিমতো ভয় পেয়ে সে সেই রাত্রেই এ-জাহাজ ধরিয়ে দেবার জন্যে বেতার-খবর নিজেদের জাহাজে পাঠায়। আমিও তাই চেয়েছিলাম। আপনি সেখানে নির্বোধের মতো গিয়ে না পড়লে আমি তখন অমন ক'রে দেখাও দিতাম না। ঠিক সময়ের জন্যে অপেক্ষা করতাম।

বিজয় বিমূঢ়ভাবে বললে—আপনি স্বীকার করছেন যে এ-জাহাজ ধরিয়ে দেওয়াই আপনি চেয়েছিলেন?

—নিশ্চয়ই! তা না হলে শত্রুর ভেতরে ঢুকে সাক্ষাৎ-পরিচয় পাবার কোনো উপায়ই যে ছিল না। যাক, যা বলছিলাম। আপনার জন্যে আমায় একটু অসময়ে গিয়ে পড়তে হয় ও আপনাকে সহজভাবে বোঝাবার উপায় নেই দেখে শত্রু সেজেই আপনাকে দিয়ে মঁসিয়ে দুবাস্‌কে বাঁধিয়ে লাইফবোটে তোলাতে হয়।

—তার কী দরকার ছিল?

—বাঃ! দরকার ছিল না?—ম্যালে হেসে উঠল—মঁসিয়ে দুবাস্ এ-জাহাজে থাকলে আমরা আর শত্রুপুরী পরীক্ষা করবার সুযোগ

পেতাম কি ? সে-ই তো আমাদের ধরিয়ে দিত। সেইজন্যেই তাকে কায়দা ক'রে সরিয়ে দিই।

বিজয় খানিক চুপ ক'রে কি ভেবে নিয়ে বললে—কিন্তু আমার চিঠি চুরি ? তার কী কৈফিয়ত দেবেন ?

ম্যালে আবার খানিক হেসে বললে—ধরুন সে-চিঠিতে এমন কোনো নির্দেশ ছিল যার দরকার তখন আর নেই, আপনাকে মুখোমুখি তখন সে-কথা বলবার পথও কিন্তু বন্ধ। সে-অবস্থায় চিঠিটা সরিয়ে ফেলাই কি সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ নয়? আর দোষ তো আপনার নিজের। আপনি সময় না হতেই চিঠি খুলে দেখতে না গেলে তো কোনো হাঙ্গামাই হতো না।

বিজয় খানিকক্ষণ নির্বোধের মতো ম্যালের দিকে তাকিয়ে থেকে বললে--কিন্তু এ-চিঠির কথাও কারুর জানবার কথা নয়—এক মিঃ ব্র্যাডক আর লোকেশবাবু ছাড়া।

বিজয়ের কথা শেষ হবার আগেই ম্যালে হেসে বললে—সেই কথাটাই আপনার আগে ভাবা উচিত ছিল। তাহলে সব রহস্য গোড়াতেই পরিষ্কার হয়ে যেত।

বিজয় সবিস্ময়ে বললে—তাহলে আপনি কি···

—আমিই লোকেশবাবু। এই দ্বিতীয়বার আপনি ঠকলেন।

৭

বিজয়ের মুখে খানিকক্ষণ আর কথা নেই। লোকেশবাবু শেষ কথাগুলো বাংলায় না বললে এরপরও তার মনে হয়তো ধোঁকা থেকে যেত।

লোকেশবাবুকে ভাল ক'রে লক্ষ্য ক'রে এখনো সে অবাক হয়ে যাচ্ছিল। সত্যি তাঁর ছদ্মবেশে কোনো খুঁত নেই। অথচ এমন কিছু জটিল ছদ্মবেশ তিনি করেন নি। গোঁফ-দাড়িতে মুখ না ঢেকে অত্যন্ত

স্বাভাবিকভাবে নিজের চেহারা যেভাবে তিনি বদলে ফেলেছেন, তাতে তাঁকে বাহাদুরি দিতে হয়। গায়ের রঙটি তিনি বেশ কয়েক পোঁচ কালো করেছেন কোনোরকম রাসায়নিক জিনিস মেখে। তাছাড়া মুখের ভেতর দু-ধারের কষে ও মাড়িতে সুকৌশলে রবারের জিনিস লাগিয়ে গালে এমন খাঁজ ফেলেছেন যে সমস্ত চেহারাটা তাতেই অন্যরকম হয়ে গেছে। এর ওপর ভুরু ও গোঁফের সামান্য কারিকুরি ছাড়া আর কিছু দরকার হয় নি।

বিজয়কে তিনি নিজে দেখিয়ে বুঝিয়ে না দিলে সে অবশ্য চেহারা বদলাবার রহস্য ধরতে পারত না।

এ-রহস্য পরিষ্কার হবার পর সে বেশ একটু সম্ভ্রমের সঙ্গে বললে—আপনি তাহলে গোড়া থেকেই আমার সঙ্গে আছেন?

—তা আছি বই কি। সত্যিই কি আপনাকে একলা এত বড় একটা ব্যাপারে পাঠাতে পারতুম মনে করেন? তবে, এখন আমি কলকাতার জল-পুলিসের সরকারি গোয়েন্দা নই—স্বাধীন। মিঃ ব্র্যাডক আমাকে ছুটি দিয়েছেন।

বিজয় একটু হতাশভাবে বললে—কিন্তু শত্রুর যা পরিচয় ক্রমশ পাচ্ছি, যে বিরাট তাদের আয়োজন আর শক্তি, তাতে তাদের বিরুদ্ধে দু-জনেই বা কী করতে পারব?

—দেখাই যাক না, কী করা যায়। অন্তত শত্রুর ঘরের খবরটা তো বার ক'রে আনা যেতে পারে!

—ঘরে ঢুকতে পারলে তবে তো! ততদিন এ-জাহাজে টিঁকে থাকব কিনা তা-ই যে সন্দেহের বিষয়!

—তবু চেষ্টা করতে ক্ষতি কী? আপাতত এই ভাঙা কুঠরির চেয়ে ভালো একটা লুকোবার জায়গা খুঁজে বার করতে হবে। জাহাজে যে ক'দিন আছি উপোস করে না মরতে হয় তারও ব্যবস্থা করা দরকার—বলে লোকেশবাবু অদম্য উৎসাহের সঙ্গে বাইরে পা বাড়ালেন।

জাহাজ খানিক আগেই চলতে শুরু করেছে। ওপরের ডেকে কিন্তু শত্রুদের কারো কোনো সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না। যুদ্ধের পর

নতুন জাহাজ দখল ক'রে সামলাতেই তারা বোধহয় ব্যস্ত।

সন্তর্পণে প্রত্যেকটি কামরা পরীক্ষা ক'রে ওপরে কেউ নেই জেনে নিশ্চিন্ত হবার পর বিজয় বললে—আমরা এইখানেই এই ক'টা দিন কাটিয়ে দিতে পারি বোধহয়। ওপরের ডেকে ওরা কেউ আর উঠবে বলে তো মনে হয় না। খোঁজাখুঁজি যা করবার ওরা শেষ করেছে। এরপর কোনো সময়ে যদি ওঠে তাহলে যে-কোনো কামরায় লুকিয়ে থাকলেই চলবে।

লোকেশবাবু একটু হেসে বললেন—শুধু লুকিয়ে থাকাটা তো সমস্যা নয়, তার চেয়ে বড় সমস্যা এ ক'দিন কী খেয়ে থাকা যাবে। ওপরের ডেকে তার তো কোনো সুবিধে নেই, অথচ উপোস ক'রে থাকাও সম্ভব নয়।

বিজয় চিন্তিত হয়ে বললে—কিন্তু নিচে নামা মানে তো মৃত্যু। আর যদি কোনোরকমে একবার আহার সংগ্রহ করা যায়, বারবার সে-চেষ্টা করলে তো নির্ঘাত ধরা পড়তে হবে।

লোকেশবাবু খানিক কি ভেবে নিয়ে বললেন—বারবার সে-চেষ্টা না করলেই হলো।

—বাঃ! ক'দিন এ-জাহাজে থাকতে হবে তার ঠিক আছে! আর একবারে ক'দিনের মতো আর খাবার সংগ্রহ করতে পারা যাবে!

লোকেশবাবু হেসে বললেন—আমি খাবার সংগ্রহ ক'রে আনার কথা বলছি না, একেবারে খাবার আগলে থাকার কথা বলছি।

বিজয় অবাক এবং একটু বিরক্ত হয়ে বললে—বুঝতে পারলাম না আপনার হেঁয়ালি।

—বুঝিয়ে দিচ্ছি, শুনুন—বলে লোকেশবাবু বিজয়কে ওপরের ডেকের একেবারে একটি ধারে টেনে নিয়ে গেলেন। তারপর নিচের দিকে সন্তর্পণে মুখ বাড়িয়ে বললেন—এখান থেকে সোজা নামলে কোথায় পৌঁছোনো যায় বলুন তো?

বিজয় অপ্রসন্নভাবে বললে—কোথায় আর, একেবারে সমুদ্রের জলে!

লোকেশবাবু হেসে বললেন—না না, অতদূর যেতে বলছি না। ঠিক এই বরাবর নামলে সব-নিচের তলায় জাহাজের পাশে একটি পোর্টহোল পড়বে। আমি জানি সেটি জাহাজের ভাঁড়ার ঘর। জাহাজের সমস্ত খাবার-দাবার, মাল-মশলা সেখানে জমা থাকে। কোনোরকমে সেখানে পৌঁছোলে আমাদের খাবার ও লুকোবার দুই সমস্যাই মিটে যায়। ভাঁড়ার-ঘরে নানান জিনিসপত্রের এত বস্তা, পিপে প্রভৃতি আছে তার মধ্যে কয়েকদিন লুকিয়ে থাকা মোটেই শক্ত হবে না। সেখানে আমরা আছি বলে কেউ সন্দেহও করবে না।

—তা তো করবে না বুঝলাম। কিন্তু ওখানে পৌঁছোনো যাবে কী ক'রে ? বিজয়ের মতলবটা খুব মনঃপূত হয় নি মনে হলো।

—পৌঁছোবার উপায় আছে, কিন্তু সে-উপায় ব্যবহার করতে হবে খুব সাবধানে।

লোকেশবাবু তারপর তাঁর মতলব বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে দিলেন। ওপরের ডেকের রেলিঙে একটি দড়ি বেঁধে সেই দড়ি ধরে পোর্ট-হোলের মুখ পর্যন্ত নামতে হবে। পোর্টহোলের ফোকর দিয়ে ভাঁড়ার ঘরের ভেতর ঢোকা তারপর শক্ত নয়। অবশ্য আসল বিপদ দড়ি বেয়ে নামবার সময়। নিচের ডেক থেকে কেউ যদি দেখতে পায় তাহলেই সর্বনাশ। ভাঁড়ার ঘরে শত্রুপক্ষের কেউ থাকলেও বিপদ।

এবারের মতো বিজয় ও লোকেশবাবুর ওপর ভাগ্য বেশ সুপ্রসন্নই দেখা গেল। ওপরের ডেকে লম্বা দড়ির অভাব তাঁদের হলো না।

রাত্রির গাঢ় অন্ধকারে সে-দড়ির ডেকের রেলিঙে বেঁধে যখন তারা পর-পর নামল তখন নিচের ডেকে পাহারায় কেউ থাকলেও তাদের দেখতে পেত কিনা সন্দেহ। পোর্টহোল দিয়ে ঢুকতেও তাদের কোনো অসুবিধে বা বাধা হলো না। ভাঁড়ার ঘরের দরজা তখন বন্ধ। সেখানে কেউ নেই।

ভাঁড়ার ঘরের ওপরে কমজোরি একটি বাতি মিট্‌মিট্‌ করে জ্বলছে। তারি আলোয় দেখা গেল ঘরটি বেশ প্রশস্ত, গাদা-প্রমাণ পিপে ও বস্তায় ঘরটি ঠাসা, তাতে লুকোবার জায়গারও অভাব

তাদের হবে না বোঝা গেল। এখন শুধু ভাগ্যের ওপর ভরসা রেখে কয়েকটা দিন কাটিয়ে দেওয়া।

কয়েকটা দিন সত্যিই তাদের নিরাপদে কেটে গেল। এ কয়দিন কোনো হাঙ্গামা তাদের পোহাতে হয় নি। ভাঁড়ার ঘরের দরজা পর্যন্ত কেউ খোলে নি। সেখানে টিনে ভর্তি যে সমস্ত বিলিতি খাবার ছিল, তারা তাই খুলে পরমানন্দে খেয়েছে ও সারাদিন পোর্টহোলের ভেতর দিয়ে নীল সমুদ্র দেখেছে। যে দড়িটা বেয়ে তারা নেমে এসেছিল, সেটি সম্বন্ধে প্রথম দিন তাদের বেশ ভয়-ভাবনা ছিল। এ-দড়ি দেখে কেউ কিছু সন্দেহ করতে পারে অনায়াসে। কিন্তু যে কারণেই হোক সে-দড়ি বোধহয় কারো চোখে পড়ে নি। অন্তত তার রহস্য শত্রুপক্ষের কেউ যে বোঝে নি এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। নইলে এ-ঘরে লুকিয়ে থাকা তাদের আর সম্ভব হতো না। সেইদিন রাত্রে নিচে থেকে অনেকক্ষণ টানাটানি ক'রে তারা দড়িটি ছিঁড়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। তারপর তাদের উদ্বিগ্ন হবার আর কোনো কারণই ঘটে নি।

কিন্তু দিনকয়েক পরে এই নিরাপদ থাকাটাই যেন লোকেশবাবুকে ভাবিয়ে তুলছে মনে হলো। বিজয় এক সময়ে একটু বিরক্ত হয়ে বললে—আপনি বড় বেয়াড়া লোক মশাই! বেশ তো নির্বিঘ্নে আছেন। এ-সৌভাগ্যেও আপনি সন্তুষ্ট নন!

লোকেশবাবু অত্যন্ত চিন্তিত মুখে বললেন—কিন্তু এই পাঁচদিনে ওরা একটিবারও ভাঁড়ার-ঘরের দরজা খুললে না?

—তাতে আপনার অসুবিধেটা কিসের?—বিজয় বেশ একটু কড়া সুরে বললে—এ-ঘরের দরজা খুলে আমাদের খুঁজে বার করলেই আপনি খুশি হন নাকি!

—না, না, আপনি বুঝতে পারছেন না। আমি ভাবছি অন্য কথা। এত বড় জাহাজের এতগুলো লোকের খাবার জুটছে কোথা থেকে? জাহাজে খাবার জিনিসের আর কোনো ভাঁড়ার তো নেই। এতগুলো লোক এতদিন না খেয়েও তো থাকতে পারে না।

—তারা চুলোয় যাক। ওরা খাচ্ছে না উপোস করছে, তা নিয়ে আমাদের কিসের মাথাব্যথা।

—না বিজয়বাবু—লোকেশবাবুর স্বর অত্যন্ত গম্ভীর—এর ভেতর নিশ্চয়ই গভীর একটা রহস্য আছে। এতগুলো দৈত্যের মতো জোয়ান সৈনিক মাঝিমাল্লা পাঁচদিন ধরে জাহাজে আছে, অথচ তাদের খাবারের জন্যে ভাঁড়ার খোলবার দরকার হয় না—এটা দস্তুরমতো ভাববার বিষয়!

বিজয় তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে—ভাবুন তাহলে যত খুশি। কিন্তু আমি বলি, তারা খাবার সঙ্গে ক'রে এনেছে ভাবলেই তো সব গোল চুকে যায়।

লোকেশবাবু মাথা নেড়ে বললেন—তাদের বোট থেকে নামতে আমরা দেখেছি, কোনো খাবার তারা সে-বোটে আনে নি, আনতে পারে না।

বিজয় ক্রমশই অস্থির হয়ে উঠছিল, এবার রাগের সঙ্গে বললে—কিন্তু এইটিই কি এখন আপনার গবেষণার বিষয় হলো? আর কিছু আমাদের ভাববার নেই?

—এই গবেষণার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে যে!—বলে লোকেশবাবু বেশ উত্তেজিতভাবে খানিকক্ষণ পায়চারি ক'রে বেড়ালেন ঘরের মধ্যে।

তারপর হঠাৎ যেন সংকল্প ঠিক ক'রে ফেলে বিজয়ের দিকে ফিরে বললেন—এখানে লুকিয়ে থাকা আর চলল না বিজয়বাবু, আজ রাত্রেই আমায় বেরুতে হবে।

বিজয় বিদ্রূপের স্বরে বললে—ওরা কী খায় খোঁজ নিতে? আপনি অবাক করলেন!

—অবাক হবার এখনো অনেক বাকি বিজয়বাবু। আমি যা আন্দাজ করছি তা সত্যি হলে বিস্ময়ের আর কূল-কিনারা থাকবে না।

—কী আপনি আন্দাজ করছেন শুনতে পাই?

সরাসরি বিজয়ের এ-প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে লোকেশবাবু বললেন—

আকারে হাতি, বুদ্ধিতে গাধা এই দানব-সৈনিকেরা কী জাত আপনি জানতে চেয়েছিলেন—কেমন ?

বিজয় একটু বিমূঢ়ভাবে মাথা নাড়লে।

লোকেশবাবু গম্ভীর স্বরে বললেন—আজ রাত্রেই আশা করি আপনাকে তা জানাতে পারব।

—আজ রাত্রেই !—বিজয় খানিকটা অবিশ্বাস খানিকটা বিস্ময়ের সঙ্গে বললে।

লোকেশবাবু যেন বিজয়ের বিমূঢ়তাটুকু উপভোগ করবার জন্যেই গভীর হেঁয়ালির মতো ক'রে বললেন—হ্যাঁ, রাত্রের আগে নয়। কারণ দিনের বেলা জাহাজের মেন সুইচ্ বন্ধ আছে। এ-ঘরের বাতির তারে কারেন্ট নেই।

এইসব হেঁয়ালি বিজয়ের ভালো লাগে না।

কিন্তু আপাতত হাজার প্রশ্ন করলেও লোকেশবাবুর কাছে আর কিছু যে বার করতে পারবে না তা এই ক'দিন তাঁর সঙ্গ পেয়েই সে বুঝেছে।

লোকেশবাবুর কথায় খুব আস্থা তার না থাকলেও সারাদিন সে উদ্‌গ্রীব হয়েই কাটালে। জাহাজের মেন সুইচ্ বন্ধ হওয়ার সঙ্গে দানব-সৈনিকদের পরিচয় প্রকাশের কী যে সম্বন্ধ, তাও যে সে কয়েকবার ভাবতে চেষ্টা করে নি, তা নয়। কিন্তু এ-হেঁয়ালির কূল-কিনারা না পেয়ে তার ধারণা হয়েছে, তাকে অবাক করবার জন্যেই লোকেশবাবুর এটা একটা বাজে চাল।

তবে তিনি যে একটা-কিছু করবেন সেটা ঠিক। সারাদিন তিনি যে-রকম নিজের মনে গভীরভাবে কাটালেন তাতে মনে হলো বেশ কিছু একটা মতলব তিনি পাকিয়ে তুলছেন।

লোকেশবাবুর সঙ্গে আলাপের আশা ছেড়ে বিজয় পোর্টহোলের কাছে বসে সমুদ্রের দিকে চেয়ে চেয়েই দিনটা কাটিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছিল।

দেখবার অবশ্য বিশেষ কিছু নেই। এই ক'দিনেই পোর্টহোলের

গোল ফোকর-কাটা সমুদ্র আর আকাশের রূপ তার কাছে বেশ একঘেয়ে হয়ে এসেছে। সেই এক আকাশ আর সমুদ্র। আর কিছু নেই—সমুদ্রের রঙ অবশ্য বদলায়, আকাশের আলোর সঙ্গে। কিন্তু সে রঙ-বদলের ছন্দও তার যেন মুখস্থ হয়ে গেছে। কখন সমগ্র সমুদ্রের জলের তলায় অদৃশ্য জীবনের লীলার ক্ষণিক আভাস পাওয়া যায় হয়তো। রোদ্দুরে তাদের আঁশগুলো ঝক্-ঝক্ ক'রে ওঠে রুপোর মতো। বোঝা যায় নিরীহ মাছের ঝাঁকে কোনো শত্রু হানা দিয়েছে। হয়তো কোন হিংস্র হাঙর হবে ; কিংবা এখানকার সমুদ্রের শয়তান সাগর-বাহুড়। কিন্তু সমুদ্রের অগাধ রহস্যের ওইটুকু আভাস দিয়ে আবার সব যেমন ছিল তেমন হয়ে যায়। নীল জল দুলে উঠছে একঘেয়েভাবে। কে বলবে তার তলায় বিচিত্র কোনো জীবনের রাজ্য আছে। একবার একটা লম্বা-নাক-ওয়ালা 'মার্লিট'কে জল থেকে লাফিয়ে উঠতে দেখা গেছল। সেইটেই সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা। জাহুঘরের ভেতর নয়, সমুদ্রে স্বাধীনভাবে একটা এমন অদ্ভুত চেহারার প্রাণীকে দেখলে সত্যি অবাক লাগে।

বিজয় আপাতত অন্যমনস্কভাবেই চেয়ে ছিল। হঠাৎ সে একটু আশ্চর্য হলো। তারপর উত্তেজিত স্বরে লোকেশবাবুকে ডেকে বললে—দেখে যান লোকেশবাবু, দেখে যান।

লোকেশবাবু তখন কামরায় বিজলি বাতির ডুমটা নিয়েই কি গবেষণায় মত্ত। সেখান থেকেই একটু তাচ্ছিল্যের স্বরে উত্তর দিলেন—কী দেখব ? পাখির ঝাঁক তো ? ও কাল থেকেই দেখা যাচ্ছে। আমরা যে ডাঙার কাছাকাছি এসেছি ও তার প্রমাণ।

বিজয় এবার একটু অসহিষ্ণু হয়ে উঠে বললে—না না, পাখির ঝাঁক নয় ! পাখির ঝাঁক নয় ! পাখির ঝাঁক দেখতে আপনাকে ডাকব, এতটা ছেলেমানুষ আমি নই। আপনি দেখেই যান না !

লোকেশবাবু এবার অনিচ্ছাসত্ত্বেও পোর্টহোলে এসে উঁকি দিলেন।

বিজয় বেশ গর্বের সঙ্গে সমুদ্রের দিকে দেখিয়ে বললে—ওটা কী জানোয়ার বলুন তো ! দেখেছেন এমন কখনো ?

আধমাইলটাক দূরে সমুদ্রের জলের ওপর সাপের মতো ফণা তুলে কি একটা জিনিস ভেসে যাচ্ছে। তার বেগ বড় কম নয়।

বিজয় একটু হেসে বললে—গল্পে যা শোনা যায়, এই কি সেই সমুদ্রের অজগর সাপ নাকি!

—সমুদ্রের অজগর না ঘোড়ার ডিম!—লোকেশবাবু সেইদিকে একদৃষ্টে চেয়ে চেয়েই বললেন—আপনি বুঝতে পারছেন না ওটা কী?

বিজয় এবার গম্ভীর হয়ে বললে—বুঝতে না পারলে আপনাকে ডাকি! কিন্তু এ-সাবমেরিন এখানে কোথা থেকে এল? এ কাদের সাবমেরিন?

—আমাদের মিত্রপক্ষের যে নয় তা তো বেশ বোঝা যাচ্ছে। তা-হলে এতক্ষণ শুধু পেরিস্কোপ দেখতেন না, দু-একটা টর্পেডোর নমুনাও দেখতে পেতেন।

বিজয় মাথা নেড়ে বললে—আপনি কিন্তু ভুল করছেন লোকেশ-বাবু! এটা আমাদের মিত্রপক্ষেরও হতে পারে। আমাদের এ-জাহাজকে কোনোরকম সন্দেহ করে না বলেই তারা হয়তো কিছু করছে না। এ-জাহাজ যে শত্রুর কবলে পড়েছে তারা জানবে কী ক'রে?

লোকেশবাবু হাসলেন—শত্রুর কবলে পড়েছে বলে না জানলেও এ-জাহাজ ডুবেছে এ-অঞ্চলের সবাই খবর পেয়েছে। এখন সেই ডুবো জাহাজকে বেশ সুস্থ অক্ষত অবস্থায় ভেসে যেতে দেখলে তাদের সন্দেহ হতোই। এবং তারপর বেতারে খোঁজ নিতে গেলেই সব ধরা পড়ে যেত।

বিজয়কে এ-যুক্তি মানতে হলো। সে সবিস্ময়ে বললে—তাহলে এটা শত্রুপক্ষেরই সাবমেরিন! এদের সাবমেরিনও আছে! এ যে আজগুবি ব্যাপার মনে হচ্ছে লোকেশবাবু!

লোকেশবাবু ঈষৎ হাসলেন—এর চেয়েও আজগুবি ব্যাপারের জন্যে প্রস্তুত থাকুন বিজয়বাবু। এদের সাবমেরিন আছে দেখে অবাক

হচ্ছেন। এদের তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু আছে—এমন জিনিস আছে যা ইংলণ্ড-আমেরিকা কল্পনা করতেও পারে না।

—আপনি কি এ-সব জাপানের গোপন কাণ্ডকারখানা বলে মনে করেন তাহলে?—বিজয় উৎসুকভাবে প্রশ্ন করলে।

লোকেশবাবু গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বললেন—না, মোটেই নয়।

—তাহলে রাতারাতি প্রশান্ত মহাসাগরে এ-রকম একটা প্রবল শক্তি জেগে উঠল কী ক'রে? তারা এত কাণ্ড করবার মতো লোক-বলই বা পেল কোথায়!

লোকেশবাবু আবার হেঁয়ালির সুর ধরে বললেন—সে-রহস্যেরও হয়তো আজ রাত্রে মীমাংসা হতে পারে।

বিজয় একটু চটেই উঠল। বিদ্রূপ ক'রে বললে—আজ রাত্রে আপনি তো সবই মীমাংসা ক'রে ফেলবেন। শত্রুরই যদি হয়, তবু এখন এখানে ওই সাবমেরিন দেখা দেবার মানে কী বলুন তো আপাতত?

—মানে সম্ভবত এই যে, আমরা তাদের আস্তানার কাছাকাছি এসে পড়েছি। সুতরাং ফন্দিটা যে ঠিক সময়ে মাথায় এসেছে, সেটা সৌভাগ্য বলতে হবে। আজ রাত্রেই সেটা খাটাতে না পারলে আর সময় থাকবে না।

রাত হবার পর লোকেশবাবুর ফন্দিটা বুঝে বিজয় প্রথমটা তো অবাক হয়ে গেল। লোকেশবাবুর মাথা খারাপ হয়েছে বলেই তখন তার বিশ্বাস।

তাদের কামরায় বিজলি বাতির বিদ্যুৎ যে তারের মধ্যে দিয়ে আসে সেই তার দুটি মাঝখান থেকে প্রথমত লোকেশবাবু এক জায়গায় ছিঁড়ে ফেললেন। তারপর কামরার ভেতর থেকে একটি লম্বা টিনের পাত সংগ্রহ ক'রে তিনি দরজা খুলে বাইরে বেরুলেন। বাইরে সংকীর্ণ একটি লম্বা করিডর দু-দিকে তাদের কামরা ছাড়িয়ে চলে গেছে। টিনের পাতটি সেই করিডরের মেঝের ওপর বিছিয়ে রেখে ছেঁড়া তারের দু-মুখ তার দু-দিকের সঙ্গে তিনি লাগিয়ে দিলেন। তারপর

কামরার ভেতর থেকে একটি চট এনে তাঁর বৈজ্ঞানিক কীর্তি বেশ ক'রে ঢাকা দিয়ে তিনি উঠে দাঁড়াতেই বিজয় আর হাসি চাপতে পারলে না। লোকেশবাবুর উদ্দেশ্যটা বুঝতে তখন তার বাকি নেই।

—আপনি ভেবেছেন কী লোকেশবাবু? ওই দুশমন দানবদের একটু বিদ্যুতের শক্ দিয়েই কাবু করবেন?—সে হেসে বললে।

লোকেশবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন—কাবু করার চেয়েও বেশি কিছু ভেবেছি। বিশাল হাতির সামান্য কুলের বিচিতে জব্দ হওয়ার গল্প শুনেছেন তো! যত বড় দুশমন, তত আশ্চর্য তার দুর্বলতা।

বিজয় তবু হেসে বললে—কিন্তু কাবু হলেও কাবার তো হবে না। আমাদের অবস্থা তখন কী হবে বুঝতে পারছেন? নেকড়ের মতো এই কামরায় ওরা সবাই এসে ছেঁকে ধরবে। একবার চাদর ঢাকা দিয়ে বেঁচে গেছি; কিন্তু এবার শক্ খেয়ে ছেঁড়া বিজলি তার দেখবার পর তারা অত সহজে আমাদের রেহাই দিয়ে যাবে না।

সোজাসুজি বিজয়ের কথার উত্তর না দিয়ে লোকেশবাবু বললেন—জানেন তো রাক্ষসীদের প্রাণ কৌটোর ভেতর ভোমরা-ভোমরীর মধ্যে থাকত! এদের সেই প্রাণ-কৌটোর সন্ধান পেয়েছি। আপনার ভয় নেই।

হতাশ হয়েই বিজয় এবার চুপ করলে। মাথা নেহাত খারাপ না হলে লোকে এ-রকম আবোল তাবোল কি বকে? কিন্তু বাধা দিয়ে একটা কেলেঙ্কারি করতেও সে চায় না। এ-করিডরে দানব-সৈনিকের কেউ আজ রাত্রে না আসতে পারে, এই আশা নিয়েই আপাতত থাকা।

তবু একবার সে প্রতিবাদ করলে—এ-রকমভাবে নিজেদের বিপন্ন করার কোনো মানে হয় না।

লোকেশবাবু তার দিকে সকৌতুকে চেয়ে বললেন—বিপন্ন হতেই তো এখানে আসা, বিজয়বাবু।

এরপর আর বিজয় কিছু বলতে পারলে না।

তার ছিঁড়ে দেওয়ার দরুন কামরার বাতি জ্বলছে না। আকাশের

আলো থাকলে হয়তো পোর্টহোলের ভেতর দিয়ে কিছু আলো আসত। কিন্তু আকাশ একেবারে কালির মতো, সুতরাং ঘরের ভেতর সূচিভেদ্য অন্ধকারে বসে অপেক্ষা করার যে কী যন্ত্রণা তা খানিকটা অনুমান করা যেতে পারে।

বিরক্ত হয়ে, যা ঘটে ঘটুক ভেবে বিজয় একবার ওই অবস্থাতেই ঘুমিয়ে পড়বার চেষ্টা করলে। কিন্তু ঘুম কি আসতে চায়! কিছুই হবে না জানলেও উদ্বেগ যাবে কোথায় ?

কতক্ষণ যে এভাবে তাদের কাটল তার খেয়ালও নেই। ক্রমশই সে কিন্তু অস্থির হয়ে উঠছিল। কিন্তু আশ্চর্য ধৈর্য লোকেশবাবুর। এতক্ষণে একবার একটু উস্‌খুস্‌ করার শব্দও তাঁর কাছ থেকে শোনা যায় নি।

আশ্চর্য হয়ে বিজয় এক সময় জিজ্ঞাসা করলে—ঘুমোচ্ছেন নাকি লোকেশবাবু ?

গম্ভীর গলায় উত্তর এল—না।

—কিন্তু এ-রকমভাবে বসে থাকতে আর পারছি না। এর চেয়ে…

তার কথার মাঝে বাধা দিয়ে লোকেশবাবু চাপা গলায় বললেন—চুপ!

বিজয়ের বুকটা কেঁপে উঠল। হঠাৎ করিডর দিয়ে ভারি পায়ের আওয়াজ তাদের কামরার দিকেই আসছে। সত্যিই এবার কিছু ঘটবে।

রুদ্ধ নিশ্বাসে বিজয় অপেক্ষা ক'রে রইল। পায়ের আওয়াজ আরো কাছে এসেছে। এ যে দানব-সৈনিক ছাড়া আর কারো পদশব্দ নয়, তা অনায়াসেই বোঝা যায়।

আর কয়েকটা মুহূর্ত মাত্র। দানব-কণ্ঠে হঠাৎ চিৎকার শুনে শিউরে ওঠবার জন্যে বিজয় আগে থাকতে নিজেকে প্রস্তুত ক'রে রাখলে। কী হবে সে-চিৎকারের পর, তাও যেন সে মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছে। জাহাজে বিপদের ঘণ্টা বেজে উঠেছে। চারিধার থেকে দানব-সৈনিকেরা ছুটে আসছে; আর তাদের কাছে লুকোবার উপায় নেই…।

চিৎকার নয়, হঠাৎ করিডরে সজোরে একটা কি ভারি জিনিস পড়ার শব্দ শোনা গেল। সেখানে পাতা টিনের ওপর খানিকটা যেন মুগুর, দুরমুস মারবার আওয়াজ। তারপর সব নিস্তব্ধ।

দু-জনেই তারা এই শব্দ শুনেই উত্তেজিতভাবে দরজার কাছে উঠে দাঁড়িয়েছিল। লোকেশবাবুই প্রথম দরজা খুলে বেরিয়ে পড়লেন। করিডরের একপ্রান্তে যে আলো জ্বলছে, তাতে তাদের কামরার সামনে বিশাল একটি দানব-সৈনিক মড়ার মতো পড়ে আছে দেখা গেল।

লোকেশবাবু তার মাথার দিকটা নিজে তুলে নিয়ে চাপা গলায় বললেন—তাড়াতাড়ি পায়ের দিকটা ধরে ভেতরে নিয়ে চলুন।

বিজয় তখন বেশ বিমূঢ় হয়ে গেছে। আচ্ছন্নের মতো সে সৈনিকের পায়ের দিকটা তুলে ধ'রে ঘরে নিয়ে আসবার সময় হঠাৎ চমকে উঠল একটা ব্যাপার বুঝে।

উত্তেজিতভাবে সে বললে—এ যে আগাগোড়া বর্ম-পরা দেখছি লোকেশবাবু! একটুখানি গায়ের মাংস তো কোথাও ছুঁতে পারছি না! খালি যেন ইস্পাত!

লোকেশবাবু তখন বাইরের টিন ও চটগুলি ভেতরে নিয়ে এসে কামরার দরজা বন্ধ করেছেন। ছেঁড়া ইলেকট্রিক তার আবার জুড়ে ঘরের বাতিটা জ্বালাবার ব্যবস্থা করতে করতে তিনি বললেন—ওই ইস্পাতই ওদের গায়ের মাংস।

—ইস্পাতই মাংস! সবসময়ে ঠাট্টা ভালো লাগে না মশাই!—বিজয় রেগে উঠল রীতিমতো।

লোকেশবাবু খানিকক্ষণ কোনো উত্তর দিলেন না। ছেঁড়া তার মেরামত ক'রে ফেলে বাতিটা জ্বেলে দিয়ে বললেন—ঠাট্টা আপনার সঙ্গে করছি না। করবার সময় নয়। আলো জ্বলছে, আপনি ভালো ক'রে দেখতে পারেন আমার কথা সত্যি কিনা।

—তার মানে আপনি বলতে চান দানব-সৈনিকেরা মানুষ নয়!—বিজয়ের চোখ সত্যিই কপালে উঠেছে।

লোকেশবাবু নিজেই এবার সেই শায়িত বিশাল মূর্তির ওপর ঝুঁকে পড়ে বললেন—না, ওরা যন্ত্রমাত্র। ইংরেজিতে যাকে বলে ‘রোবট’। ‘রোবট’ অনেক রকম এ-পর্যন্ত তৈরি হয়েছে, তবে এমন আশ্চর্য ‘রোবট’ পৃথিবীতে কেউ কখনো কল্পনাও করে নি।

৮

ভয়ঙ্কর এক তুফানের রাত্রে গঙ্গার ওপর এক রহস্যময় জাহাজে অজানা শত্রুর হাতে বন্দী হবার পর সেই যে আমরা অসীমের কাছে বিদায় নিয়েছি, তার পর আর তার কোনো খবর নেওয়া হয় নি।

বিজয়ের পিছু-পিছু ঘুরে গভীর থেকে গভীরতম রহস্যজালের সন্ধান আমরা পেয়েছি বটে, তুফানের রাত্রের কলকাতায় গঙ্গার ফেনিয়ে-ওঠা স্রোতে যে সমস্যার সূত্র পাওয়া গেছিল তা ক্রমশ জটিলতর হয়ে উঠেছে সত্য, কিন্তু অসীমের পরিণাম যে কী হলো, তা কিছুই জানা যায় নি।

কী হলো অসীমের? সেই রহস্যময় জাহাজের সঙ্গে কিভাবে তার ভাগ্য জড়িয়ে গেল?

সেই ঝড়ের রাত্রেই ফিরে যেতে হবে সে-কথা জানতে।

লোহার মতো শক্ত হাতটা পেছন থেকে তাকে চেপে ধরবার পর অসীম প্রথমটা ছাড়া পাবার চেষ্টা করেছিল প্রাণপণে, কিন্তু একটু চেষ্টা ক’রেই সে বুঝল, তার মতো জোয়ানের পক্ষেও সে-বজ্রমুষ্টি থেকে ছাড়া পাওয়া অসম্ভব। মানুষ নয়, কোনো অসুরই বুঝি তাকে পেছন থেকে টুঁটি চেপে ধরেছে।

প্রথমে দম বন্ধ হয়েই তার মারা পড়বার উপক্রম হয়েছিল, কিন্তু সে-পরিণামটা থেকে সে রক্ষা পেল। টুঁটির ওপর চাপটা একটু আলগা হবার পর সে বুঝতে পারলে, সামান্য একটা পুতুলের মতো তাকে

অনায়াসে শূন্যে কে তুলে ধরে নিয়ে চলেছে। মনে হলো বুঝি জাহাজ থেকে তাকে গঙ্গার জলেই ফেলে দেওয়া হবে। কিন্তু তা হলো না। তার বদলে আবার জাহাজের যেদিক থেকে তারা পালিয়ে এসেছে সেইদিকেই তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সে বুঝতে পারলে।

সেখানে সেই কাটামুণ্ডের ঘরটার কথা মনে হতেই আতঙ্ক তার শতগুণ বেড়ে গেল। সে-পরিণামের চেয়ে বুঝি এই অন্ধকার উত্তাল নদীর জলে ডুবে মরাও ভালো।

তার টুঁটির ওপর চাপটা অনেক ঢিলে হয়ে এসেছিল। তার মনে হলো, এখন হয়তো একবার চেষ্টা করলে ছাড়া পাওয়াও যেতে পারে। হঠাৎ পেছন দিকে হাত বাড়িয়ে একটা ঝটকায় শত্রুর মুঠো ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতেই সে কিন্তু স্তম্ভিত হয়ে গেল। শত্রুর মুঠি আলগা হলো না, তার বদলে সে নিজে একটি অদ্ভুত জিনিস আবিষ্কার করলে। যত বড় অসুরই হোক, তার লৌহমুষ্টি লোহার মতো শক্ত ধাতুর হবে, এটা সে কল্পনাই করতে পারে নি। এ যে সত্যিই রক্তমাংসহীন কঠিন ধাতুর কব্জি! ধাতুর যে ঠাণ্ডা স্পর্শটা প্রথমে গলায় পেয়েছিল, হাতে ছুঁয়ে সেটা আরো ভালো ক'রে বোঝা গেল।

কী রকম অদ্ভুত শত্রুর হাতে সে তাহলে পড়েছে? আগাগোড়াই কি তাদের লোহার বর্মে ঢাকা? এ যুগে আবার বর্মের চল আছে নাকি? আর, আঙুল পর্যন্ত যাতে ঢাকা থাকে, সে আবার কি-রকম বর্ম?

তখন এ-রকম অসংখ্য প্রশ্ন তার মনকে অস্থির ক'রে তুলেছে, কিন্তু সেগুলোর উত্তর খোঁজা আর তার হলো না। এবার অজানা শত্রু যে কামরাটিতে তাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ ক'রে দিলে, সেটি চিনতে পেরে তার অন্য সমস্ত চিন্তা গভীর আতঙ্কের তলায় চাপা পড়ে গেল।

এ সেই কাটামুণ্ডের ঘর। জাহাজে আশ্রয় নিতে এসে এই কামরা থেকেই সে বিজয়ের সঙ্গে ভীত ও হতভম্ব হয়ে পালিয়ে গেছিল।

অসীম ভীরু একেবারেই নয়, কিন্তু অন্ধকার ঝড়ের রাতে মোটর-বোট ডুবির পর থেকে এ-পর্যন্ত যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে, তার পরে এ-রকম একটা ভয়ঙ্কর চরে অজানা শত্রুর দ্বারা বন্দী হয়ে যদি সে আতঙ্ক অনুভব করে, তাহলে তাকে দোষ দেওয়া যায় না। যাদের কল্পনা-শক্তি নেই, তারাই একেবারে ভয় পায় না। ভয় পেয়ে যারা তা জয় করে তারাই সত্যকার সাহসী।

অসীম প্রথমটা মেঝেতে পড়ে গিয়ে যেদিকের টেবিলে কাটা-মুণ্ডগুলো ছিল, সেদিকে চোখ পর্যন্ত ফেরায় নি।

সদ্য-কাটা মানুষের কবন্ধ ধড় ও মাথা এ-অবস্থায় দেখবার প্রবৃত্তি না হওয়াই স্বাভাবিক, বিশেষ ক'রে নিজের পরিণাম সম্বন্ধে অস্বস্তিকর কোনো সন্দেহ যদি থাকে।

কিন্তু অনেকক্ষণ এক কামরায় বন্ধ হয়ে থাকতে হলে, চোখ বুজে বা একদিকে নিরবচ্ছিন্নভাবে ফিরিয়েই বা কতক্ষণ থাকা যায়? নিজের গভীর অস্বস্তি ও বিতৃষ্ণা সত্ত্বেও অসীমকে সেই টেবিলের দিকে এক সময় চাইতে হলো। ভয়ঙ্কর কোনো দৃশ্য মানুষের পক্ষে যেমন কষ্টকর, তেমনি তার একটা আকর্ষণও আছে। একবার সেই কাটামুণ্ডগুলোর ওপর তাড়াতাড়ি চোখ বুলিয়ে নেবার পর অসীমকে আবার সেদিকে চাইতে হলো, এবং এবার একটু বেশিক্ষণ ধরে।

বেশিক্ষণ ধরে চেয়ে থাকবার কারণ শুধু তাদের ভীষণতা নয়। সে-কাটামুণ্ডগুলির মধ্যে যখন আরো কিছু তাকে আকৃষ্ট করেছে, তখন দু-বারের পর তিনবার সেদিকে তাকিয়ে অসীম বেশ কৌতূহলী হয়ে উঠল। কৌতূহলটা ক্রমশ এত প্রবল হয়ে উঠল যে তার পক্ষে চুপ ক'রে মেঝেতে পড়ে থাকাও সম্ভব হলো না। নিজের বিপদের ভাবনা ও সমস্ত বিতৃষ্ণা ভুলে সে সেই কাটামুণ্ডগুলি ভালো ক'রে পরীক্ষা করবার জন্যেই এগিয়ে গেল।

কাটামুণ্ডগুলি সত্যই অদ্ভুত। গোড়ায় আচম্‌কা ভয় পাওয়ার দরুনই বোধহয় সে তেমন মনোযোগ দিয়ে সেগুলিকে লক্ষ্য করে নি। লক্ষ্য করবার সময়ও ছিল না তখন। কিন্তু এখন প্রথমত তার আশ্চর্য

লাগল এই দেখে যে কাটামুণ্ডগুলি প্রায় সবই এক রকমের। এতগুলি একরকম চেহারার জ্যান্ত মানুষই একত্র কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না, একসঙ্গে তাদের সকলের মাথা কাটা পড়া তো আরো তাজ্জব ব্যাপার। শুধু চেহারার মিলের দিক দিয়ে নয়, আর একদিক দিয়েও সেগুলি অদ্ভুত। মুণ্ডগুলি টেবিলের ওপর একটি কাচের পাত্রে বসানো। চামড়ার উজ্জ্বলতা দেখে সেগুলি খুব সম্প্রতি দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে মনে হলেও একফোঁটা রক্ত কোথাও পাত্রের ওপর নেই। দেওয়ালের ধারে সাজানো পোশাক-সমেত ধড়গুলিতেও তেমনি রক্তের চিহ্ন পাওয়া যায় না।

এ কি অস্ত্রোপচারের কোনো নূতন কৌশল—না— ?

হঠাৎ মনের ভেতর একটা গভীর সন্দেহ উদয় হতেই অসীম এবার সাহস ক'রে এগিয়ে গিয়ে একটি মুণ্ড পাত্র থেকে তুলে নিলে।

তাই তো! এ যে নকল নরমুণ্ড! রবারের মতো কোনো জিনিস রঙ ক'রে তৈরি! বোকার মতো কী ভুলই সে করেছিল!

ভুল হওয়া অবশ্য আশ্চর্য নয়। এমন আশ্চর্যভাবে সেগুলি তৈরি, সত্যিকারের নরমুণ্ডের সঙ্গে আকারে, রঙে, এমনকি মুখের ভাবে পর্যন্ত তার সাদৃশ্য এমন হুবহু যে, কাছ থেকেও সেগুলিকে নকল বলে চেনবার উপায় নেই।

কিন্তু এ-রকম নকল নরমুণ্ডই বা এভাবে সাজিয়ে রাখবার মানে কী ?

যে পৈশাচিক ব্যাপার কল্পনা ক'রে গোড়ায় সে ভয় পেয়েছিল, এখন ভুল বলে প্রমাণ হলেও এ-জাহাজের রহস্য তাতে কিছুমাত্র কমল না।

ঝড়ের রাত্রে যে জাহাজে আলো দেখা যায় না, যে জাহাজের কামরায় এইরকম রহস্যজনক নকল মুণ্ড পাওয়া যায়, এবং সবচেয়ে আশ্চর্য, সত্যিকার লোহার হাতে যে জাহাজে অসুরের মতন শক্তিমান প্রহরীরা আশ্রয়প্রার্থীদের গলা টিপে ধরে বন্দী করে, তা নিশ্চয় সাধারণ জাহাজ নয়। সবকিছুই এখানে অস্বাভাবিক, দুর্বোধ্য, রহস্যময়।

তাকে এভাবে বন্দী করার উদ্দেশ্যও বা কী হতে পারে সে কিছুই ভেবে পেলে না। লৌহাসুরের কঠিন হাতের পরিচয় পাওয়া ছাড়া এ-পর্যন্ত একটি মানুষের দেখা তো সে পায় নি! লোকজন এ-জাহাজের গেল কোথায়? তারা দেখাই বা দেয় না কেন?

একদিকে বিজয়ের কী হলো তাই নিয়ে ভাবনা, তার ওপর নিজের বিপদ ও এই জাহাজের রহস্য অসীমকে তখন একেবারে বিহ্বল ক'রে দিয়েছে। ভেতরদিকের একটি দরজা খুলে গিয়েছে তা সে লক্ষ্যই করে নি।

অন্যমনস্কভাবে একটি নকল মুণ্ড হাতে তুলে নাড়তে নাড়তে হঠাৎ সে চমকে উঠল।

পেছন থেকে কে একজন ঠাট্টার স্বরে ইংরেজিতে বললে—খুব হতাশ হয়েছেন, কেমন?

অসীম ফিরে তাকিয়ে দেখল, পেছনের দরজার কাছে অত্যন্ত ক্ষীণকায় একটি প্রৌঢ় গোছের সাহেব দাঁড়িয়ে। লোকটির মাথায় টাক, চোখে চশমা এবং মুখে কেমন একটা নিরীহ ভালোমানুষের মতো ভাব, যা এই রহস্য-বিভীষিকাময় জাহাজের সঙ্গে কোনো-মতেই যেন খাপ খায় না।

আসলে জাহাজে অন্য ধরনের, বেশ দুশমন চেহারার লোক দেখবার আশাই অসীম করেছিল। নিরীহ অধ্যাপক-গোছের একটি আধবুড়ো সাহেবকে দেখে প্রথমটা সে বুঝি হতভম্ব হয়েই কোনো কথা বলতে পারলে না।

প্রৌঢ় সাহেব এবার একটু মিষ্টি হেসে এগিয়ে এলেন। অসীমের সঙ্গে যেন তাঁর কতদিনের চেনা এইভাবে হাত বাড়িয়ে তার করমর্দন ক'রে বললেন—ঝড়ের রাতের অতিথির জন্যে কী করতে পারি বলুন?

অসীম এতক্ষণে নিজের গলার স্বর যেন খুঁজে পেয়ে বললে—ঠিক অতিথির মতো ব্যবহার কিন্তু এতক্ষণ পাই নি।

প্রৌঢ় সাহেব আবার হাসলেন, বললেন—তার জন্যে আমরা লজ্জিত। আপনি আঘাত পেয়েছেন নাকি?

—তা একটু পেয়েছি বইকি! এ-জাহাজের প্রহরীদের হাত তো রক্ত-মাংসের নয়!— অসীম কথা বলতে বলতে ক্ষীণ দৃষ্টিতে প্রৌঢ় সাহেবকে এবার লক্ষ্য করছিল, তাঁর মুখের ভাব দেখবার জন্যে।

—হ্যাঁ, তাদের হাত শুধু নয়, হৃদয়ও লোহার মতো কঠিন—বলে প্রৌঢ় হঠাৎ এমন উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলেন যে, অসীম চমকে উঠল। এটা যে কী এমন হাসির কথা সে বুঝতে পারলে না।

৯

নিরীহ প্রৌঢ় অধ্যাপক-গোছের লোকটির কথা যে কী ভয়ঙ্কর হাসির, তা বুঝতে অবশ্য অসীমের বেশিদিন লাগল না।

সেই ঝড়ের রাত্রেই রওনা হয়ে তাদের জাহাজ তখন বঙ্গোপসাগর পার হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে পড়েছে। কলকাতার পর এ-পর্যন্ত কোথাও কোনো বন্দরে তা থামে নি।

জাহাজ ছেড়ে যাবার স্বাধীনতা না পেলেও অসীম ঠিক বন্দীর মতো ব্যবহার এখনো পায় নি। বরং যাঁর সঙ্গে তার প্রথম আলাপ হয়, জাহাজের মধ্যেও সেই প্রৌঢ় মিঃ স্টেড তাকে এ-পর্যন্ত অতিথির মতোই আদর-আপ্যায়ন করেছেন। কিন্তু আদর-আপ্যায়ন যত মধুরই হোক, তাতে কতদিন সন্তুষ্ট থাকা যায়? অসীম একদিন অধৈর্য হয়ে বলেছে—আর এমন ক'রে কতদিন কাটাবো মিঃ স্টেড? এইবার আমায় নামিয়ে দিন কোথাও।

—সময় হলেই নামিয়ে দেব।—মিঃ স্টেড জবাব দিয়েছেন।

—আর সময় কবে হবে? কলকাতা তো প্রায় তিন হপ্তা ছেড়ে এসেছি।

—তা এসেছি বটে। কিন্তু কোনো বন্দরেই তো জাহাজ ধরে নি।

—ধরে নি তো এবার ধরুক। কলকাতায় না-হয় আপনাদের বাধা ছিল, অন্য কোথাও তো তা নেই।

মিঃ স্টেড গম্ভীর হয়ে এবার বলেছেন—সব জায়গাতেই আছে। তারপর তিনি স্পষ্ট ক'রেই জানিয়ে দিয়েছেন যে একবার এ-জাহাজে পা দেবার পর আর পৃথিবীর সঙ্গে অসীমের কোনো সম্পর্ক থাকবার উপায় নেই।

অসীম অবাক এবং রীতিমতো উষ্ণ হয়ে জিজ্ঞাসা করেছে—কেন, অপরাধ?

মিঃ স্টেড হেসে বলেছেন—অপরাধ, আপনি এমন কিছু জেনেছেন, বাইরের লোকের যা জানার এখনো সময় হয় নি।

—ঠিক বুঝতে পারলাম না।—অসীম অপ্রসন্নভাবে বলেছে—ওই ক-টা নকল মুণ্ড আর কলের মানুষ যত আশ্চর্য জিনিসই হোক, তা নিয়ে আমি কিছু বাইরে ঢাক পিটে বেড়াতাম না। আর বেড়ালেও কী এমন ক্ষতি হতে পারত আপনাদের?

—ক্ষতি এই যে, পৃথিবীর সেরা কয়েকজন বৈজ্ঞানিক ও মনীষীর দীর্ঘ বিশ বৎসরের গোপন সাধনা অকালে বাধা পেয়ে ব্যর্থ হতে পারত।

মিঃ স্টেডের গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে সম্পূর্ণ বিমূঢ় হয়ে অসীম এবার বলেছে—পৃথিবীর সেরা বৈজ্ঞানিক মনীষীদের সাধনা—আপনি এসব কী বলছেন?

মিঃ স্টেড এবার হেসেছেন—প্রলাপের মতো শোনাচ্ছে, না? কিন্তু সত্যি কথাই বলছি, আপনি পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে বিরাট ও অসাধারণ চক্রান্তের সঙ্গে নিজের অজান্তে জড়িয়ে পড়েছেন। সে-চক্রান্তের একটা নিষ্পত্তি না হলে আপনার নিষ্কৃতি নেই।

অসীমকে বিস্ময়ে নির্বাক থাকতে দেখে মিঃ স্টেড আবার বলেছেন—একটু ধৈর্য ধরুন—নিজের চোখেই ক্রমশ সব দেখতে ও বুঝতে পারবেন।

—কিন্তু ব্যাপারটা কী?—অসীম বিমূঢ়ভাবে জিজ্ঞাসা করেছে।

মিঃ স্টেড আবার হেসে বলেছেন—ব্যাপারটা আপনাকে একটু বুঝিয়ে দিচ্ছি। এ-ব্যাপারে যখন আপনি জড়িয়ে পড়েছেন, তখন

আপনাকে বলতে আর বাধা নেই। আপনি এ-জাহাজে কয়েকটা মাত্র কলের মানুষ দেখেছেন—দেখেছেন তাদের আশ্চর্য ক্ষমতা।

অসীম ঘাড় নেড়ে সায় দিয়েছে।

মিঃ স্টেড আবার বলেছেন—মনে করুন পাঁচটা দশটা নয়, ওই-রকম লক্ষ-লক্ষ অসংখ্য কলের মানুষ। প্রত্যেকটি সশস্ত্র, প্রত্যেকটি অপরাজেয়। শুধু তাই নয়, মনে করুন, কলের যোদ্ধা দিয়ে চালানো পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুতগামী অসংখ্য এরোপ্লেন, যুদ্ধ-জাহাজ, সাব-মেরিন—এমন সব যুদ্ধের যন্ত্র যা কোনো দেশ এখনো কল্পনা করে নি—এবার ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন কিছু?

—আপনার মস্তিষ্ক ঠিক সুস্থ নয় বুঝতে পারছি।

মিঃ স্টেড ঈষৎ হেসে বলেছেন—আপনার পক্ষে তাই মনে করাই স্বাভাবিক। কিন্তু সত্যিই বিশ্বাস করুন, এই প্রশান্ত মহাসাগরের কোনো অজানা কোণে এই কল্পনাতীত আয়োজন চলেছে—আর কয়েকদিন বাদে নিজের চোখেই সব দেখতে পাবেন।

অসীম এক নিশ্বাসে অনেকগুলো প্রশ্ন এবার ক'রে ফেললে—কিন্তু আয়োজন কারা করছে? কী তাদের উদ্দেশ্য? কী ক'রে এ-আয়োজন সম্ভব হলো?

—এক এক ক'রে আপনার সব প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি। আগেই বলেছি—এ-আয়োজন করছে বাছা-বাছা কয়েকজন বৈজ্ঞানিক ও মনীষী—পৃথিবীর নানা দেশ থেকে যারা এক ব্রত নিয়ে এসে জড়ো হয়েছে। এ-আয়োজন কী ক'রে সম্ভব হয়েছে, কেমন ক'রে পৃথিবীর সকলের চোখে ধুলো দিয়ে এতদিন ধরে আমরা নানা দেশ থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেছি, তার দীর্ঘ ইতিহাস এখন বলবার সময় নেই। তবে, আয়োজনের উদ্দেশ্য আপনাকে এক কথায় বলতে পারি—উদ্দেশ্য, পৃথিবী জয় করা!

—পৃথিবী জয় করা! আপনারা কয়েকজন আধ-পাগলা বৈজ্ঞানিক মিলে প্রশান্ত মহাসাগরের সামান্য একটা কোণ থেকে পৃথিবী জয় করবেন?—অসীম হেসে উঠেছে।

মিঃ স্টেডকে এবার উত্তেজিত হয়ে উঠতে দেখা গেছে।

—আজগুবি গাঁজাখুরি স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে, কেমন? কিন্তু বর্তমান যুগে পৃথিবীর যুদ্ধের ব্যাপারে সবচেয়ে প্রধান শক্তি কারা বলুন তো? যুদ্ধের জয়-পরাজয়ের মূলে কারা? আপনি কি মনে করেন, ঘরে বসে যারা রাজনীতির প্যাঁচ কষে তারা যুদ্ধজয় করে, না, যারা ভেড়ার পালের মতো যুদ্ধক্ষেত্রে কাতারে কাতারে প্রাণ দিতে যায়, তারা! না, মশাই না, সেদিন আর নেই; এখন, এই আমাদের মতো বৈজ্ঞানিকের হাতেই যুদ্ধজয়ের আসল যন্ত্র, মরণ-কাঠি আমাদেরই হাতে। আমরা যদি একত্র হই, পৃথিবীর সহস্রকোটিও তাহলে কিছু নয়।

অসীম এই উত্তেজিত আন্দোলনে কেমন যেন অভিভূত হয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—কিন্তু কেন? কেন আপনারা পৃথিবী জয় করতে চান?

—কেন চাই?—মিঃ স্টেডের গলার স্বর এবার বদলে গেছে মনে হলো। তিনি যেন হঠাৎ নতুন মানুষ হয়ে গেছেন, তাঁর শীর্ণ মুখ দীপ্ত হয়ে উঠেছে কিসের উদ্দীপনায়। ধীরে ধীরে তিনি বলেছেন—পৃথিবী জয় করতে চাই, আবার নতুন ক'রে তাকে গড়বার জন্যে। দেখতে পাচ্ছেন না, পৃথিবীময় আজ কী বিশৃঙ্খলা, অনাচার, অবিচার, সব জায়গায় মানুষের জীবনে কী দুঃখ, অভাব, অশান্তি! অক্ষম, অযোগ্য, নির্বোধ, কপট, স্বার্থপরেরাই অধিকাংশ ব্যাপারে এতদিন ধরে মাতব্বরি ক'রে এসেছে বলেই আজ মানুষের এই দুর্দশা। তাদের হাত থেকে পৃথিবীর ভার ছিনিয়ে না নিলে সমস্ত মানুষের সত্যিকার কল্যাণ কিছুতেই হবে না। ছাড়া-ছাড়া ভাবে এখানে-সেখানে এদেশে-ওদেশে একটু-আধটু চেষ্টা করলেও এ-সমস্যার কিনারা হবে না। সেই জন্যেই আমরা একসঙ্গে সমস্ত পৃথিবী জয় করতে চাই। পুরোনো পোড়ো বাড়ি যেমন ধূলিসাৎ ক'রে নতুন ক'রে তৈরি করে, তেমনি ক'রে একেবারে নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করতে চাই—যেখানে দেশ নয়, জাতি নয়, মানুষই হবে সবচেয়ে বড়। এই ব্রত নিয়েই নানা দেশের

নানা জাতের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ মানুষ আজ বিশ বৎসর ধরে নিঃশব্দে সেখানে সাধনা ক'রে এসেছেন, তাঁদের সিদ্ধিলাভের আর দেরি নেই।

মিঃ স্টেড চুপ করার পর খানিকক্ষণ অসীম কোনো কথাই বলতে পারে নি—এমন বিস্মিত বিহ্বল সে হয়ে পড়েছে এইসব আশ্চর্য কথা শুনে।

অনেকক্ষণ বাদে সে জিজ্ঞাসা করেছে অস্পষ্টস্বরে—আপনি কে তাহলে ?

মিঃ স্টেড হেসেছেন—আমি 'সাতাত্তর সাধকে'র নগণ্য এক সাধক।

—সাতাত্তর সাধক !

—হ্যাঁ, এই আমাদের দলের নাম।—বলে মিঃ স্টেড উঠে গেছেন।

তারপর একদিন 'এস্. এস্. মান্না' সত্যিই প্রশান্ত মহাসাগরের একটি দ্বীপের ভেতর গিয়ে নোঙর ফেলল। জাহাজের গতিবিধির কোনো চার্ট অসীম 'মান্না'তে দেখে নি। সুতরাং দ্বীপটি যে কোথায় তা সে বুঝতে পারলে না। ওপর থেকে দেখলে দ্বীপটির বিশেষত্বও বোঝবার উপায় নেই। প্রশান্ত মহাসাগরের ছড়ানো অসংখ্য দ্বীপ-পুঞ্জের যে-কোনো একটি দ্বীপ বলেই তাকে ভাবা যেতে পারে। শুধু দু-ধারে খাড়া পাহাড়-ওঠা যে সংকীর্ণ সমুদ্রপথে বন্দরটিতে ঢুকতে হয়, সেটি একটু আলাদা ধরনের।

কিন্তু পৃথিবীর সঙ্গে যুদ্ধের কল্পনাতীত আয়োজন যেখানে চলেছে, কোনো দিকে সে-বিশাল আয়োজনের কোনো চিহ্নও তো নেই। একটা বিশাল কারখানার চিমনিও তো কোথাও দেখা যাচ্ছে না। 'সাতাত্তর সাধকে'র কাহিনী কি তাহলে মিঃ স্টেডের উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা মাত্র! জাহাজে এ-কয়দিন আসতে আসতে এ-সন্দেহ অবশ্য তার অনেকবারই হয়েছে। মিঃ স্টেড যে অবিশ্বাস্য আশ্চর্য সব কথা বলেছেন, তার মন কিছুতেই তা যেন গ্রহণ করতে চায় নি।

জাহাজ থেকে নেমে মিঃ স্টেডের সঙ্গে মোটরে দ্বীপের ভেতর যেতে যেতে অসীম মনের কথাটা প্রকাশ না ক'রে ফেলে পারলে না।

একটু বিদ্রূপের সঙ্গেই সে বললে—এই কি আপনার 'সাতাত্তর সাধকে'র দ্বীপ মিঃ স্টেড ?

মিঃ স্টেড নিজেই গাড়ি চালাচ্ছিলেন। অসীমের দিকে না ফিরেই বললেন—এই একটি নয়, আরো আছে। এটি অবশ্য প্রধান।

—কিন্তু স্বয়ং বিধাতার তৈরি মাঠ-পাহাড়-বন ছাড়া আপনাদের সাধনার পরিচয় তো কোথাও দেখতে পাচ্ছি না!

মিঃ স্টেড হেসে উঠলেন—দেখতে পাওয়াটাই আশ্চর্য নয় কি ?

—তার মানে ?

—তার মানে আপনি কি ভেবেছিলেন, সমস্ত প্রশান্ত মহাসাগর থেকে দেখা যায়, এমনভাবে আমাদের কীর্তি আমরা জাহির ক'রে রাখব ? না মশাই না, তাহলে বিশ বৎসর কেন, বিশ সপ্তাহও আমাদের কাজ আমরা চালাতে পারতাম না।

ছুটি পাহাড়ের মাঝখানের একটি সংকীর্ণ পথে মোটর ঘুরিয়ে নিয়ে মিঃ স্টেড আবার বললেন—আজ হঠাৎ কোনো ভবঘুরে জাহাজ যদি নিজের খেয়ালে আমাদের কোনো দ্বীপে এসেও পড়ে, তবু তাদের নাবিকেরা কিছুই বুঝতে পারবে না, সন্দেহজনক কোনো কিছুই তাদের চোখে পড়বে না।

—তাহলে কোথায় আপনাদের এত বিরাট সব আয়োজন চলছে ? —অসীম অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে।

মোটরটা সেই মুহূর্তেই বাঁ দিকের পাহাড়ের একটি অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে হঠাৎ ঢুকে পড়ল। একটুখানি সেই পথে এগিয়ে মোটর থামিয়ে মিঃ স্টেড অসীমের হাত ধরে নামালেন। তারপর অন্ধকারে কি একটা বোতাম সুড়ঙ্গের দেয়ালে টিপে দিয়ে বললেন—আমরা সেইখানেই চলেছি।

বোতাম টেপবার সঙ্গে সঙ্গেই সুড়ঙ্গ-পথের সামনের দিকটা আলোকিত হয়ে উঠে কয়লার খনিতে নামবার মতো লিফ্‌ট দেখা গেল। সেই লিফ্‌টের কামরায় মিঃ স্টেড তাকে নিয়ে ঢোকবার পরেই সেটি নিঃশব্দে নামতে আরম্ভ করল।

প্রথমে নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার, তার ভেতর দিয়ে লিফ্‌ট নেমে চলেছে। অসীমের কেমন যেন একটু অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। এ-নামার শেষ নেই নাকি ?

হঠাৎ অন্ধকারের পর অত্যন্ত উজ্জ্বল আলোয় তার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। লিফ্‌টও তখন থেমেছে।

মিঃ স্টেডের সঙ্গে লিফ্‌টের খাঁচা থেকে বেরিয়ে অসীম নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলে না। এ যে রূপকথার গল্পের চেয়েও আশ্চর্য! পাতালে পৃথিবীর গর্ভে এত বড় শহর কি সত্যিই সম্ভব ? ভারতের সবচেয়ে গভীর কয়লার খনিতে সে একবার নেমেছিল। কিন্তু সে যেন এর তুলনায় ছেলেখেলার ব্যাপার! সমস্ত পৃথিবীটাই যেন ফোঁপরা ক'রে এই বিশাল পাতালপুরী হয়েছে বলে মনে হয়। চারিদিকে বিশাল অদ্ভুত আকারের সমস্ত কারখানা ও তারি মাঝে নানা ছাঁচের কলের মানুষের চলাচল দেখে মনে হয়, এ যেন অসম্ভব কোনো দারুণ দুঃস্বপ্নের জগতে সে এসে পড়েছে।

কিন্তু সেদিন তার বিস্ময়ের এইখানেই শেষ নয়।

অবাক হয়ে সে চারিদিকে তাকিয়ে দেখছে, এমন সময় হঠাৎ একটা বিপুল আওয়াজের সঙ্গে পায়ের তলার মাটি যেন সেকেণ্ডের জন্যে বিপুল বেগে দুলে উঠল মনে হলো। টাল সামলাতে না পেরে মিঃ স্টেডের সঙ্গে মাটিতে পড়ে গিয়ে সভয়ে সে বললে—এ আবার কী ব্যাপার মশাই, ভূমিকম্প নাকি ?

মিঃ স্টেড পড়ে গিয়েও তখন হাসছেন, বললেন—একরকম তাই বলতে পারেন। এখানে থাকলে মাঝে মাঝে এ-রকম ঝাঁকুনি খেতে হবে।

—সেকি ?

—হ্যাঁ, দ্বীপটি আসলে একটি আগ্নেয়গিরি কিনা, মাঝে মাঝে একটু প্রচণ্ড রকম আস্ফালন ক'রে ওঠেন।

—জেনে-শুনে এই আগ্নেয়গিরিতেই আস্তানা করলেন কেন ? —অসীম অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে।

—আগ্নেয়গিরি বলেই তো করেছি।—অসীমকে বিস্ময়ে অভিভূত করে মিঃ স্টেড বললেন—ওই আগ্নেয়গিরিই তো আমাদের সমস্ত শক্তির উৎস। তার উত্তাপ ও প্রচণ্ড শক্তিকে পোষ মানিয়ে কাজে না লাগাতে পারলে আমাদের এই বিরাট ব্যাপার কি সম্ভব হতো?

১০

ব্যাপারটা যে কতখানি বিরাট, অসীম কয়েকদিন এই পাতালরাজ্যে থেকেই ভালো ক'রে টের পেল। যা একদিন তার কল্পনা করবারও ক্ষমতা ছিল না, এখানে তাই বাস্তবে পরিণত হয়েছে যেন কোনো জাতুকরের ভোজবাজিতে।

এই পাতালরাজ্য ক'দিন ধরে মিঃ স্টেডের সঙ্গে ও নিজে নিজে সে যতখানি সম্ভব ঘুরে ঘুরে দেখেছে। এ যেন ভিন্ন এক গ্রহ, ভিন্ন এক জগৎ। চারিধারে নানা কাজে যে সমস্ত 'রোবট' বা কলের মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা যেন আর-এক গ্রহের আশ্চর্য কোনো জীব। যতরকম কল-কারখানার ব্যাপার এর ভেতর আছে, তার সব মর্ম বোঝা তার এঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যাতেও কুলোয় না। শুধু এইটুকু সে বুঝেছে যে পৃথিবীতে অসাধারণ বৈজ্ঞানিকরা মধুর কল্পনা-বিলাসের বিরল অবসরে যে স্বপ্ন কখনো কখনো দেখেছেন এখানে তাই এতদিন বাদে সত্যে পরিণত হয়েছে কয়েকজন অসামান্য প্রতিভাবানের আজীবনের চেষ্টায়।

মানুষ প্রকৃতির কাছ থেকে শক্তি সংগ্রহ করতে শিখেছে মাত্র এই সেদিন। তার আগে তার নৌকোর পালে সে হাওয়ার বেগকে কাজে লাগাতো, নদীর স্রোতকে দিয়ে তার জাঁতা চালাতো,—এর বেশি প্রকৃতির শক্তিভাণ্ডার থেকে কিছু নেবার কৌশল সে আয়ত্ত করতে পারে নি। তারপর এল বাষ্পের যুগ, বিদ্যুৎকে বশ করলে, খনির কয়লা ও তেল থেকে সে শক্তি আদায় করলে—কিন্তু পৃথিবীর

অধিকাংশ শক্তির উৎস তখনও তার নাগালের বাইরে। পরমাণুর মধ্যে যে অসীম শক্তি ঘুমিয়ে আছে তাকে জাগিয়ে কাজে লাগানো তো অনেক দূরের কথা, চোখের সামনে পৃথিবীর যে শক্তি-স্রোত অকারণে অপব্যয় হয়ে যাচ্ছে, যেমন—সমুদ্রের জোয়ারের শক্তি, সূর্যের তাপের শক্তি, আগ্নেয়গিরির উত্তপ্ত উদ্গারের শক্তি—এসবও মানুষ বশ করবার উপায় খুঁজে পায় নি।

কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরের এই নিরালা দ্বীপে 'সাতাত্তর সাধক' সেই অসম্ভবকেও সম্ভব ক'রে তুলেছে। একটা আগ্নেয়গিরির কল্পনাতীত শক্তি,—সমস্ত আমেরিকার সব তেলের খনিও যা জোগাতে পারে না, রূপকথার দৈত্য-ক্রীতদাসের মতো তাই এখানে মানুষের হুকুম মেনে চলেছে। সে-দৈত্যের রূপ দেখে ভয় যে না আসে তা নয়—বিশ্বাস হতে চায় না সহজে যে এই বিরাট দানব নগণ্য মানুষের হুকুম এমন ভালোমানুষের মতো চিরদিন মেনে চলবে!

কয়েকদিনের মধ্যে মিঃ স্টেডের সাহায্যে 'সাতাত্তর সাধকে'র গোপন মন্ত্রণাগারেও একদিন উপস্থিত থাকবার সৌভাগ্য তার হয়েছে। সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে যারা ষড়যন্ত্র করছে, পৃথিবীকে যারা নতুন ক'রে গড়বার স্বপ্ন দেখে, তারা চেহারায়, আচরণে কেমন তা জানবার জন্যে তার কৌতূহলের যে অন্ত ছিল না এ-কথা বলাই বাহুল্য।

প্রথম যখন পাতালরাজ্যের একটি বিরাট গহ্বরের মতো ঘরের একটি কোণে গিয়ে সে বসেছে তখন তার বুক আপনা থেকেই কেঁপে উঠেছে, উত্তেজনায়—কেমন একটা দুর্বোধ্য ভয়ে।

কিন্তু এক-এক ক'রে 'সাতাত্তর সাধক' যখন সে-ঘরে প্রবেশ ক'রে নিজেদের আসন গ্রহণ করেছে তখন প্রথমটা সে বুঝি হতাশই হয়েছে। এরাই 'সাতাত্তর সাধক'!

বয়সে তারা কেউই পঞ্চাশের নিচে নয়, অনেকের চেহারা দেখে মনে হয়, জীবনের ওপারে তারা তো এক পা বাড়িয়েই আছে। বীরের মতো চেহারা,—পৃথিবীর ইতিহাসে যে-সমস্ত অসাধারণ নেতার

কাহিনী জানা যায় তাদের মতো বিরাট ব্যক্তিত্বের ছাপ তাদের কারুর ভেতরেই বুঝি নেই। নেহাত শান্ত-শিষ্ট, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ কয়েকজন অধ্যাপক যেন তুচ্ছ কি কাজে এসে জড় হয়েছেন নীরস পণ্ডিতি আলোচনা করবার জন্যে।

কিন্তু তাঁদের আলোচনা শুরু হবার পর ক্রমশ সে বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গেছে। সব কথা সে বুঝতে পারে নি। অধিকাংশ সাধকই তাঁদের নিজেদের দেশের ভাষায় কথা বলেছেন—সে-সব ভাষা তার জানা নেই। তবু সবশুদ্ধ জড়িয়ে সে যতটুকু বুঝেছে তাতেই তার মনে হয়েছে, একেবারে নতুন এক শ্রেণীর মানুষের সে যেন প্রথম পরিচয় পেল। এঁরা যেন আরো উঁচু কোনো এক স্তরের জীব। সাধারণত আমরা অসামান্য লোক বলতে যে ধারণা ক'রে থাকি—এঁদের সঙ্গে সে ধারণা মেলে না; এঁদের মধ্যে বাহ্যিক আড়ম্বর নেই, কোনো চড়া, চোখ-ঝলসানো রঙ নেই এঁদের কথায়, চেহারায় বা আচরণে; কিন্তু তবু এঁরা যে অনেক উঁচুতে সেটুকু বুঝতে বিলম্ব হয় না।

তবে, যত উঁচু-স্তরের লোকই হন—এঁরা কি ঠিক পথে চলেছেন? এ-সন্দেহ তার নিজের মন থেকে ওঠে নি—এ-সন্দেহ জেগেছে 'সাতাত্তর সাধকে'রই কয়েকজনের সুর থেকে।

এ ক-দিন বাইরের জগতের কোনো সংবাদই অসীম পায় নি। এখানে সাধকদের আলোচনা থেকে সেখানে কী বিরাট ব্যাপার চলেছে তা জানতে পেরে তার বিস্ময়ের সীমা রইল না।

পৃথিবীর বিরুদ্ধে সাধকদের অভিযান তাহলে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে! অস্ট্রেলিয়ার ওপরেই 'সাতাত্তর সাধকে'র প্রথম আক্রমণের চোট গিয়ে পড়েছে—যুদ্ধের উপকরণ অস্ট্রেলিয়ার সামান্যই। সামান্য একটু আঘাতেই তাই সে বিকল হয়ে পড়েছে বলে শোনা গেল।

অস্ট্রেলিয়ার এই আকস্মিক দুর্দশায় পৃথিবীর সমস্ত শক্তিপুঞ্জের মধ্যে কিন্তু নিদারুণ আতঙ্কের সঞ্চার হয়েছে। আসল শত্রু যে কে এবং কারা কিছুই ঠিক ক'রে জানা নেই। তার শক্তির যে নমুনা

পাওয়া গেছে তাতেও সবাই শঙ্কিত। বড়-বড় জাতিরা মনে মনে পরস্পরকে সন্দেহ করতে শুরু করেছে—সন্দেহটা প্রশান্ত মহাসাগরের প্রধান শক্তি জাপানের ওপরই প্রথমটা বেশি হয়েছিল, কিন্তু অজানা শত্রুর হাতে জাপানের দুরবস্থা শুরু হতেই সে-সন্দেহ ঘুচে গিয়ে দারুণ বিশৃঙ্খলা ও উত্তেজনা দেখা দিয়েছে আন্তর্জাতিক রাজনীতিক মহলে। সকলেই সশঙ্ক, ও পরস্পরের প্রতি সন্দিগ্ধ। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন সংকট আর দেখা দেয় নি।

এই রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার সুযোগ কিভাবে নেওয়া যায় আজকের 'সাতাত্তর সাধকে'র সভা সেইজন্যেই আহূত হয়েছে। অধিকাংশ সাধকেরই মতে নির্মমভাবে নির্বিচারে আক্রমণ চালানোই এখন উচিত। দেশের পর দেশ, জাতির পর জাতির রাষ্ট্রব্যবস্থা ভেঙেচুরে উচ্ছেদ ক'রে দিয়ে তবে নতুন ক'রে সৃষ্টি গড়বার আয়োজন করতে হবে।

কিন্তু কয়েকজন সাধক প্রতিবাদ ক'রে বলেছেন যে অকারণে পৃথিবীতে জীবন নাশ ক'রে কোনো লাভ নেই ; পৃথিবীর বর্তমান বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে যদি বিনা রক্তপাতে তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা যায় তাহলে তারই চেষ্টা আগে করা উচিত।

—কিন্তু কী আপনারা করতে বলেন ?—অধিকাংশ সাধক প্রশ্ন তুলেছেন।

—আমরা বলি, দেশে দেশে এই অশান্তি ও আতঙ্কের সুযোগ নিয়ে আমাদের আন্দোলন প্রচার করা।

সাধকেরা কিন্তু এ-প্রস্তাবে সম্মত হন নি। আন্দোলনের দ্বারা পৃথিবীর চেহারা বদলানো যদি সম্ভব হতো তাহলে এত আয়োজন করবার দরকার ছিল না। পৃথিবীকে নতুন ক'রে গড়তে হলে রক্তপাত না ক'রে উপায় নেই—মৃত্যুর ভেতর দিয়েই নতুন জীবন পেতে হবে, এই তাঁদের সিদ্ধান্ত।

কিন্তু কয়েকজন সাধক এ-সিদ্ধান্তে খুশি হতে পারেন নি বলে অসীমের মনে হলো। তাঁরা বলেছেন—পৃথিবীকে নতুন ক'রে গড়বার

যে স্বপ্ন আমরা দেখছি সে-স্বপ্ন সফল হবে কিনা জোর ক'রে আমরাও বলতে পারি না, কিন্তু সফল যদি হয়ও তাহলে তার জন্যে দামটা বড় বেশি হয়ে যাচ্ছে মনে হয়।

সভায় এবার একটু চঞ্চলতা দেখা গেছে। যারা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে চান তাঁরা যেন একটু বিদ্রূপ ক'রেই বলেছেন—এত কোমল যাঁদের হৃদয় তাঁদের এত বড় সাধনায় নামতে আসার আগে ভাবা উচিত ছিল।

সভা থেকে সেদিন বেরিয়ে এসে অসীমের মনেও ওই প্রশ্ন কেবল খোঁচা দিয়েছে। পৃথিবীর নতুন রূপ কে না দেখতে চায়, কিন্তু এই রক্ত-সমুদ্র ছাড়া তার কি উদ্বোধন হতে পারে না? আর কি অন্য কোনো উপায় নেই?

একলা-একলা সে সেদিন পাতাল-রাজ্যের একটি কারখানার ধার দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। বৈদ্যুতিক বাতিতে পথ আলোকিত, তবু পাতাল-গর্তের গভীর আঁধার যেন আলোর কাছে হার মানে নি—কোণে কানাচে গাঢ় হয়ে জমা হয়ে যেন প্রতিশোধের অপেক্ষা খুঁজছে। এ-রাজ্যে চারিধারেই 'রোবটে'র ছড়াছড়ি। নির্বাক নির্বিকার-ভাবে তাদের কাজ করতে দেখে দেখে অসীমের কাছে এখন ব্যাপারটা অভ্যস্ত হয়ে গেছিল।

এই পথে একসার 'রোবটে'র পাশ দিয়ে চলে আসার সময়ও তাই তার কিছুই মনে হয় নি। কিন্তু লম্বা লম্বা কলের পা ফেলে তারই মধ্যে একটি 'রোবট' ঠিক তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়াতে সে সত্যিই প্রথমে একটু অবাক, তারপর কেমন একটু শঙ্কিত হয়ে উঠল।

এই অমানুষিক যন্ত্রগুলিকে অগ্রাহ্য ক'রে ভুলে থাকা যায়, কিন্তু কোনো কারণে তেমনভাবে সম্মুখীন হতে হলে বুকে একটু অস্বাভাবিক আতঙ্ক না জেগে পারে না। তারা যেন বনের হিংস্র পশুর চেয়ে দুর্বোধ। তাদের কলে তৈরী মনের ভেতর হঠাৎ কী বিকৃত ইচ্ছা জেগে উঠতে পারে কে জানে! তখন সে-যন্ত্র-দানবের কাছে তো কারো নিষ্কৃতি নেই!

অসীম একবার সভয়ে 'রোবট'টির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে পাশ কাটিয়ে চলে যাবার উপক্রম করছিল, কিন্তু 'রোবট'টি হঠাৎ হাত বাড়িয়ে তুষার-শীতল হাতে তাকে ধরে ফেললে। অসীমের শিরদাঁড়া বেয়ে তখন সত্যিই একটা হিমের মতো ঠাণ্ডা স্রোত নেমে যাচ্ছে মনে হলো।

'রোবট'টি অসীমের ওপর কোনো অত্যাচার কিন্তু করলে না, শুধু তার হাতটা ধরে টেনে সে যেন কোথায় নিয়ে যেতে চায় বলে মনে হলো।

এই যন্ত্র-দানবের শক্তির সঙ্গে আগে একবার পরিচয় না হলে অসীম হয়তো বাধা দেবার চেষ্টা করত। কিন্তু সে-রকম কিছু করতে গেলে বিপদ বাড়বে মনে ক'রেই বোধহয় সে নীরবে 'রোবট'টির হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে তার সঙ্গেই এগিয়ে গেল। একটা অজানা আতঙ্কে ও দুর্ভাবনায় বাধা দেবার শক্তিও অবশ্য তখন তার লোপ পেয়েছে।

পাতাল-সুড়ঙ্গের একটি নির্জন অন্ধকার কোণে 'রোবট'টি তাকে নিয়ে আসার পর অসীম কিন্তু অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠল। এই যন্ত্র-দানব এবার কী করবে? তার ভেতরের যন্ত্রপাতি কোথায় কী বিকল হয়ে গেছে কে জানে! হঠাৎ সে যদি এবার হিংস্র পৈশাচিক মূর্তিতে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে!

মরিয়া হয়ে নিজের অজান্তেই বুঝি অসীম সজোরে একবার হাতটা ছাড়াবার জন্যে ঝাঁকুনি দিলে। যন্ত্র-দানবের যন্ত্র-মুষ্টি থেকে ওই এক ঝাঁকুনিতেই তার হাতটা খুলে যাবে, এতটা সে আশা করতে পারে নি। ছাড়া পেয়ে পালিয়ে যাবার সুযোগ পেয়েও কিন্তু তাকে থমকে দাঁড়াতে হলো।

'রোবট'টি উচ্চৈস্বরে হাসছে!

'রোবটে'র হাসি! এ-পর্যন্ত নানা রকমের 'রোবট' দেখবার সুযোগ অসীম পেয়েছে। কিন্তু হাসি দূরে থাক, সামান্য একটা শব্দও তারা মুখ দিয়ে বার করে না। তাদের সব আছে, শুধু কণ্ঠনালীটিই নেই বলে অসীমের ধারণা ছিল।

এ আবার তাহলে কী ধরনের 'রোবট'?

এই বিস্ময় সামলে উঠতে না উঠতেই অসীম আবার চমকে উঠল।

—অত ভয় পাচ্ছ কেন ভাই! কলের মানুষ কি বন্ধু হতে পারে না!

কলের মানুষ বন্ধু!—হতভম্ব অসীমের মুখ দিয়ে আপনা থেকেই কথাটা বেরিয়ে গেল।

—হ্যাঁ, কলের হলেও মানুষ তো বটে, তারও তো বন্ধুত্ব করবার সাধ যায়—আবার হেসে উঠে 'রোবট' কয়েক পা তার দিকে এগিয়ে এল।—তুমি ভাই আজ থেকে আমার সাঙাত!

অসীম নিজের অনিচ্ছাতেই কয়েক পা সরে গেলেও মনের উচ্ছ্বাস চাপতে না পেরে বললে—বিজয়! আমি বুঝতে পারছি না—এ কি সম্ভব!

—সবই সম্ভব বন্ধু—তোমার বন্ধু বিজয় এই পাতালপুরীতে এসে কলের মানুষ হয়ে গেছে!—বলতে বলতে সত্যিই ওপরের মুখোস খুলে ফেলে বিজয় নিজ মূর্তিতে এবার বেরিয়ে এল।

খানিকক্ষণ অসীমের মুখে আর কথা সরল না। তারপর ব্যাকুলভাবে বিজয়কে জড়িয়ে ধরে বললে—এ যে এখনো আমার স্বপ্ন মনে হচ্ছে—তুই এখানে এই 'রোবটে'র বেশে···

—তোমাকে এখানে এভাবে দেখাও তো আমার কাছে স্বপ্ন! কিন্তু নিজেদের দীর্ঘ ইতিহাস বলার জায়গা এ নয়। আমার সঙ্গে চল।

—কোথায়?

—আমাদের গোপন আড্ডায়।

কিছুই বুঝতে না পেরে অসীম এবার বিজয়ের পিছু-পিছু এগিয়ে চলল। বিজয় তখন আবার 'রোবটে'র ছদ্মবেশে নিজেকে লুকিয়েছে। এত বড় বিশাল যন্ত্রের পোশাক কিভাবে সে সামলে চলেছে তাই ভেবেই অসীম অবাক হচ্ছিল।

সুড়ঙ্গের পর সুড়ঙ্গ দিয়ে ক্রমশই যেন তারা আরো নিচের দিকে



অত ভয় পাচ্ছ কেন ভাই! কলের মানুষ কি বন্ধু হতে পারে না!

নেমে যাচ্ছে মনে হলো। বিজয় কেমন ক'রেই বা এখানে এল, 'রোবটে'র ছদ্মবেশই বা কেমন ক'রে জোগাড় করলে,—এখানকার এসব রাস্তাই বা কী ক'রে তার এত চেনা হলো ভেবে অসীম কূল-কিনারা পাচ্ছিল না।

আপাতত তারা যে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল সেটি পরিত্যক্ত ও অব্যবহৃত বলে মনে হয়। কোনো 'রোবটে'র চলাফেরা এদিকে নেই। খানিক দূর গিয়ে রাস্তার আলোও আর দেখা গেল না।

অন্ধকারে একবার হোঁচট খেয়ে অসীম বললে—এ কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

—বললাম তো আমাদের গোপন আড্ডায়।—বলে বিজয় তার হাতটা ধরে অন্ধকারে কয়েক ধাপ সিঁড়ি নেমে একটা দরজায় যেন ধাক্কা দিলে মনে হলো।

ভেতর থেকে দরজা খুলে যাবার পর আবছা আলোয় পরিত্যক্ত একটা কারখানার কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি দেখা গেল। কিন্তু অসীম বিজয়ের আড্ডার এই চেহারা দেখে নয়, দরজা খুলে যে মূর্তিটি তাকে অভ্যর্থনা করলে তাকে দেখেই সত্যি ক'রে অবাক হলো।

এ লোকটি আবার কে?

ভেতরে ঢোকবার পর সাবধানে দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে বিজয় বললে—তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দি, অসীম—ইনি লোকেশবাবু, কলকাতার জলপুলিসের একজন বড় কর্মচারী।

অসীমকে সবিস্ময়ে চেয়ে থাকতে দেখে বিজয় আবার বললে—কলকাতার গঙ্গার জল প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত গড়িয়েছে দেখে অবাক হচ্ছ নিশ্চয়—সেই কাহিনীই এবার বলছি শোন।

তারপর ঘণ্টাখানেক ধরে পরস্পরের কাহিনী বলা চলল। কেমন ক'রে 'রোবটে'র রহস্য তারা জাহাজের ভেতর প্রথম আবিষ্কার করে, সে-কাহিনী শেষ ক'রে বিজয় বললে—সেই রাত্রেই এদের গোপন আস্তানায় ঢোকবার এই ফন্দি আমরা ঠিক করি। একটি 'রোবট'

আগেই জোগাড় হয়েছিল, আর একটি 'রোবট' সেইভাবে সংগ্রহ করা হলো। ভেতরের কলকব্জা সাফ ক'রে তাদের খোলসদুটির ছদ্মবেশ পরে আমরা এখানে এসে ঢুকেছি। এখানে এই আস্তানা খুঁজে পেতে ও প্রতিদিনের খাবার সংগ্রহ করতে গোড়ায় একটু বেগ পেতে হয়েছিল। কলের মানুষ নিখুঁতভাবে সেজে থাকতে হাঙ্গাম কম হয় নি।

—কিন্তু এই বিরাট খোলস তোমরা সামলাও কী ক'রে?—এর ভারেই তো কাবু হয়ে যাবার কথা!—অসীম জিজ্ঞাসা করলে।

বিজয় হেসে তাদের ছেড়ে-ফেলা 'রোবটে'র পোশাকটা অসীমের হাতে তুলে দিয়ে বললে—এ খোলস বিরাট বটে, কিন্তু তুমি যা ভাবছ সে-রকম ভারি নয়।—লোহার চেয়ে শক্ত অথচ অ্যালুমিনিয়মের চেয়ে হাল্কা কোনো মিশ্র ধাতু দিয়ে এগুলি তৈরি। সুতরাং ওজনের দিক দিয়ে এগুলি সামলাতে বিশেষ কোনো কষ্টই নেই, তবে এগুলি আমাদের শরীরের চেয়ে অনেক লম্বা। সেইজন্যে যা একটু অসুবিধে। মাথাটা ঠিক মুখোসের সঙ্গে মেলাবার জন্যে আমাদের পায়ের দিকটা অনেকখানি ভরাট ক'রে নিতে হয়েছে বাজে জিনিস দিয়ে—প্রথম-প্রথম অভ্যাস না থাকায় অসুবিধেও হয়েছে।

লোকেশবাবু এবার বাধা দিয়ে বললেন—আচ্ছা এসব কথা এখন যাক—আমাদের সামনে যে সমস্যা রয়েছে তার কী করা যায় ভাবুন।

অসীম খানিক চুপ ক'রে থেকে বললে—আমরা যে কিছু করতে পারি তাই তো আমার মনে হচ্ছে না;—এদের শক্তির পরিচয় নিশ্চয় আপনারা এ-ক'দিনে পেয়েছেন।

—কিন্তু তাই বলে কিছুই করব না আমরা। প্রশান্ত মহাসাগরে এদের অত্যাচারে নির্বিঘ্নে কেউ জাহাজ চালাতে পারবে না? লোকেশ-বাবু উত্তেজিত স্বরে বললেন।

অসীম হেসে বললে—ব্যাপারটা জাহাজ-ডুবির চেয়ে অনেক বেশি তলিয়ে গেছে লোকেশবাবু। আপনি এখানে বন্ধ থেকে বোধহয়

খবর রাখেন না যে, পৃথিবীর সমস্ত রাজত্বই ভরাডুবি হতে চলেছে!

—তার মানে?

অসীম এবার এ-কয়দিন যা যা শুনেছে সব বুঝিয়ে দিলে। অস্ট্রেলিয়ার পতনের পর জাপানের শোচনীয় অবস্থা, এবং পৃথিবীর সমস্ত রাজ্যের বিশৃঙ্খলার বিবরণ শুনে খানিকক্ষণ লোকেশবাবুর মুখ দিয়েও বুঝি বিস্ময়ে আর কথা বেরুল না।

তারপর তিনি হতাশভাবে বললেন—তাহলে আমরা বৃথাই এত কষ্ট করেছি এতদিন! এত চেষ্টা করে যে সন্ধান আমরা পেলাম তা কোনো কাজেই লাগবে না!

—সেইরকমই তো মনে হচ্ছে—যদি না—

অসীমের কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে লোকেশবাবু বললেন—আপনি কোনো উপায় জানেন নাকি?

—উপায় জানি না। তবে এই পর্যন্ত জানি যে সাধকদের সকলে পৃথিবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানো সম্বন্ধে একমত নন। তাঁদের কেউ-কেউ অনর্থক নরহত্যা পছন্দ করেন না। তাঁরা সংখ্যায় নগণ্য হলেও তাঁদের সাহায্য নিয়ে এ-অভিযান বন্ধ করবার চেষ্টা করা যেতে পারে। অবশ্য সে-চেষ্টা সফল হবার আশা অত্যন্ত কম।

—আপনি এইসব সাধকদের চেনেন?

—সকলকে চিনতে পারব না, কিন্তু একজনের মুখ আমার মনে আছে। কিন্তু তাহলেও তাঁর দেখা পাব কী ক'রে! এঁরা তো এখানকার রাস্তা-ঘাটে ঘুরে বেড়ান না! এঁরা যেখানে থাকেন সেখানে আমাদের ঢোকবার উপায় নেই।

লোকেশবাবু কিন্তু দমবার পাত্র নন। এবার তিনি উৎসাহিত হয়ে উঠে বললেন—উপায় ঠিক আছে। যেখানে কারুর প্রবেশ নিষেধ, আমরা সেখানে অনায়াসে ঢুকতে পারব।

অসীম অবিশ্বাসের হাসি হেসে বললে—কেমন ক'রে?

—'রোবট'দের সর্বত্র অবাধ গতি। আমাদের কেউ বাধা দেবার নেই।

—কিন্তু আমায় তো চিনিয়ে দেওয়া দরকার, আমি যাব কী ক'রে!

লোকেশবাবু হেসে বললেন—ছুটির জায়গায় তিনটি 'রোবট' কি হতে পারে না! আমাদের এখানে বাড়তি খোলস আছে।

অসীমকে 'রোবটে'র পোশাক নিয়ে চলাফেরা ভালো করে দুরস্ত করিয়ে তারা তিনজনে যখন গোপন আড্ডা থেকে বেরুল তখন পৃথিবীর হিসাবে প্রায় ঘণ্টা-আষ্টেক কেটে গেছে। এই পাতালপুরীর রাজ্যে অবশ্য দিন রাত্রির কোনো প্রভেদ নেই—সময়ের পরিবর্তন অন্য কোনো উপায়েও বোঝবার উপায় নেই। রক্ত-মাংসের মানুষের কোনো-না-কোনো সময়ে ক্লান্তি আসে, তার বিশ্রাম দরকার হয়। 'রোবট'দের যান্ত্রিক দেহ ক্লান্তির ধার ধারে না। সব সময়েই তাই এই পাতালপুরীর কারখানার কাজ চলেছে—সুড়ঙ্গ-পথে সব সময়েই 'রোবট'দের ধাতব পায়ের আওয়াজ।

তিনজনে 'রোবটে'র বেশে সুড়ঙ্গ-পথ দিয়ে যেতে যেতে নিজেদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধি সম্বন্ধে খুব যে উৎসাহ বোধ করছিল, তা নয়। বরং চারিধারে কল্পনাতীত বিরাট যুদ্ধের আয়োজনের পরিচয় পদে পদে পেয়ে তাদের মন আরো দমেই যাচ্ছিল। তারা সত্যিই কী করতে পারে! সাধকদের মধ্যে যাঁরা যুদ্ধের বিরোধী তাঁদের কারুর সাক্ষাৎ পেলেও কোনো ফল তাতে হবে কি? প্রথমত, যুদ্ধ সম্বন্ধে তাঁদের যে মতামতই থাক, নিজেদের গোপন পুরীতে বাইরের লোক প্রবেশ করেছে জেনে তাঁরা খুশি হবেন না। অপরের কাছে পরামর্শ নেবার জন্যেও তাঁরা নিশ্চয় খুব ব্যগ্র নন। তা ছাড়া তাঁদের কোনোরকমে দলে টানা সম্ভব হলেও অধিকাংশ সাধকের মতের বিরুদ্ধে তাঁদের পক্ষে কিছু করা নিশ্চয় যাবে না।

না, তারা নেহাত বাতুলের মতোই এই ব্যর্থ সন্ধানে চলেছে! —অসীম এই কথাটাই হঠাৎ গভীরভাবে বুঝে সঙ্গীদের বলবার জন্যে থমকে দাঁড়াল। তারা তখন পাতালপুরীর কেন্দ্রের দিকেই এসে পড়েছে। এখানে পথগুলি আর ঠিক সুড়ঙ্গ নয়। বিরাট হলের মতো উঁচু, ও খুব চওড়া। আগ্নেয়গিরির শক্তিকে যে বিশাল কারখানায়

বশ করা হয়, সে-কারখানা সেখান থেকে বেশি দূরে নয়। বহু 'রোবট' সারাক্ষণ সেখান দিয়ে চলাফেরা করছে।

অসীমের সঙ্গে বিজয় ও লোকেশবাবুও দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। লোকেশবাবু হঠাৎ সামনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে উত্তেজিত স্বরে বললেন—দেখেছেন আপনারা!

অসীমের বক্তব্য আর বলা হলো না। সে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—কী দেখেছি?

—দেখতে পাচ্ছেন না, 'রোবট'গুলো কী রকম করছে। কী যেন কোথায় গোলমাল হয়েছে!—লোকেশবাবু অত্যন্ত উত্তেজিত।

সত্যিই তো! হঠাৎ 'রোবট'গুলোর হলো কী? কোথায় গেল তাদের নির্ভুল কলের নিয়মে চলাফেরা! হঠাৎ যেন তাদের ভেতর কী পাগলামি ঢুকেছে!

সার বেঁধে যেতে যেতে কয়েকটা 'রোবট' কিছু দূরেই হঠাৎ যেন মাতালের মতো টলতে টলতে পড়ে গেল। পাশের একটা সুড়ঙ্গ থেকে অত্যন্ত অস্বাভাবিকভাবে হাত-পা আস্ফালন করতে করতে কয়েকটা 'রোবট' বেরিয়ে এসে মনে হলো নিজেদের মধ্যেই যেন মারামারি বাধিয়ে দিয়েছে।

জায়গাটা আর মোটেই নিরাপদ নয়। লোকেশবাবু তাদের দু-জনকে একরকম জোর করে টেনে অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ একটা পাশের সুড়ঙ্গের ভেতর ঢুকে পড়লেন। তারপর 'রোবটে'র পোশাক খুলে ফেলতে ফেলতে অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে বললেন—শিগ্‌গির পোশাক খুলুন!

—কেন, পোশাক খুলব কেন?—অসীম ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে বিমূঢ়ভাবে জিজ্ঞাসা করলে।

খুলবেন, পালাবার সুবিধের জন্য! বুঝতে পারছেন না, কোথায় কি গোলমাল হয়ে সমস্ত যন্ত্র-দানব বিগড়ে গেছে! এক্ষুনি প্রলয় কাণ্ড বাধবে!

লোকেশবাবুর কথা শেষ হতে না হতেই কাছেই কোনো কার-

খানায় বিরাট একটা বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দে সমস্ত সুড়ঙ্গ-পথ কেঁপে উঠল। সেই একটি নয়,—সে-বিস্ফোরণের শব্দ থামতে না থামতেই পর-পর চারিদিকে ভয়ঙ্কর আওয়াজ শুরু হয়ে গেল। পাতালপুরীর রাজ্যে যেন হঠাৎ কোথা থেকে কারা আক্রমণ করেছে! অবিরাম গোলা ফেটে পড়বার আওয়াজ!

অসীম আর বিজয়কে আর কিছু বলবার দরকার হয় নি। তারা তখন 'রোবটে'র পোশাক যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি খুলে ফেলে প্রাণপণে দৌড়তে শুরু করেছে।

কিন্তু যাবে কোথায়! বিকল, উন্মত্তপ্রায় 'রোবট'দের ভেতর দিয়ে সুড়ঙ্গের পর সুড়ঙ্গ প্রথমত চিনে যাওয়াই কঠিন, দ্বিতীয়ত, কোনো-রকমে বাইরের জগতে বেরুবার আগেই যে এ-পাতালপুরী ধ্বংস হয়ে যাবে!

আগ্নেয়গিরির আকস্মিক আস্ফালনের ফলে যে ভূমিকম্প তারা আগে মাঝে মাঝে সামান্য কিছুক্ষণের জন্যে টের পেয়েছে, হঠাৎ তা প্রচণ্ড হয়ে উঠল দেখতে দেখতে।

সুড়ঙ্গের ছাদ সশব্দে ধ্বসে পড়েছে নানা জায়গায়। তারই ভেতর বিকল 'রোবট'গুলি কোথাও মাতালের মতো টলছে, কোথাও ক্ষিপ্ত পশুর মতো ছুটোছুটি করছে।

নেহাত দৈববলে এ-সমস্ত বিপদ এড়িয়েও বহুদূর পর্যন্ত ছুটে যাবার পর তারা বুঝতে পারলে, এ-যাত্রা রক্ষা আর তাদের নেই। সমস্ত পাতালপুরীতে সত্যিই তখন প্রলয় কাণ্ড শুরু হয়ে গেছে। মানুষের শাসন যেন আর সহ্য করতে না পেরে আগ্নেয়গিরি বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। তার উন্মত্ত আস্ফালনে সমস্ত দ্বীপই বুঝি ফেটে ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে। অধিকাংশ সুড়ঙ্গ-পথই তো ছাদ ও দেওয়াল ধ্বসে পড়ে দুর্গম, তার ওপর আগ্নেয়গিরির উত্তাপ ও বিষাক্ত ধোঁয়াতে তা ক্রমশ ভরে গিয়ে নিশ্বাস নেওয়াও সেখানে কঠিন হয়ে উঠেছে; বাইরে বেরুবার পথ তারা এর ভেতর থেকে আর খুঁজে বার করতে পারবে না।

তিনজনে হাঁপাতে হাঁপাতে এক জায়গায় এসে বসে পড়ল। আর

চেষ্টা করা বৃথা তারা বুঝেছে। কিছুক্ষণের ভেতরেই এই সুড়ঙ্গের মধ্যে তাদের সমাধি হবে তারা জানে।

লোকেশবাবু এই অবস্থাতেই ম্লান একটু হেসে বললেন—আমার কিন্তু খুব দুঃখ হচ্ছে না অসীমবাবু! মরতে হবে বুঝতে পারছি, কিন্তু তবু পৃথিবীর আর কোনো সর্বনাশ এদের দ্বারা হবে না—এ সান্ত্বনাটুকু তো পেয়ে যাচ্ছি!

—কিন্তু আমাদের তো কোনো কৃতিত্ব তাতে নেই!

লোকেশবাবু আবার হেসে বললেন—কৃতিত্ব আমি তো চাই না, আমি শুধু এই ঘটনাতেই খুশি। এমনভাবে যে এই বিভীষিকার অবসান হবে তা আমি কল্পনাও করতে পারি নি।

—কিন্তু সত্যি কেমন ক'রে এ-ব্যাপার ঘটল আমি এখনো বুঝতে পারছি না—বিজয় খানিক চুপ ক'রে থেকে নিজের মনেই বললে।

—ধর্মের কল কখন বাতাসে নড়ে বোঝা যায় না। এরা মানুষের ভালো করতে দানবের শরণ নিয়েছিল। দানবই তাদের ভুল ভেঙে দিলে বিদ্রোহ ক'রে।

লোকেশবাবুর কথা শেষ হবার আগেই বিজয় সবিস্ময়ে বললে—আচ্ছা দেখুন, মানুষের কাতরানি শোনা যাচ্ছে না!

তিনজনেই ব্যস্ত হয়ে এবার উঠে পড়ল—সুড়ঙ্গ-পথের একটা বাঁকেই কে যেন গোঙাচ্ছে! কোনো 'রোবটে'র আওয়াজ তো এ নয়!

বাঁকের মুখে সুড়ঙ্গ-পথ অনেকটা ধ্বসে পড়েছে। সেখানটা খানিক পরিষ্কার করতেই লোকটিকে দেখা গেল। 'সাতাত্তর সাধকে'রই নিশ্চয় সে একজন। এখান দিয়ে পালাতে গিয়ে ধ্বসে পড়া দেওয়ালের আঘাতে গুরুতরভাবে জখম হয়েছে, কিন্তু জ্ঞান হারায় নি। তারা গিয়ে তাকে তুলে ধরতেই সে ব্যাকুলভাবে বললে—আমায় ওপরে নিয়ে চল, এই বদ্ধ সুড়ঙ্গে ইঁদুরের মতো আমি মরতে পারব না!

দুঃখের মাঝেও তিনজনের বুঝি হাসি পেল এ-কথায়। লোকেশবাবু বললেন—ওপরে যাবার রাস্তা থাকলে আমরা এখানে পড়ে আছি! ওপরে যাবার রাস্তা নেই।

—আছে, আছে, আমি জানি!—মুমূর্ষু লোকটির মুখে অসাধারণ ব্যাকুলতা ফুটে উঠল—আমি পথ বলে দিচ্ছি। তোমরা শুধু আমায় ফেলে যেয়ো না।

তিনজনের বুক যেন একসঙ্গে কেঁপে উঠল আনন্দে। পথ আছে—এখনো আশা আছে তাহলে!

—ফেলে যাব কী বলছেন! আমাদের জীবনের চেয়েও আপনার দাম বেশি!—অসীম প্রায় চিৎকার ক'রে বললে।

মুমূর্ষু লোকটি মিথ্যে কথা বলেন নি। সত্যিই তাঁর নির্দেশ মতো সুড়ঙ্গ-পথের একটি গোপন লিফ্‌ট দিয়ে তারা দ্বীপের ওপর এসে পৌঁছাল। নিরাপদ অবশ্য তখনো তারা হয় নি। আগ্নেয়গিরির গলিত লাভা ও ছাই সমস্ত দ্বীপ তখন প্রায় ঢেকে দিয়েছে।

তার ভেতর কী ক'রে বন্দর পর্যন্ত পৌঁছে তারা একটি ছোট মোটর-বোট পেয়ে তা নিয়ে সমুদ্রে বার হয়ে পড়েছিল এখনো তারা সে-কথা ভালো ক'রে স্মরণ করতে পারে না। সে যেন একটা অস্পষ্ট দুঃস্বপ্ন!

মুমূর্ষু লোকটি তাদের বোটেই মারা যান—মরবার আগে তাঁর উজ্জ্বল মুখ ও কথাগুলি শুধু তাদের মনে আছে।

তখন তাদের মোটরবোট দ্বীপ থেকে বহু দূরে সমুদ্রের মধ্যে ভাসছে। অসহ্য যন্ত্রণার ভেতরেও অত্যন্ত শান্ত থেকে তিনি বলে-ছিলেন—আমরা মস্ত বড় স্বপ্ন দেখেছিলাম—এত বড় স্বপ্ন কেউ কখনো কোথাও দেখে নি। সে-স্বপ্ন এমন ক'রে শেষ হবে জানতাম না।—জানি না এ-ই ভালো কিনা।

মোটরবোট থেকে শেষ পর্যন্ত একটি জাহাজ তাদের উদ্ধার করে। দেশে ফিরে এসে জীবনের অন্য ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে সে-সব ঘটনা অসীম ও বিজয়ের কাছেও স্বপ্নের মতো সুদূর হয়ে গেছে।

কিন্তু সে-কথা ভাবতে বসলে এখনো তাদের মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়—'সাতাত্তর সাধকে'র সাধনা সত্যিই সম্পূর্ণ ভুল ছিল কি না!

—

গল্প

জঙ্গল-বাড়ির বৌরানী



অনেকদিন থেকেই সাধ, অকুল বিশাল কোনো নদীর ওপর পান্‌সি ক'রে কয়েকটা দিনরাত্রি খেয়ালমতো স্রোতে ভাসিয়ে কাটিয়ে দেব। অনেকদিন থেকে—মানে 'ছিন্নপত্র' পড়া অবধি। সেই যে কয়েকটা ছেঁড়া ছেঁড়া আল্‌গা ছবি ছেলেবেলায় চোখের ওপর ভেসে উঠেছিল, চাঁদের আলোয় স্বপ্নের মতো বিছিয়ে থাকা বালুচর, মাঝরাতের অন্ধকার কাঁপিয়ে বুনোহাঁসের পাখার শব্দ—সে আর মন থেকে কোনো কিছুতেই মুছে যায় নি। সে-সব মধুর নামগুলোও ভুলি নি।

শিলাইদহ তো পৃথিবীর কোনো জায়গা বলে মনে হয় না আমার এখনো। সে যেন কোনো রূপকথার ভৌগোলিক নাম। আমার ছিন্নপত্রের 'পদ্মায়' তো রেলিজ্রাদার্সের পাটের ষ্টিমার যায় না, সে-পদ্মা সাত-সমুদ্দুর তেরো নদীর একটি—রুপো-গলানো তার জলে ঢেউ তুলে মধুকরের সপ্তডিঙাকে বড় জোর আমার মন ছেড়ে দিতে পারে দূর-সিংহলে বাণিজ্যে যেতে।

ছেলেবেলার সে-সাধ হঠাৎ এবার পূরণ হয়ে গেল। একেবারে পুরোপুরি পূরণ হয়ে গেল, তা বলতে পারি না, কারণ নদীটা পদ্মা নয়—ধলেশ্বরী। তাতে কিন্তু এমন কিছুই এসে যায় না। সব নদীই আশ্চর্য নদী, এপার থেকে ওপার ঝাপ্‌সা দেখলেই হলো, ফুলে উঠলেই হলো হাওয়ায় দূরের নৌকোর পাল, আর রাতের অন্ধকারে চঞ্চল জলের স্রোতে ভেসে গেলেই হলো তারার ছায়া।

বরং আসল পদ্মায় ঠিক শিলাইদহ নামটি ধরে খোঁজ করতে গেলেই খারাপ হতো। মনের ছবির সঙ্গে চোখের ছবির কেবল লাগতো কাটাকাটি-মারামারি; আমার স্বপ্ন যেত ভেঙে, আর স্মৃতিও জমতো না মধুর ক'রে।

আর আমার ধলেশ্বরীর বা অভাব কিসের। সেও ছোটখাট রণরঙ্গিণী মূর্তি ধরে বর্ষার প্লাবনে ভাঙন ধরায় লোকালয়ের কূলে। তার বুকে চর জাগে স্বপ্নের মতো, চখা-চখির ডাকে তার দুকূল কেঁদে ওঠে অন্ধকার রাত্রে!

মাঝারি সাইজের একটি পান্‌সি ভাড়া করেছিলাম। মাঝি-মাল্লা, চাকর-বাকর নিয়ে সবশুদ্ধ আমরা ছ'জন মাত্র।

এত লোকেরও বুঝি দরকার ছিল না। বিনা তাড়াহুড়োয় ধীরে-সুস্থে যেমন খুশি, ভেসে যাওয়াই ছিল আমাদের কাজ, তাও বড় বড় গঞ্জে, কি লোকালয়ের ভীড় করা ঘাটে নয়, শূন্য-নির্জন তীরে তীরে, শুধু পাখির ঝাঁক-বসা চড়ার ধারে ধারে। তার জন্যে একা চরণ মাঝিই যথেষ্ট। অধিকাংশ সময়েই তো আর সবারই ছুটি, একা চরণ বসে থাকে হালে কাঠের মূর্তির মতো। শুধু যখন মেঘনার

মোহনায় গিয়ে পড়বার উপক্রম হলো, তখন স্রোতের উজান ঠেলে যেতে দাঁড়ে হাত দিতে হয় অন্য মাঝিদের।

'ছিন্নপত্রে'র স্বপ্নের কুয়াশা মনের মধ্যে না থাকলে পান্‌সির জীবন বেশ পান্‌সে হয়ে উঠতে পারতো! গরমিল তো কম নয়! 'ছিন্নপত্রে'র পদ্মায় কচুরিপানার কুৎসিত জঙ্গল দেখেছি বলে মনে পড়ে না। তাছাড়া রামসেবকের রান্না থেকে চরণ মাঝির চেহারা পর্যন্ত—খুঁত ধরবার অনেক কিছু ছিল; কিন্তু আমি ছিলাম ওসবের প্রায় ওপরে।

প্রায় ওপরে, এইজন্যে বলছি যে, চরণ মাঝির চেহারাটা সব সময়ে ঠিক স্বাভাবিকভাবে বরদাস্ত করতে পারতাম না। এক-এক সময়ে নিজের অজান্তেই বুঝি শিউরে উঠেছি। যখন মাঝরাতে আর সবাই গড়িয়ে পড়েছে পান্‌সির খোলে, আর মেঘঢাকা চাঁদের আলোয় ধলেশ্বরী থম্ থম্ করছে, তখন মিশরের মমির মতো শুধু চরণ বসে আছে নিস্পন্দভাবে হালে। কামরা থেকে বেরিয়ে এসে হঠাৎ মনে হয়েছে, আবার সেখানেই ফিরে যাই। সেখান থেকে তবু অন্য মাঝিদের নিঃশ্বাসের শব্দ পাওয়া যায়। তাতেও যেন অনেকখানি ভরসা!

সত্যি, জ্যান্ত মানুষের এমন অদ্ভুত মরা-চেহারা হতে পারে, এ আমি আগে কখনো জানতাম না। রঙ তার কালো বলে নয়, কালো তো সব মাঝিই, কিন্তু তার চামড়ায় যেন কি একটা অপার্থিব বিবর্ণতা! যেন অনেকদিন মাটির তলায় সে চাপা পড়েছিল! এই সবেমাত্র যেন উঠে এসেছে শ্যাওলধরা ভিজে-মাটি মুছে গা থেকে।

লোকটার ধরন-ধারণও অদ্ভুত। কথা সে খুব কমই কয়, অত্যন্ত ভারি হাঁড়ির মতো গলায় শুধু একটু-আধটু 'হাঁ না' ছাড়া আর কিছু বলতে শুনেছি বলেও মনে পড়ে না। অন্য মাঝিদের সাথে তার মেলামেশাও নেই। তবু সবাই যেন একটু সভয়ে তাকে সমীহ ক'রে দূরে রেখে চলে, সে কেবল তার মরা-চামড়া সত্ত্বেও দৈত্যের মতো বিশাল চেহারার জন্যে।

সেদিনও মেঘে-ঢাকা ভাঙা-চাঁদের মরা-জ্যোৎস্নায় চারিদিক ছম্ ছম্ করছে।

সন্ধ্যে থেকেই মাঝিদের মধ্যে একটু ফিস্‌ফিস্, গুন্‌গুন্ শুনছিলাম। রাত একটু হতেই তার কারণটা বোঝা গেল।

একজন মাঝি সাহস ক'রে এগিয়ে এসে, কান-মাথা চুলকে, আমতা আমতা ক'রে জানালে যে, আমি যদি তাদের ছুটি দিই, তাহলে তারা একটু ভালো 'যাত্রা' শুনে আসে।

'যাত্রা' কোথায় হচ্ছে, হেসে জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম খানিক আগে যে গঞ্জ আমরা পেরিয়ে এসেছি, সেইখানেই নাকি ভারি নামজাদা এক দল এসেছে। এমন 'যাত্রা' শোনবার ভাগ্য নাকি এ-তল্লাটে সহজে মিলবে না। আমার মুখের ভাবে ভরসা পেয়ে সে আমাকেও সঙ্গে যাওয়ার প্রস্তাব ক'রে ফেলে এবার।

হেসে বললাম—না মাঝির-পো, আমার অত শখ নেই; তবে তোমরা শুনে আসতে পার, ইচ্ছে হয়েছে যখন; কিন্তু গঞ্জের ঘাটে তো আমি থাকতে পারব না।

মাঝি তৎক্ষণাৎ খুশি হয়ে জানালে যে, আমায় সে-কষ্ট তারা দেবে না। এখান থেকে কতটুকু আর পথ, তারা পাড় দিয়ে হেঁটেই যাবে। যাত্রা ভাঙলেই ফিরে আসবে ভোরবেলা, কিন্তু আমার ভয় করবে না তো?

হেসে বললাম—তা যদি একটু করে, মন্দ কি!

মাঝি সাহস দিয়ে জানালে—এখানে ভয়ের অবশ্য কিছুই নেই। জল-ঝড়ের সময় নয়, নৌকো নোঙর-বাঁধা থাকবে নিরাপদ জায়গায়।

হঠাৎ কেন যে জিজ্ঞাসা করলাম জানি না—চরণ মাঝি যাচ্ছে তো তোমাদের সঙ্গে?

মাঝির মুখে 'যাচ্ছে বই কি কর্তা' শুনে কেমন যেন আশ্বস্ত বোধ করলাম বলেই একটু লজ্জিত হলাম।

মাঝিরা সব চলে যেতেই একেবারে পান্‌সির কামরার ছাদে উঠে

গিয়ে বসেছিলাম। এমন অপরূপ নির্জনতা ভোগ করার সৌভাগ্য কখনো তো হয় নি! মাঝিরা সবাই চলে গেছে, হিন্দুস্থানী ঠাকুর রামসেবকও পর্যন্ত সঙ্গে গেছে হুজুকে পড়ে। দূরে কোথাও একটা-দুটো নৌকোর আলো পর্যন্ত নেই, বিশাল ধলেশ্বরীর বুকে আমি একা—এ-কথা ভাবতেও কেমন যেন পুলকে রোমাঞ্চ হয়!

ঠিক পুলকের রোমাঞ্চ কিন্তু পরে সেটা রইল না। রাত্রির নির্জনতায় ধ্যান করতে করতে কখন বোধহয় একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। উঠে দেখি, চারিদিকের দৃশ্য বেশ বদলে গিয়েছে; ভাঙা-চাঁদ পশ্চিমের দিগন্তে ঢলে পড়ে কেমন যেন ফ্যাকাশে হলদে হয়ে উঠেছে। সেই ফ্যাকাশে হলদে চাঁদের আলোয় কূলহীন ধলেশ্বরীর রুগ্ন-মলিন চেহারাটা ভারি অস্বস্তিকর লাগল। একটা নাম-না-জানা পাখি দূর-আকাশে কিরকম আর্তনাদের মতো ডাক ছেড়ে উড়ে গেল। শিউরে উঠলাম একটু।

বুঝলাম এতক্ষণ এই খোলা জায়গায় শুয়ে ঘুমানো উচিত হয় নি। অনেকক্ষণ হিম খেয়ে শরীরটা কেমন যেন ম্যাজমেজে হয়ে উঠেছে, মনটাও সেই সঙ্গে।

ওপর থেকে নামতে যাচ্ছি, হঠাৎ থমকে গেলাম। এদিকে এতবড় একটা বিশাল পোড়োবাড়ি ছিল নাকি! বাড়ি না বলে তাকে প্রাসাদই অবশ্য বলা উচিত। ফাটল-ধরা বিশাল দেয়ালগুলো হুমড়ি খেয়ে পড়েও এখনো যেন আকাশ আড়াল ক'রে আছে। বুঝলাম, এতক্ষণে জ্যোৎস্নার অস্পষ্ট আলোয় এই পোড়ো-প্রাসাদ কুয়াশায় মিশেছিল, চাঁদ এখন তার পিছনে গিয়ে পড়তেই অন্ধকারের দৈত্যের মতো জেগে উঠেছে। এই পোড়ো-প্রাসাদ সম্বন্ধে কাল মাঝিদের কাছে খোঁজ নিতে হবে ভেবে আবার নামতে গিয়েও থামতে হলো।

পেছনে কি একটা ঝন্‌ঝন্ ক'রে শব্দ হলো যেন। সত্যি বলছি, এবার ফিরে চেয়ে গায়ে একটু কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। নিজেকে একেবারে একা বলে জানবার পর হঠাৎ পেছন ফিরে আর একটি

লোককে অপ্রত্যাশিতভাবে আবিষ্কার করলে গায়ে কাঁটা দেওয়া অস্বাভাবিক বোধ হয় না।

একি চরণ!—প্রায় ধরাগলায় বললাম—তুমি কখন ফিরলে। যাত্রা দেখলে না?

সে শেকল-সমেত নোঙরটা তুলে পান্‌সির ওপর রেখে গম্ভীরস্বরে বললে—না!

কিন্তু নোঙর তুললে কেন?—অত্যন্ত অস্বস্তির সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম। তার এভাবে একলা ফিরে আসাটা আমার একদম ভালো লাগছিল না।

সে সামনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললে—দেখেছেন!

দেখি নি; কিন্তু এইবার দেখলুম। সেদিন রাত্রিশেষে যে অদ্ভুত, অসাধারণ সব ঘটনা একসঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে এসেছে আমার জীবনে, তখনো তা তেমন ভালো ক'রে বোধহয় বুঝি নি।

পাড়ের ওপর জলের একেবারে কিনারায় একটি দীর্ঘ নারী-মূর্তি ব্যাকুলভাবে আমাদের হাত নেড়ে ডাকছে।

কে ও? জানো নাকি!—প্রায় চিৎকার ক'রে উঠলাম বিস্ময়ে—উত্তেজনায়।

হাল ঘুরিয়ে নৌকো সেই পাড়ের কাছে ভিড়াতে ভিড়াতে চরণ শুধু নিঃশব্দে মাথা নাড়ল।

পাড়ে ভিড়তে না ভিড়তে মহিলাটি যেন পাগলের মতো ঝাঁপিয়ে এসে পান্‌সিতে উঠলেন। আমার কাছে এসে তারপর ভীত-ব্যাকুলস্বরে বললেন—আমায় বাঁচান! আমায় বাঁচান! দোহাই আপনার!

সে-অবস্থায় যতদূর সম্ভব স্থির হয়ে বললাম—আমার যতদূর সাধ্য, চেষ্টা করব; কিন্তু কি ব্যাপার, আমার একটু জানা দরকার। আপনি আমার সঙ্গে কামরায় চলুন।

আঁচল ঢাকা দিয়ে কি যেন একটা ভারি জিনিস তিনি বয়ে এনেছিলেন। কামরার চৌকাঠের কাছে সেইটের ভারে একটু

হোঁচট খেতে ভদ্রতা ক'রে বললাম—ওটা বড্ড ভারি বোধহয়। আমার হাতে দিতে পারেন।

তিনি এ-কথায় এমন আঁত্কে উঠে পিছু হটে দাঁড়াবেন জানলে নিশ্চয়ই ও-কথা বলতাম না। তাই একটু বিমূঢ়ভাবেই নিজের কামরায় ঢুকে লণ্ঠনটা আর একটু উজ্জ্বল ক'রে দিলাম।

নিজের ব্যবহারে তিনিও বোধহয় একটু লজ্জিত হয়েছিলেন। ঘরে ঢুকে আঁচলের আড়াল থেকে একটা অদ্ভুত-আকারের বাক্স বের ক'রে আমার সামনে রেখে তিনি বললেন—আমায় মাপ করবেন। আপনাকে অবিশ্বাস করা আমার উচিত হয় নি ; কিন্তু ভয়ে ভয়ে এমনি হয়ে গেছি!

মহিলাটিকে কামরার আলোয় এতক্ষণে ভালো ক'রে দেখলাম। চেহারায় তাঁর স্পষ্ট বড়ঘরের ছাপ, কিন্তু কথাবার্তা, ধরন-ধারণ যেমন তাঁর অদ্ভুত, তেমনি অদ্ভুত তাঁর পোশাক! যাই হোক, তখন সে-সব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নয়। তাঁর কথার উত্তরে জিজ্ঞাসা করলাম —ভয়টা কিসের? কি আছে ওতে?

তিনি কথা না বলে শুধু বাক্সের ডালাটা এবার তুলে ধরলেন। লণ্ঠনের সেই সামান্য আলোতেই বাক্সের ভেতর কুণ্ডলীপাকান একরাশ সাপের চোখ যেন জ্বলে উঠল। চমকে গেলাম। সাপ নয়—হীরা-মুক্তোর জড়োয়া গয়না! তেমন গয়না আমি তো কখনো দেখি নি।

মহিলাটি মুঠো ক'রে কয়েকটা গয়না বাক্স থেকে তুলে কামরার মেঝেয় ছড়িয়ে দিলেন। আমি নিজের অনিচ্ছাতেই একটু শিউরে সরে বসলাম। সেগুলো যেন জড়বস্তু নয়, জীবন্ত ক্রূর সরীসৃপ!

দরজায় খুট্ ক'রে একটু শব্দ হতে মুখ তুলে দেখি—চরণ, কখন সেখানে নিঃশব্দে ছায়ার মতো এসে সে দাঁড়িয়েছে। তার কোটরে ঢোকা চোখেও যেন সাপের মতো হিংস্র লোভের ঝিলিক!

পলক ফেলতে না ফেলতেই সে সরে গেল। ভয় পেয়ে একটু বিরক্তির স্বরে বললাম—তুলে ফেলুন এসব বাক্সে। এসব সাংঘাতিক জিনিস নিয়ে আপনি কি বলে এই রাতে একা বেরিয়েছেন!

আমার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে গয়নাগুলি বাক্সে তুলতে তুলতে তিনি বললেন—বেরুব না? ওরা যে এসব ছিনিয়ে নিতে চায়!

ওরা কারা?

আমার শ্বশুর-বাড়ির জ্ঞাতিরা। আমার স্বামী বিদেশে। ওদের এখন এই গয়নাগুলোর ওপর অসীম লোভ। ওরা সব করতে পারে এগুলোর জন্যে—খুন করতে পারে! কিন্তু আমি দেব না, কিছুতেই দেব না। রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে তাই আমি পালিয়ে এসেছি।

কিন্তু আপনি যাবেন কোথায়?

যাব বাপের বাড়ি। ওরা আমায় দিনরাত আগলে রাখে, যেতে দেয় না। দোহাই আপনার! দু'ক্রোশ মাত্র গেলে আমার বাপের বাড়ি। আমায় সেখানে পৌঁছে দিন!

আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমি ব্যবস্থা করছি—বলে আমি কামরা থেকে চরণকে আদেশ দেওয়ার জন্যে বেরোলাম।

কিন্তু আশ্চর্য! চরণ যেন আগে থাকতেই সব জানে। সে হালে বসে আছে। নৌকো চলছে।

বললাম—ক্রোশ-দুয়েক বাদে নৌকো থামিয়ে খবর নিও।

নিশ্চলভাবে বসে কি যেন একটা অস্পষ্ট জবাব দিলে। অত্যন্ত বিশ্রী একটা অস্বস্তি নিয়ে আবার আমি কামরায় ঢুকে বললাম—আমি বাইরে যাচ্ছি, আপনি এ-কামরার ভেতর থেকে দরজা দিয়ে দিন।

তিনি ব্যাকুলভাবে বললেন—না না, সে আরো ভয় করবে। আপনি আমার সঙ্গে থাকুন।

উত্তরে কিছু বলবার আগেই টলে গিয়ে চমকে উঠলাম। একি! নৌকো হঠাৎ ঘুরে গেল কেন? চরণ মাঝি হাল ছেড়ে দিয়েছে নাকি! পান্‌সি নিজের খেয়ালে ঘুরছে!

টাল সামলে উঠেই বুঝলাম, আমার আশঙ্কা মিথ্যে নয়। ডুবে-যাওয়া চাঁদের শেষ ক্ষীণ আলোয় দেখলাম, ঠিক যমদূতের মতো চরণ

এসে কামরার দরজায় দাঁড়িয়েছে। কি হিংস্র লোভ তার অমানুষিক চোখে ও মুখে! বুকের রক্ত হিম হয়ে যায় সেদিকে তাকালে!

অপরিচিতা মহিলা আতঙ্কে চিৎকার ক'রে বাক্সটি সজোরে বুকে আঁকড়ে ধরে উঠে দাঁড়ালেন। ছুটে বেরিয়ে এলেন বুঝি আমার কাছে সাহায্যের আশায়। কিন্তু বৃথা! আমি বাধা দিতে যেতেই সবল হাতের একটি মুষ্টিতে মাথা ঘুরে সজোরে পড়ে গেলাম কাঠের মেঝের ওপর। মাথায় চোট খেয়ে তখন আমার কিরকম একটা আচ্ছন্ন—অভিভূত অবস্থা! চোখের সামনে যা ঘটছে, তা দেখতে পেলেও আমার যেন উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই, গলার স্বর পর্যন্ত রুদ্ধ হয়ে গেছে।

মহিলা প্রাণপণে তাঁর মহামূল্য বাক্সটি রক্ষা করবার চেষ্টা করছেন; কিন্তু স্ত্রীলোক হয়ে সে-দৈত্যের সঙ্গে তিনি পারবেন কি ক'রে!

ধীরে ধীরে বাক্সটি কায়দা ক'রে নিয়ে চরণ তাঁকে নৌকোর ধারে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি টলছেন একেবারে জলের কিনারায়। দারুণ হতাশায় শেষ শক্তি সংগ্রহ ক'রে তিনি প্রচণ্ড একটা টান দিয়ে বাক্সশুদ্ধ জলে পড়ে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দুশমনও।

এতক্ষণে একসঙ্গে গলার স্বর আর দেহের সাড়া পেয়ে আমি চিৎকার ক'রে ছুটে গেলাম পান্‌সির ধারে। মহামূল্য বোঝায় ভারি সেই বাক্সের টানে দু'জনেই তলিয়ে যাচ্ছে নদীর অতলে—কেউ তবু ছাড়বে না তার দখল।

সাঁতার জানি না, মহিলাটির সাহায্যে ঝাঁপিয়ে পড়েও কিছু করতে পারব না। আমি আবার চিৎকার ক'রে উঠলাম। যদি কোথাও কেউ থাকে, তাই সাহায্যের আশায়।

চাঁদ ডুবে গিয়ে ভোরের প্রথম নীল্‌চে আলোয় তখন নদীর কুয়াশা তরল হয়ে যাচ্ছে। কটা ইলিশ মাছের ডিঙি বুঝি কাছেই ছিল। চিৎকার শুনে তারা কাছে এসে ভিড়ল। ব্যাকুলভাবে এক-নিঃশ্বাসে তাদের যথাসম্ভব সমস্ত ঘটনা জানিয়ে যেখানে তাদের দু'জনে ডুবেছে, সে জায়গাটা দেখালাম।

তারা প্রথমে গম্ভীর হয়ে শুনে শেষে হেসে উঠল। হেসে জানালে যে, এ-রকম আজগুবি ব্যাপার হতেই পারে না। যত ভারি জিনিসই হোক, একেবারে গায়ে বাঁধা না থাকলে কাউকে একটানে ডুবিয়ে নিতে পারে না। তাও দু'-দুটো লোককে। হাতে ধরে কাড়াকাড়ি করতে করতে ডুবলে দু'জন না হোক, একজন তো ভেসে উঠতোই। আর তা ছাড়া দু'ক্রোশ কেন, এদিক-ওদিক বিশ-ক্রোশের ভেতর প্রাসাদের মতো কোনো পোড়োবাড়িই নদীর ধারে নেই। দামী গয়নার বাক্স সমেত ও-রকম মেয়েলোক আসবে কোথা থেকে!

আমি রেগে উঠে বললাম—তবে কি আমি মিথ্যে বলছি?

বৃদ্ধগোছের একটি মাঝি একটা ডিঙির এককোণে বসে এতক্ষণ নীরবে তামাক খেতে খেতে আমার কথা শুনছিল। তারা কিছু বলবার আগেই সে এগিয়ে এসে শান্তস্বরে বললে—না বাবু, আপনি মিথ্যে বলেন নি, আমি জানি। আপনি জঙ্গল-বাড়ির বৌরানীকে দেখেছেন।

তার সমর্থনে একটু ভরসা পেয়ে বললাম—জঙ্গল-বাড়ির বৌ-রানী! তুমি জান তাহলে! কোথায় জঙ্গল-বাড়ি বল তো?

খানিক চুপ ক'রে থেকে নিচে জলের দিকে আঙুল দেখিয়ে সে হঠাৎ বললে—ওইখানে বাবু! আজ পঞ্চাশ বছর হলো জঙ্গল-বাড়িকে নদী টেনে নিয়েছে। তবে বৌরানী তাঁর জ্বালা ভোলেন নি। এখনো মাঝে মাঝে কারো কারো পান্‌সিতে এসে ওঠেন।

জেলেরাই আমার পান্‌সি তারপর তীরে পৌঁছে দেয়। মাঝি-মাল্লারা যাত্রা থেকে ফিরে ব্যাকুল হয়ে তখন আমায় খুঁজছে। তাদের কাছে জানলাম, চরণ মাঝি তাদের সঙ্গেই ছিল সারারাত যাত্রার আসরে।

বুঝলাম, সব না হয় স্বপ্ন; কিন্তু আমার পান্‌সির নোঙর কে তুললে?

পান্‌সির ভাড়া চুকিয়ে পরের দিনই কলকাতায় ফিরেছি। কাজ নেই আমার আর পান্‌সি-বিহারে। আমি 'ছিন্নপত্র'ই পড়ব।



হারুর হঠাৎ হলো কি ?

ক-দিন ধরে তাকে আর দলে পাওয়া যাচ্ছে না। আমাদেরও সব মজা প্রায় মাটি।

হারু হলো আমাদের সর্দার। সে না হলে কোনো খেলাই জমে না।

আমাদের তিন হাত চওড়া গলিতে ক্যাম্বিশের বল নিয়ে ফুটবল খেলতেও সে না হলে চলে না, রাত্তির বেলা আমাদের গলির পোড়ো বাগান-বাড়িটায় লুকোচুরি খেলতেও সে না থাকলে কারুর সাহসে কুলোয় না। পাড়ার সমস্ত ওয়ারিশ বেওয়ারিশ কুকুর জড় ক'রে গলায় নম্বর বেঁধে ঘোড়দৌড় করাবার কল্পনা সে ছাড়া আর কার মাথা থেকে বেরোয় !

সেই হারুর হলো কি ? ক-দিন থেকে বড় যেন গম্ভীর। আমাদের কাছেই ঘেসে না। দেখা পাওয়াই শক্ত। পেলেও বোঝা যায়, কি

এক গভীর চিন্তায় সে নিমগ্ন। আমাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবার সময় নেই।

না, এটা ঠিক বৈরাগ্য গোছের কিছু নয়। ক্লাশে সে ঠিকই উঠেছে, বাড়িতে বকুনিও কিছুর জন্যে খায় নি। বাড়ির একমাত্র আদুরে ছেলে, বকুনি সে কখনো খায় না বললেই হয়।

কি যে হারুর হয়েছে দুদিন বাদে একটু যেন আঁচ পাওয়া গেল।

শনিবার দুপুর বেলা ইস্কুল থেকে ফেরবার সময় জোর ক'রে হারুর সঙ্গ নিয়েছি, তার ঔদাসীন্য অগ্রাহ্য ক'রে।

'চোর পুলিশ খেলবি আজ?' একবার গায়ে পড়ে জিজ্ঞাসাও করেছি।

'চোর পুলিশ!' হারু এমনভাবে একটু হেসেছে যেন এসব ছেলেমানুষি খেলার সে অনেক ওপরে।

খানিক বাদেই কিন্তু তার রহস্য খানিকটা ধরা পড়ল।

গলিতে ঢোকবার মুখেই হঠাৎ দেখি সে থমকে দাঁড়িয়ে আছে।

'ওকি! দাঁড়ালি কেন? চল্!'

'চুপ! ভাবতে দে।'

রাস্তার মাঝখানে হঠাৎ দাঁড়িয়ে ভাববার কি হলো বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলাম—'ভাববার হঠাৎ হলো কি!'

'কি হলো? এই মাত্র যে লোকটার সঙ্গে ধাক্কা লাগল তাকে লক্ষ্য করেছিস্?'

'লক্ষ্য করব! কেন?'—আমি সবিস্ময়ে বললাম, 'ও তো ফিরি-ওয়ালা একটা। প্রায়ই এ-পাড়ায় শাড়ী ধুতি বোম্বাই চাদর ফিরি করতে আসে!'

'হুঁ, তা তো আসবেই! সেই জন্যেই ওর গায়ে ইচ্ছে ক'রে ধাক্কা লাগালাম!'

বোঁচকা ঘাড়ে ফিরিওয়ালার সঙ্গে শখ ক'রে ধাক্কা লাগাবার সুখটা যে কি, কিছু বুঝতে না পেরে থ হয়ে গেলাম।

করুণা ক'রে হারুই এবার একটু ব্যাখ্যা ক'রে দিলে—'ধাক্কা লাগতেই লোকটার চাউনিটা কি রকম হলো দেখলি !'

'দেখলাম তো ! প্রায় মারে আর কি !'

'ওই তো !' হারু গর্বের হাসি হেসে বললে, 'তোদের এখনো চোখই তৈরি হয় নি। সকলের হয় না। খুঁটিনাটি অনেক কিছু একবার চেয়েই যদি না ধরা যায় তাহলে চোখ কিসের !'

'তোর চোখে কি ধরা পড়ল শুনি ?'—আমার প্রশ্নটা খুব প্রসন্ন স্বরে বেরুল না।

হারুর সেই বিজ্ঞের হাসি—'লোকটা ফিরিওয়ালা নয়।'

'ফিরিওয়ালা নয় তো কি ?'—আমি অবাক।

'কোনো রাজ্যের গুপ্তচর। এখানকার সব বড় বড় ঘাঁটির ফটো তুলে নিয়ে যেতে এসেছে। ধাক্কা দিয়েই বুঝলাম কি একটা শক্ত জিনিস পুঁটলির মধ্যে রয়েছে। সেটা ক্যামেরা।'

একসঙ্গে এতগুলো রহস্যে একটু দিশাহারা হয়ে শুধু জিজ্ঞাসা করতে পারলাম—'কিন্তু আমাদের এ গলিতে কেন ? এখানে আবার বড় ঘাঁটি কোথায় ?'

হারু অবজ্ঞাভরে আমার দিকে তাকিয়ে জবাব দেওয়ার প্রয়োজনই মনে করল না এ বাজে প্রশ্নের।

হারুর দল ছাড়ার রহস্য তার পরদিনই পরিষ্কার হলো। হারুর অনেক বিদ্যার কথা জানা ছিল, সে যে একজন গোয়েন্দা এই খবর শুধু পাই নি।

খবরটা হারুর কাছেই পেলাম অবশ্য। আমাকে সাকরেদ করতে স্বীকার ক'রে অত্যন্ত গোপনে সে ব্যাপারটা আমায় জানালে। গোয়েন্দা হবার জন্যে অনেককাল ধরেই সে নাকি সাধনা করছে লুকিয়ে। এইবার তার কাজে নামবার পালা।

হারু গোয়েন্দা হওয়ার ফলে দিনগুলো প্রথম নেহাৎ মন্দ কাটতে লাগল না।

আমাদের নিতান্ত নগণ্য বেচু পরামাণিকের গলির ভেতর এত রহস্য রোমাঞ্চ লুকিয়ে ছিল কে জানত!

আমাদের গোয়েন্দার দপ্তর দিনদিনই মোটা হয়ে উঠতে লাগল। আর রহস্যজনক জিনিসের সংগ্রহের তো কথাই নেই। হারুর মা-র কাছে কাকুতি মিনতি ক'রে চেয়ে আনা হাতবাক্সে আর কুলোয় না।

জিনিসই কত রকমারি। হারু তো কিছুই ফেলবার পাত্র নয়। পুরোনো কটা ছেঁড়া হ্যাণ্ডবিল, কার একপাটি ছেঁড়া জুতো, মরচে ধরা একটা ভাঙা চাবি, শেষকালে খালি দেশলাইএর বাক্স পর্যন্ত।

খালি দেশলাইএর বাক্সটায় আমি মৃদু আপত্তি জানাতে গিয়ে ধমক খেয়েছিলাম।

'তুই এ-সবের বুঝিস কি? কিসে যে কি কাজ হয়, কে বলতে পারে? এই খালি দেশলাইএর বাক্স থেকে একটা খুনের কিনারা হয়ে যেতে পারে, জানিস্?'

সভয়ে নিবেদন করেছিলাম—'কিন্তু খুনটা তো আগে হওয়া দরকার! এ অঞ্চলে কোথাও কোনো খুনোখুনির খবর তো কই পাওয়া যায় নি!'

কিন্তু হারু সামান্য একটা খুনের অভাবে হার মানবার পাত্র নয়। তৎক্ষণাৎ খিঁচিয়ে উঠেছিল আমায়—'খবর পাওয়া যায় নি তো হয়েছে কি? খবর কি সব আগে পাওয়া যায়। তা ছাড়া বদমায়েসরা খুন জখম করবার ঢের আগে থেকে ফন্দি আঁটে তা জানিস। সেই ফন্দিটা ধরতে পারাই হলো বাহাদুরি।'

আর কিছু বলা নিরাপদ নয় জানা সত্ত্বেও মুখ থেকে ফসকে বেরিয়ে গেছিল—'কিন্তু ওই দেশলাইএর বাক্সটায় খুনোখুনির কোনো ফন্দি আছে নাকি? খানিক আগে হাবুলের বাবাকেই ওটা ফেলে দিতে দেখলাম যে।'

হাবুলের বাবা পাড়ার নেহাৎ নিরীহ ভদ্রলোক। দু-পায়ে গেঁটে বাত বলে নিজের বাড়ির রক থেকে বড় নামেন না। হারু এক সেকেণ্ডের জন্যে গুম্ হয়ে গিয়ে তার ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করেছিল তার

পর—'অত যদি আমার ওপর অবিশ্বাস, আমার সঙ্গে থাকবার দরকার কি? গোয়েন্দাগিরি যার-তার কর্ম নয়!'

এর পর হারুকে আর ঘাঁটাবার সাহস হয় নি।

তার কথাই নির্বিবাদে মেনে তার সাকরেদি ক'রে চলেছি।

ইস্কুলের ছুটির পর ফুটবলের মাঠটার দিকে মনটা ছুটলেও সে-কথা ঘুণাক্ষরেও হারুকে জানতে দিই না।

হারু এখন ওসব তুচ্ছ ছেলেমানুষি খেলাধুলোর অনেক ওপরে। সারা বিকেলটা হারুর সঙ্গে সঙ্গে 'রোঁদে' ঘুরে বেড়াতে হয়, অনেক কিছুর ওপর নজর রাখতে, আর যাকে বলে 'ক্লু' সংগ্রহ করতে। 'ক্লু' কথাটা হারুর কাছে শিখেছি। কোথায় কি হচ্ছে বা হবে তার হদিস্ দেবার টুকিটাকি হলো 'ক্লু'। আর এই 'ক্লু' চেনাতেই নাকি গোয়েন্দাদের বাহাদুরি।

'ক্লু' চেনা যে কত শক্ত, হারুর সঙ্গে ঘুরে তা পদে পদেই টের পাই।

রাস্তার ধারে খানিকটা সিগারেটের বাক্সের ভেতরকার রাঙতা পড়ে আছে হয়তো। হারু সেটা একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ে তুলে নেয়। ঝাঁপিয়ে পড়ার মানেটা আমি ঠিক বুঝতে পারি না। ধারে কাছে সেটা নিয়ে কাড়াকাড়ি করবার মতো কোনো লোকই নেই। তবু 'ক্লু' সংগ্রহ করতে ঐ রকম ঝাঁপিয়ে পড়াই বোধহয় নিয়ম।

রাঙতাটাকে বেশ কিছুক্ষণ ধরে গভীর মনোযোগের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ ক'রে হারু সেটা আমার হাতে দিয়ে হুকুম করে—'নে, রাখ্।'

'ক্লু' বইবার ভার আমার ওপর। 'ক্লু' হিসেবে রাঙতার দামটা যে কি সে-বিষয়ে একটা বেয়াড়া প্রশ্ন জিভের ডগা পর্যন্ত এগিয়ে এলেও ঢোক গিলে আবার সেটাকে নামিয়ে দিয়ে রাঙতাটা থলিতে চালান করি। হ্যাঁ, থলি একটা সঙ্গে থাকে, আর থলিটা প্রায় প্রতিদিনই ছেঁড়বার উপক্রম।

কিন্তু তার পরই আমার গোয়েন্দাগিরি প্রায় শেষ হবার জোগাড়।

হঠাৎ মোক্ষম একটা 'ক্লু' পেয়ে আমিও ঝাঁপিয়ে পড়ি রাস্তার ওপরে।

রাঙতাটা যা থেকে বেরিয়েছে সিগারেটের সেই খালি বাক্সটাই পেয়ে গেছি!

সাগ্রহে সেটাকে তুলে ধরে, যতরকমে সম্ভব সেটা পরীক্ষা ক'রে দেখি। মায় শুঁকে পর্যন্ত। এটা হারুর ওপর একটু টেক্কা দেওয়া। রাঙতার বেলা শুঁকে দেখাটা হারুর বাদ ছিল।

পরীক্ষা শেষ ক'রে সগর্বে খুশি মনে বাক্সটা থলিতে ভরতে যাচ্ছি হঠাৎ হারু বলে ওঠে—'ওটা কি হচ্ছে কি?'

হারুর বলার ধরনটা আমার ভালো লাগে না, কটমট ক'রে তার তাকাবার ধরনটাও।

'কেন? "ক্লু" রাখছি।'

'দেখি।'—বলে হারু তাচ্ছিল্যভরে হাত বাড়ায়।

মূল্যবান 'ক্লু'টা অমন তাচ্ছিল্যভরে নেওয়াটা আমার পছন্দ হয় না। তবু তার পরীক্ষার ফলাফল জানবার জন্যে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করি।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় না।

নিতান্ত অবজ্ঞাভরে একবার হাতে নিয়ে দেখেই হারু সেটা ফেলে দেয়।

আমার বিদ্রোহও ফেটে বেরোয়—'ফেলে দিলে যে!'

'দিলাম ওটা কিছু নয় বলে!'—হারু নির্বিকার।

'তোমার রাঙতাটা "ক্লু", আর আমার সিগারেটের বাক্সটা কিছু নয়?'—আমি বেপরোয়া বলে ফেলি।

হারু বিজ্ঞের মতো একটু ব্যঙ্গের হাসি হাসে। '"ক্লু" চেনা যদি অত সহজ হতো, তাহলে সবাই গোয়েন্দা হতে পারত, বুঝেছিস্!'

'তাহলে তুমি একলাই গোয়েন্দা হয়ে থাকো, আমার দরকার নেই।' মরিয়া হয়ে এত বড় কথাটা বলে দিয়ে থলেটা তার সামনে ফেলে দিয়ে হন হন ক'রে আমি চলে যাই।

কত দূর যেতাম বলতে পারি না। গলির শেষটা পর্যন্ত নিশ্চয়। কিন্তু অত দূর যেতে হয় না। আমার পা ফেলার তালটা খুব বেশি ঢিমে হবার আগেই হারুর ডাক শোনা যায়।

'শোন্।'

এ ডাক অবহেলা ক'রে আর একটা ডাকের আশায় এগিয়েও যাওয়া যায় আর একটু। কিন্তু তার চেয়ে মান থাকতে ফেরাই ভালো।

গুটি গুটি ফিরেই আসি।

'কি? ডাকলি কেন?'—গলাটা যথাসম্ভব কড়াই রাখি।

'হুঁঃ'—হারুরও একেবারে নুইলে চলে না।—'ঠর ঠর ক'রে চলেই গেলি যে বড়!'

'যাব না তো কি করব! আমার "ক্লু" যখন কিছু নয়, আমি গোয়েন্দাগিরির কিছু বুঝি না যখন, তখন কি দরকার তোমার থলি বইবার!'

হারুর আর একবার নাকী অব্যয় শব্দ,—'হুঁ! গোয়েন্দা হতে গেলে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়, বুঝেছিস্? চট্ ক'রে চটলেই হয় না। আমি তোকে পরীক্ষা করছিলাম।'

'পরীক্ষা?'

'হ্যাঁ, কতরকম পরি, পরি—'

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করি—'পরি? গোয়েন্দাগিরিতে পরি আবার কোথা থেকে এল?'

'আহা পরি নয়।' হারু বিরক্ত হয়ে বলে—'বলছিলাম কি, পরিস্থা,—না, না—কি বলে যে, বল্ না!'

'পরিস্থিতি?'—বাঙলায় আমার দখল যে বেশি তার প্রমাণ দিই।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, কতরকম পরিস্থিতি হতে পারে। চটে উঠলেই গোয়েন্দাগিরি খতম। তাই দেখছিলাম তোর মাথা কতটা ঠাণ্ডা। নইলে ওটা যে একটা মোক্ষম "ক্লু", আমি আর জানি না! দেখেই আমি বুঝেছি।'

মিটমাট অতি সহজেই তারপর হয়ে যায়। মাথা ঠাণ্ডা রাখা সম্বন্ধে আমি সাবধান হবার কড়ার করি। 'ক্লু' সম্বন্ধে আমার মতামতের মূল্য হারু স্বীকার করে।

কিন্তু তারপরই আমাদের গোয়েন্দাগিরির অগ্নিপরীক্ষা।

'রোঁদে' বেরিয়ে 'ক্লু' সংগ্রহ করাটা একটু বুঝি একঘেয়ে হয়ে আসছিল, এমন সময় মস্ত একটা কেস আমাদের হাতে এসে গেল।

আমাদের মানে অবশ্য হারুর। কেসটা সে-ই কুড়িয়ে আনল বলা চলে।

আমাদের গলির পোড়ো বাড়িটাতেই আমাদের গোয়েন্দাগিরির গোপন পরামর্শ আজকাল হয় বিকেলের টহলদারির পর।

আমার একটু গা ছমছম করে না তা নয়।

মৃদু প্রতিবাদও দু-একবার জানিয়েছি। গোয়েন্দারা তো চোর-ডাকাত নয় যে ভূতুড়ে পোড়ো বাড়িতে আড্ডা গাড়তে হবে! হারুর পড়ার ঘরেই তো আমাদের সভা করলে হয়। সেখানে কেউ বিরক্ত করবারও নেই। কিন্তু হারুর তাতে মত নেই। আমাদের পেছনেও নাকি ভয়ঙ্কর সব শত্রুদের চর রাতদিন ঘুরছে।

তাদের নজর এড়াবার জন্যেই এ-রকম গুপ্ত ঘাঁটি দরকার।

প্রকাণ্ড একটা পুরোনো জংলা বাগানের মধ্যে সেকেলে বিরাট একটি পোড়ো বাড়ি। বড়দের মুখে শুনি পাঁচভাগে পড়ে মামলা-মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না হওয়ার দরুনই নাকি বাড়ি বাগানের এই দুর্দশা। কেউ ছোঁবেও না, ছাড়বেও না।

ঘর দালান সব প্রায় ভেঙে পড়েছে। একটি কুঠুরি ওরই মধ্যে ভালো। তারই ভাঙা দরজায় খিল দিয়ে আমাদের গোয়েন্দা-সভা বসে। আমাদের যত 'ক্লু' সেই ঘরেই জমা করা।

সেদিন হারু 'ক্লু' নিয়ে এল, আমিও দেখে অবাক। পোস্টকার্ডে লেখা তিনটে চিঠি। শুধু চিঠি নয়, হারুর হাতে একটা ভাঙা আতস কাচও। তাই দিয়ে মোমবাতির আলোয় চিঠিগুলো সে দেখছে তো দেখছেই। শেষে আর ধৈর্য রইল না।

'কাচ দিয়ে অত কি দেখছিস্ তুই ? শুধু চোখেই তো সব পড়া যায় ! তোর বাবাকে লেখা চিঠি। তাঁর কে মেসোমশাই লিখেছেন !'

গম্ভীরভাবে হারু বললে—'তা তো লিখেছেন, কি লিখেছেন কিছু বুঝলি ?'

'বাঃ, তা বুঝব না কেন। প্রথম চিঠিতে এখানে একটা বাড়ি কিনতে আসবেন লিখেছেন। পরের চিঠিতে যেদিন আসবার কথা সেদিন আসতে পারলেন না জানিয়েছেন। আর তার পরের চিঠিতে আবার কবে আসবেন সেই তারিখটা জানিয়েছেন। কালই তো আসছেন দেখছি !'

'হু, আসছেন তো বটে, কিন্তু কে ?'

'কেন ? তোর বাবার মেসোমশাই, মানে তোর দাদু হন।'

হারুর মুখের চেহারা দেখে বুঝলাম, নিতান্ত বোকার মতো চিঠির মর্ম কিছুই বুঝতে পারি নি। হারু সেটা এবার বুঝিয়ে দিলে পরিষ্কার ক'রে।

চিঠিগুলোর ভেতর অমন সাংঘাতিক ব্যাপার লুকিয়ে আছে কে জানত! আতস কাচ আর হারুর বুদ্ধিতেই ধরা পড়েছে।

প্রথম দুটো চিঠি যাঁর লেখা তৃতীয়টা যে তাঁর নয়, হাতের লেখা দেখলেই নাকি তা বোঝা যায়। সুতরাং ভয়ঙ্কর একটা ষড়যন্ত্র এর ভেতর আছে!

ষড়যন্ত্রটা কি হারুও ঠিক বোঝাতে পারল না। কিন্তু ষড়যন্ত্র না থাকলে হাতের লেখা আলাদা হবে কেন ? হাতের লেখা আলাদা কিনা আমি অবশ্য বুঝতে পারি নি। কিন্তু আমি তো আর হারুর মতো হ্যাণ্ডরাইটিং এক্সপার্ট অর্থাৎ হাতের লেখা চেনার ওস্তাদ নই।

এতবড় ষড়যন্ত্রের 'ক্লু' পেয়ে চুপ ক'রে বসে থাকা যায় না। ঠিক হয়ে গেল পরের দিন আমরা হাওড়া স্টেশনে যথাসময়ে হাজির থাকব।

'কিন্তু সেখানে করব কি ?'

'সে আমি বলে দেব'খন।'

'কিন্তু দাদুর বদলে যিনি আসছেন তাঁকে চিনবি কি ক'রে?'

হারু একটু অবজ্ঞার হাসি হেসে বললে—'তাহলে আর হ্যাণ্ড-রাইটিং এক্সপার্ট কিসের? হাতের লেখা দেখলে চেহারাও বলে দেওয়া যায়। দাদুর চেহারা হলো বেঁটে, কালো, মাথায় টাক। মুখে কাঁচা-পাকা গোঁফ—'

বাধা দিয়ে বললাম—'আহা দাদুর চেহারা তো তুই জানিস্।'

'জানি মানে? এ দাদুকে দেখিই নি কখনো। আমার জন্মের পর তিনি কলকাতায় আসেন নি কখনো। কিন্তু হাতের লেখা দেখেই চেহারা বুঝতে পারছি, যেমন শেষ চিঠির হাতের লেখা দেখে বুঝছি লোকটা রোগা, একটু কুঁজো, বেশ ফিটফাট পোশাক, ফর্সা, চোখে চশমা, হাতে একটা ছড়ি।'

থ হয়ে গিয়ে বললাম—'হাতে ছড়ি কি ক'রে বুঝলি। ওটা তো আর চেহারা নয়!'

হারু গম্ভীর মুখে বললে—'আমরা ওরকম বুঝতে পারি!'

আমরা বলতে হয়তো আমাকেও বাদ দেয়নি এই আশায় চেপেই গেলাম পরের কথাটা।

পরের দিন স্টেশনে যথাসময়ে হাজির হয়ে কিন্তু রোগা, কুঁজো, ফর্সা, চোখে চশমা, হাতে ছড়ি, একটা লোককেও ট্রেন থেকে নামতে দেখলাম না।

হারুর হুকুম তবু অক্ষরে অক্ষরে না মানলে নয়। রোগা ফর্সা না হোক, চোখে চশমা হাতে ছড়ি একজনকে দেখে, পাশে যেতে যেতে চাপা গলায় বললাম—'সাবধান! আমরা সব জানি!'

হারুর এইরকমই আদেশ ছিল।

যাত্রীদের ভীড়ে কুলিদের হট্টগোলে ভদ্রলোক কথাটা বোধহয় শুনতেই পেলেন না। কুলির পেছনে হন হন ক'রে এগিয়ে গেলেন।

কিন্তু শিকার এভাবে ছেড়ে দেওয়া যায় না। কোনোরকমে ভিড়

কাটিয়ে দৌড়ে তাঁর কাছে পৌঁছে বললাম আবার—'সাবধান! আমরা সব জানি।'

'কি বললে, খোকা!'—ভদ্রলোক ফিরে দাঁড়িয়ে কটমট ক'রে তাকাতেই মনে হলো আর সেখানে থাকাটা নিরাপদ নয়। ছুটে প্লাটফর্মের অন্য প্রান্তে হারুর খোঁজে গিয়ে দেখি তার অবস্থা আমার চেয়ে কাহিল!

একজন ভদ্রলোক তার হাত ধরে আছেন, আর অনেকে তার চারিধারে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে। তারই মাঝে একটু উঁকি দিয়ে দেখি ভদ্রলোক হারুকে ধমকাচ্ছেন—'পাজি হতভাগা ছেলে! ইয়ার্কি করবার আর জায়গা পাও নি! কি করতে প্লাটফর্মে বেড়াচ্ছিলে? পকেট কাটতে না চুরি করতে?'

ভিড়ের ভেতর নানাজনের নানা মন্তব্য—'দিন না মশাই পুলিশে ধরিয়ে! কার পকেট কেটেছে? কত টাকা ছিল? পেয়েছেন মাল?'

'আরে থামুন মশাই, থামুন!'—ভদ্রলোক ভিড়ের লোকদেরও ধমকালেন—'এ পকেট কাটার কেস নয়, তারচেয়ে ঘোরালো।'

'কি হয়েছে কি?'—অনেকের সাগ্রহ প্রশ্ন।

'আরে মশাই স্যুটকেশটা নিয়ে এগোচ্ছি, এমন সময়ে শুনি পাশে কে বলছে,—সাবধান আমরা সব জানি। ফিরে চেয়ে দেখি এই মূর্তিমান!'

সবাই হেসে উঠল। ভদ্রলোক আবার হারুকে নিয়ে পড়লেন। 'বল, কি করছিলে প্লাটফর্মে! কি মানে ও কথার?'

হারু একেবারে চুপ! চেহারটা সে ঠিকই চিনে বার করেছিল। হাতে ছড়ি না থাক, ভদ্রলোক রোগা লম্বা ফর্সাই বটে, চোখে চশমা পর্যন্ত আছে। কিন্তু ধরতে গিয়ে ধরা পড়েই যা ফ্যাসাদ বেধেছে।

চুপ ক'রে থাকলেও ভদ্রলোক ছাড়বার পাত্র নন। আবার তিনি ধমকে উঠলেন—'বল, কি তোমার নাম। মিথ্যে বললে পুলিশে দেব।'

হারু ভয়ে ভয়ে এবার নাম বললে। কিন্তু তাতেও নিস্তার নেই।

'বাবার নাম কি? কোথায় থাকো?'

হারুর উত্তর শুনে ভদ্রলোক যেন চমকে উঠলেন।—'কি বললে? তুমি সলিল চাটুজ্যের ছেলে? সাত নম্বর বেচু পরামাণিকের গলিতে থাকো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ'—হারু এবার কাঁদোকাঁদো। কিন্তু ভদ্রলোকের হাসি আর থামে না যেন।

'হতভাগা আহম্মক ছেলে! তোমার এই সব বিদ্যে হয়েছে! চল বাড়িতে গিয়ে তোমার সব কীর্তির কথা বলছি!'

ভিড়ের সকলের সঙ্গে আমাকেও থ করে দিয়ে ভদ্রলোক হারুর হাত ধরে হাসতে হাসতে স্টেশনের বাইরে চলে গেলেন।

পেছু পেছু গিয়ে দেখলাম হারু তাঁর সঙ্গেই ট্যাক্সিতে উঠছে।

লজ্জা পাবে বলে ক-দিন আর হারুর সঙ্গে দেখা করি নি।

দিন তিনেক বাদে সে-ই অমন বেহায়ার মতো আমায় খুঁজতে আসবে কে জানত! হাতে আবার একটা এয়ার গান।

'কি রে? ক-দিন যাস্‌নি কেন? আজ শিকারে যাব চল্।'

হারুর নির্বিকার ভাব দেখে, না শিকারে যাবার কথায়, অবাক হলাম বলতে পারি না। শুধু বললাম, 'শিকারে?'

'হ্যাঁ, এয়ার গান দেখছিস্ না। দাদু কিনে দিয়েছে।'

'দাদু! দাদু কে?'

'আহা, যে দাদুকে সেদিন স্টেশনে ধরলাম, হাঁদারাম কোথাকার! চেহারাটা কি রকম ঠিক আঁচ করেছিলাম দেখেছিস্। তবে গোয়েন্দাগিরি আর করব না ভাবছি। এখন থেকে শিকার!'

হারুর স্মৃতিশক্তির দৌড়, তার বরাতের জোর, আর তার গোয়েন্দাগিরি ছাড়ার সংকল্প, সব কিছুতে মিলে আমায় একেবারে ভ্যাবাচাকা লাগিয়ে দিলে।

আমি হতভম্ব হয়ে শুধু তার দিকে চেয়ে রইলাম।

আকাশের আতঙ্ক



আজকালকার খবরের কাগজের দিনে আমরা নিত্যনূতন বিস্ময়কর খবর শুনতে শুনতে কিরকম মিথ্যা উত্তেজনার মধ্যে যে বাস করি—একদিন যে খবর আমাদের অবাক ক'রে দেয়, পরের দিন আরো বিস্ময়কর ঘটনায় সে-খবর কেমন অনায়াসে আমাদের মনে চাপা পড়ে যায়, তার প্রমাণের অভাব নেই।

বেশিদূরে যেতে হবে না। ১৯—সালের বৈশাখ মাসের কথা। খবরের কাগজগুলো একদিন স্যার চিরঞ্জীব রায়ের অবিশ্বাস্য ভয়ঙ্কর খুনের মামলা নিয়ে তুমুল হৈ চৈ বাধিয়ে তুলেছিল। হপ্তাখানেক ধরে খবরের কাগজে আর অন্য কথাই বুঝি ছিল না। সোজা কথা তো নয়। স্বয়ং স্যার চিরঞ্জীবের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ। স্যার চিরঞ্জীব ইদানীং একটু যেন কেমন অবশ্য হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে মস্তিষ্ক-বিকৃতির একটা গুজব চারিধারে শোনা যেতে আরম্ভ করেছিল; কিন্তু তা বলে এতটা কেউ কি কল্পনাও করতে পারে!

তাঁর পূর্বকীর্তির কথা তখনো তো লোকে ভোলে নি। স্যার উপাধির দ্বারা তো তাঁর পরিচয় নয়, তাঁর পরিচয় বাংলার বরপুত্র ও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ একজন বৈজ্ঞানিক হিসেবে। পৃথিবীর শৈশবাবস্থার সরীসৃপ-জাতীয় প্রাণীর কঙ্কালের খোঁজে মধ্য-এশিয়ায় তিনি যে বৈজ্ঞানিক অভিযানের নেতৃত্ব করেন, সে-অভিযানের অসামান্য সার্থকতায় সমস্ত পৃথিবীর কাছে বাংলার মুখ উজ্জ্বল হয়েছিল। বাংলা থেকে এরকম অভিযান যে হতে পারে, তা কেউ আগে ভাবতে পারে নি। তাঁর দ্বিতীয় অভিযান প্রাণিতত্ত্ববিষয়ক গবেষণার জন্যে নিউগিনির অনাবিষ্কৃত প্রদেশে। সে-অভিযানের ফলে প্রাণিবিদ্যা আশাতীত-ভাবে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল বটে, কিন্তু তারপর থেকেই তাঁর মস্তিষ্ক-বিকৃতির লক্ষণ বুঝি দেখা দেয়। তাঁর অদ্ভুত সব নতুন মতামত শুনে বৈজ্ঞানিক-সমাজ তাঁর মাথা ঠিক আছে কিনা, সন্দেহ প্রকাশ করে। স্যার চিরঞ্জীব চিরদিন অত্যন্ত অহঙ্কারী প্রকৃতির। খ্যাতির শিখরে যতদিন তিনি আরূঢ় ছিলেন, ততদিন তাঁর প্রতিভার খাতিরে এ-অহঙ্কার সকলে নিঃশব্দে সহ্য করেছে, কিন্তু তাঁর মানসিক দুর্বলতার পরিচয় যেদিন তাঁর অদ্ভুত কথাবার্তা ও মতামতের মধ্যে পাওয়া যেতে লাগল, সেদিন কেউ কেউ যে আগেকার আক্রোশের শোধ নিতে ছাড়লে না, একথা বলাই বাহুল্য। কাগজে তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে ব্যঙ্গ ক'রে অনেক প্রবন্ধও বেরুল। প্রাচীন যুগের বিলুপ্ত এক ডাইনোসরের পিঠে চড়ে স্যার চিরঞ্জীব শহরের পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, এই ব্যঙ্গ-চিত্রটি তখনকার দিনে বিশেষ হাসির খোরাক জুগিয়েছিল। ব্যঙ্গচিত্রটি অকারণে আঁকা হয় নি। বুদ্ধি-ভ্রংশের সঙ্গে সঙ্গে স্যার চিরঞ্জীবের অদ্ভুত এক ধারণা হয়েছিল যে, মেসোজোইক যুগের সরীসৃপের কঙ্কাল বলে বৈজ্ঞানিকেরা যেগুলি লক্ষাধিক বছরের পুরোনো মনে করেন, সেগুলি নাকি অত পুরোনো মোটেই নয়। তিনি নাকি এমন সব ডাইনোসরের হাড় পেয়েছেন, যেগুলিকে আধুনিককালের বলে নিশ্চিত বোঝা যায়। তা ছাড়া তাঁর মতে সরীসৃপ-বংশ নাকি এখনো একেবারে লুপ্ত হয় নি।

নানাদিক থেকে আঘাত খেয়ে আহত-অভিমানের জন্যেই কিনা বলা যায় না, স্যার চিরঞ্জীব শেষাশেষি একেবারে নিঃসঙ্গই থাকতে আরম্ভ করেছিলেন। শহরের সীমা ছাড়িয়ে তাঁর নির্জন বিশাল বাড়ির পরীক্ষাগারের বাইরে তাঁর আর দেখাই পাওয়া যেত না। নিজেকে যেন তিনি সেখানে জীয়ন্ত কবর দিয়েছিলেন। মাঝে মাঝে কোনো কাগজ মজা করবার জন্যে বা অনুগ্রহ ক'রে তাঁর যে দু-একটা লেখা ছাপত, তাতেই তাঁর অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যেত। সে-সমস্ত লেখার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের সঙ্গে যে মানসিক বিকৃতির লক্ষণ দেখা যেত, তাতে শত্রুপক্ষ হাসলেও অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক-সমাজ এত বড় মনীষীর এমন পতনে বেদনাই অনুভব করতেন। কিন্তু ঘরে বসে আজগুবি সব ধারণা নিয়ে প্রবন্ধ লেখা এক কথা, আর মানুষ-খুনের দায়ে আসামী হওয়া আরেক কথা। একথা কেউ কল্পনাও করতে পারে নি।

সে-ঘটনার কথা মনে করলেও গা শিউরে ওঠে। শুধু সাধারণ হত্যা সে তো নয়, তার ভেতর যে উন্মত্ত পৈশাচিকতার পরিচয় ছিল, তাতেই সকলে বেশি স্তম্ভিত হয়ে গেছিল। স্যার চিরঞ্জীবের নির্জন বাগান-বাড়িতে হঠাৎ একদিন তাঁর একটি ভৃত্যকে নিহত অবস্থায় পাওয়া যায়। সাধারণভাবে সে খুন হয় নি। বদ্ধ উন্মাদ ছাড়া অমন নৃশংসভাবে নরহত্যা কেউ করতে পারে না। চাকরটির দু'টি চোখ ওপড়ান এবং তার সর্বাঙ্গের আঘাত দেখে মনে হয়, ধারাল অস্ত্র দিয়ে কেউ যেন তার সারাগায়ের মাংস উন্মত্তভাবে ক্ষত-বিক্ষত ক'রে দিয়েছে।

স্যার চিরঞ্জীবের বিরুদ্ধে এ-সম্পর্কে সবচেয়ে সন্দেহের কারণ এই যে, তাঁকে যখন ধরা হয়, তখন তিনি দমদম থেকে একটা এরোপ্লেন ভাড়া ক'রে পালাবার চেষ্টা করছেন। পুলিশ খুব তৎপরতার সঙ্গে কাজ না করলে তাঁকে ধরতেই পারতো না। এরোপ্লেনে তিনি উঠে বসে চালাবার উদ্যোগ করছেন, এমন সময় পুলিশ দ্রুতগামী মোটরে গিয়ে তাঁকে ধরে। পুলিশের আদেশেও প্রথমে তিনি নামতে রাজী

না হয়ে তাদের সামনেই প্রপেলার চালিয়ে দিয়ে উড়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। বাধ্য হয়ে পুলিশ-অফিসার তখন গুলি ক'রে তাঁর প্রপেলার ভেঙে দিয়ে তাঁকে থামায়। এরোপ্লেনে তাঁর সঙ্গে একটি বন্দুকও পাওয়া গেছিল।

এরোপ্লেন থেকে নামবার পরও তাঁর রোক কমে নি। পুলিশের লোককে যা নয় তা বলে গাল দিয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার জন্যে জেদ করেন; কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করলে কিছুই তিনি বলতে চান না। তাঁর চাকরের হত্যা-সম্বন্ধেও তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রে কোনো উত্তর পাওয়া যায় নি। মস্তিষ্ক-বিকৃতির পর তাঁর অহঙ্কারী প্রকৃতি যেন আরো উগ্র হয়ে উঠেছিল। পুলিশের প্রশ্নের উত্তরে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন যে, তাঁকে যখন অকারণে ধরে অপমান করা হয়েছে, তখন তাদের কোনো কথার আর তিনি জবাব দেবেন না।

এই বিখ্যাত নরহত্যার মামলা আদালতে ওঠার পর কয়েকদিন পর্যন্ত খবরের কাগজগুলির উত্তেজনার আর অবধি ছিল না। মানুষের মুখে-মুখেও এই উন্মাদ বৈজ্ঞানিক সম্বন্ধে নানান অতিরঞ্জিত আজগুবি খবর তখন ফিরেছে!

তারপর এই রোমাঞ্চকর হত্যার খবর কোথায় যে গেল তলিয়ে, কেউ তার সন্ধানও রাখলে না। দার্জিলিঙের বিমান-ডাকের ভয়ঙ্কর রহস্য তখন মানুষের মন ও সংবাদপত্রের পাতা জুড়ে বসেছে। তখন সবে কলকাতা থেকে দার্জিলিঙ পর্যন্ত এরোপ্লেনে ডাক পাঠাবার ব্যবস্থা হয়েছে। সেই ডাকবাহী বিমানপোত আশ্চর্যভাবে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল একদিন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর ঘন টেরাই-এর জঙ্গলে ভাঙা এরোপ্লেনটির সন্ধান যদি বা মিলল, তার চালকের কোনো পাত্তা নেই। কেমন ক'রে যে এরোপ্লেনটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো, তারও কোনো সন্তোষজনক মীমাংসা হলো না।

শুধু এই ব্যাপারেই শেষ হলে হয়তো সাধারণের আতঙ্ক এত বেশি হতো না; কিন্তু এ-ব্যাপারের রহস্য আরো গভীর হয়ে উঠল পরের

ঘটনায়। একজন ইংরেজ বিমানবীর জলপাইগুড়ি থেকে এরোপ্লেনে কলকাতা আসছিলেন তার পরের দিন ভোরের বেলা ; কিন্তু যাত্রা করবার খানিক বাদেই তাঁর এরোপ্লেনটিও অদ্ভুতভাবে ভেঙে পড়ে তিস্তানদীর ওপর। তিস্তার অনেক জেলে নৌকো থেকে তাঁর পড়ার দৃশ্য দেখেছিল। তাদের জিজ্ঞাসা ক'রে জানা যায় যে, ভোরের আগে আব্‌ছা অন্ধকারে তারা চোখে ভালো না দেখতে পেলেও এরোপ্লেনের আওয়াজ বেশ স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিল। হঠাৎ উর্ধ্ব-আকাশ থেকে কিরকম বেয়াড়াভাবে এরোপ্লেনটি মাতালের মতো পাক খেতে খেতে নামতে থাকে। নিচে নেমেও এরোপ্লেনটি আর একবার ওপরে গোঁত্তা খাওয়া ঘুড়ির মতো উঠেছিল ; কিন্তু বেশিদূর নয়। তারপর সশব্দে তিস্তার জলে সেটি ভীষণ বেগে এসে পড়ে। এবারে এরোপ্লেনের ভেতর ইংরেজ-চালকের মৃতদেহ পাওয়া যায়, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তাঁর সমস্ত মুখ ক্ষত-বিক্ষত এবং একটি চোখ খোবলান।

এই ভয়ঙ্কর খবর বাসি হতে না হতেই পরের দিন সংবাদ পাওয়া যায় যে, দার্জিলিঙ্‌ থেকে সন্ধ্যায় ফেরার সময় আর একটি ডাকবাহী বিমানপোত টেরাই-জঙ্গলের ওপর পুবদিকের আকাশ-প্রান্তে দু'টি অদ্ভুত-আকারের বিমানপোত দেখেছে। ভালো ক'রে লক্ষ্য করবার আগেই সেগুলি সন্ধ্যার অন্ধকারে অস্পষ্ট হয়ে যায়।

এই রহস্যময় দু'টি অজানা বিমানপোতের খবরে দেশের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত সাড়া পড়ে গেল। ভালো ক'রে খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে, আই. এন. এ. অর্থাৎ 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল এয়ারওয়েজে'র জানিত কোনো এরোপ্লেন সেদিন ওদিকে যায় নি। তা ছাড়া বিমান-ডাকের চালক যেরকম বর্ণনা দিয়েছিল, সে-ধরনের বিমানপোত ভারতের কোথাও নেই।

নতুন এই আতঙ্কের হুজুগে চিরঞ্জীব রায়ের মামলা কোথায় চাপা পড়ে গেল, কে জানে। খবরের কাগজের কোণে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লোকের বোধহয় আর চোখেও পড়ে না।

প্রত্যেকে আমরা তখন খবরের কাগজ খুলেই এরোপ্লেন রহস্যের সংবাদ রুদ্ধনিঃশ্বাসে পড়তে আরম্ভ করি; প্রতিদিন উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকি এ-রহস্যের ওপর নতুন কোনো আলোকসম্পাত হলো কিনা তা জানবার আশায়।

হাজার রকমের গুজব ও আলোচনা চারিধারে চলতে থাকে। এই অদ্ভুত অজানা বিমানপোত দু'টি কাদের? যে দু'টি এরোপ্লেন আশ্চর্যভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে তাদের ভেঙে পড়ার সঙ্গে এদের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা? আপাতত কোনো দেশের সঙ্গে যখন আমাদের কিংবা কারুর যুদ্ধ বা বিরোধ নেই, তখন এমনভাবে কারা নিরীহ আকাশ-পথের যাত্রীদের আক্রমণ করছে? তাদের উদ্দেশ্যই বা কি? এ-সমস্ত প্রশ্নের উত্তরই কেউ দিতে পারলে না। শুধু চারিধারে আতঙ্কই বেড়ে যেতে লাগল।

আই. এন. এ. বাধ্য হয়ে বাংলার উত্তরাঞ্চলে রাত্রে এরোপ্লেন চালানো নিষেধ ক'রে দিলে, কারণ দেখা গেল যে, বেশির ভাগ দুর্ঘটনা রাত্রে ওই অঞ্চলেই ঘটছে। ডাকবাহী বিমানপোত ও ইংরেজ-চালকের এরোপ্লেনের পর আরো তিনটি এরোপ্লেন ওই অঞ্চলে রাত্রে ভেঙে পড়ে। অধিকাংশ আরোহীর পাত্তা পাওয়া যায় নি। পাওয়া গেলেও দেখা গেছিল, তাদের দেহ ছিন্নভিন্ন।

শুধু আকাশ-পাথের এরোপ্লেনই নয়, সাধারণ লোকও আক্রান্ত হয় কেউ কেউ। রংপুরের একটি গ্রামের রাস্তায় একদিন সকালে একজন চাষীর ক্ষত-বিক্ষত দেহ দেখতে পাওয়া যায়। সে তার হারানো বলদের খোঁজে রাত্রে বাইরে বেরিয়েছিল। অনেকে অবশ্য এ-ব্যাপারটির সঙ্গে রহস্যময় এরোপ্লেন দু'টির কোনো সংশ্রব আছে, তা স্বীকার করতে চান না; কিন্তু সেই গ্রামের একজন বৃদ্ধ বলে যে, সেদিন রাত্রে আকাশে অদ্ভুত একরকম আওয়াজ সে শুনেছিল।

সত্যি-মিথ্যা নানারকম খবর এইবার রটতে থাকে। হুজুগের দিনে খবরের কাগজগুলি বাচবিচার না ক'রে তার সবগুলিকেই প্রায় স্থান দেয় নিজের পাতায়। আমাদের কাগজের মফঃস্বল-বার্তাগুলি

একেই যত গাঁজাখুরী সংবাদের ডিপো। মফঃস্বলের প্রতিনিধিরা সুযোগ পেয়ে যা খুশি আষাঢ়ে-গল্প সেখানে চালাতে লাগল। কোথায় জলপাইগুড়ি অঞ্চলের এক গাঁয়ে এক বুড়ির একটা বাছুর হারিয়েছে। মফঃস্বল-বার্তায় তার খবরের সঙ্গেও বেরোল যে, সে-বুড়ি নাকি দেখেছে, আকাশ থেকে প্রকাণ্ড একটা কি জিনিস নেমে তার বাছুরকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেছে।

বন্ধু অশোক রায়ের বৈঠকখানায় বসে খবরের কাগজ পড়ছিলাম সেদিন সকালবেলা। এই খবরটা হঠাৎ চোখে পড়ায় হেসে উঠে অশোককে বললাম—'খবরটা দেখেছো? এরপর কোনদিন শুনব, আকাশ থেকে কি একটা নেমে কার হেঁসেল থেকে মাছ-ভাজা চুরি ক'রে নিয়ে গেছে। আমাদের দেশে একটা কিছু হুজুগ হলেই হলো।'

অশোক রায় কাগজটা আমার হাত থেকে টেনে নিয়ে খবরটার ওপর চোখ বুলিয়ে কিন্তু গম্ভীর মুখেই বললে—'হুঁ, আমি আশ্চর্য হচ্ছি শুধু আই. এন. এ. বা আর কেউ এ-সম্বন্ধে কিছু এখনো করছে না দেখে।'

ঠাট্টা করেই বললাম—'বেশ তো, তোমার তো নিজেরই প্লেন রয়েছে। তুমিই এ-আজগুবি এরোপ্লেনের রহস্য ভেদ করবার জন্যে লাগো না?'

ঠাট্টা ক'রে যে কথা বলেছিলাম, অশোক অত্যন্ত গম্ভীর মুখে তার যা উত্তর দিলে, তা শুনে প্রথমটা স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

অশোক বললে—'লাগবোই তো ঠিক করেছি।'

খানিকক্ষণ আমার মুখ দিয়ে সত্যিই কথা বেরুল না। তারপর অস্ফুটস্বরে বললাম—'তুমি পরিহাস করছ নিশ্চয়ই?'

'না, পরিহাস নয়, সত্যিই আমি যাবো ঠিক করেছি এবং আজই।'

আমি এবার ব্যাকুলস্বরে বললাম—'কিন্তু তুমি সমস্ত ব্যাপারটা ভেবে দেখেছ? এ পর্যন্ত কতজন বৈমানিক মারা গেছে জানো? তাদের মধ্যে ওস্তাদ সমস্ত বিমানবীরও ছিল। তুমি তো সবে সেদিন

'বি' সার্টিফিকেট পেয়েছ। তা ছাড়া তোমার প্লেনও ডাকের উড়ো-জাহাজগুলির তুলনায় অনেক খারাপ।'

অশোক বললে—'বিপদ আছে জেনেই তো যাচ্ছি।'

আমি আর একবার তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম—'বিপদ যে কতখানি, তা কিন্তু তুমি বোধহয় বুঝতে পারছ না। এই রহস্যময় এরোপ্লেনগুলি যারা চালাচ্ছে, তারা যেমন পৈশাচিকভাবে নিষ্ঠুর, তেমনি ধূর্ত ও শক্তিমান। আই. এন. এ. কিছু করছে না, এমন তো নয়; তারা দল বেঁধেও কিছু করতে পারছে না এদের বিরুদ্ধে। তারা যেখানে অক্ষম, তুমি সেখানে একলা কি করতে পার!'

অশোককে কিন্তু নিরস্ত করা গেল না, সে শুধু অদ্ভুত একটা উত্তর দিলে—'হয়তো আই. এন. এ-র চেয়ে আমি এ-ব্যাপারের মর্ম বেশি বুঝি। অন্তত কোথায় তাদের দেখা পাব, তা আমি জানি।'

তার কাছ থেকে আর কোনো কথা না বের করতে পেরে অবশেষে আমি হতাশ হয়ে বললাম—'নেহাৎই যখন যাবে, তখন আমি তোমার সঙ্গ ছাড়ছিনে।'

অশোক খানিকক্ষণ আমার দিকে নীরবে চেয়ে থেকে বললে—'এ প্রস্তাব আমি তোমার কাছ থেকে আশা করছিলাম।'

সেইদিন দুপুরেই অশোকের প্লেনে আমরা কলকাতা থেকে রওনা হলাম। অশোকের প্লেনটি খুব দামী নয়, কিন্তু বেশ মজবুত। টেনে টুনে তাকে ঘণ্টায় ১৭৫ মাইলও চালানো যায়। সামনে অশোকের ও পেছনে আমার সীট। অশোকের অনুরোধে একটি রাইফেল ও একটি রিভলভার নিয়ে আমায় উঠতে হয়েছে। এ ছাড়া আরেকটি জিনিস সে যে কেন সঙ্গে আনতে বলেছিল, কিছুই বুঝতে পারি নি। সেটি একটি লোহার শিরস্ত্রাণ, মধ্যযুগের ধরনে তৈরি। আই. এন. এ. রাত্রে এরোপ্লেন চালানো নিষিদ্ধ ক'রে দিয়েছে, সেইজন্যে আমরা ঠিক করেছিলাম—প্রথমে গন্তব্যস্থানে দিনের বেলা পৌঁছে গোপনে রাত্রে কাজ আরম্ভ করব। গন্তব্যস্থান অবশ্য আমার জানা ছিল না। উত্তরদিকে যাত্রা ক'রে ঘণ্টাকয়েক বাদে জলপাইগুড়ি জেলার

নাগরকোটায় পৌঁছে আমি অবাক হয়ে গেলাম। এত জায়গা থাকতে এই শহরটিকে অশোকের বেছে নেওয়ার কারণ তখনো আমি বুঝতে পারি নি।

কিন্তু নাগরকোটার প্রধান অসুবিধা হলো এরোপ্লেন নামবার জায়গা নিয়ে। দিনের বেলা নগরের বাইরে যে ফুটবলের মাঠে আমরা নেমেছিলাম, রাত্রে অন্ধকারে তাতে অবতরণ করা অসম্ভব। অনেক খোঁজাখুঁজির পর দূরের একটি গাঁয়ের ধারে প্রকাণ্ড একটা বাঁজা মাঠ পাওয়া গেল, কিন্তু জোরালো আলোর বন্দোবস্ত করতে না পারার দরুণ প্রথম রাত্রে আমাদের কিছু করা হলো না। দ্বিতীয় রাত্রে যথাসম্ভব জোরালো দু'টি পেট্রলের আলো মাঠের দু'ধারে চিহ্ন-হিসেবে রেখে মাঝরাতে আমরা আকাশে উঠলাম।

সেই ভয়ঙ্কর রাত্রির কথা কোনোদিন বোধহয় ভুলতে পারব না। উত্তেজনার ঝোঁকে এতদূর এগিয়ে এলেও সেই সময়ে মনে যে একটু দ্বিধা না হয়েছিল, এমন নয়। যে রহস্যময় শত্রুর বিরুদ্ধে আমরা অভিযান করছি, তাদের নৃশংসতার ও শক্তির পরিমাণ আমাদের অজানা নয়। নিজেদের সামান্য শক্তি নিয়ে আমরা তাদের বিরুদ্ধে কি করতে পারব! মনে হচ্ছিল, এ শুধু গোঁয়ার্তুমি ক'রে মৃত্যুকে ডেকে আনা ছাড়া আর কিছু নয়; কিন্তু তখন আর পেছুবার সময় নেই।

জয়স্টিক টেনে সঙ্গে সঙ্গে গর্জন ক'রে এরোপ্লেন তখন মাটি ছাড়িয়ে উঠেছে। একটিমাত্র ক্ষীণ আশা তখনো মনের মধ্যে আছে—হয়তো সত্যিই আমরা কোনো কিছুর দেখা নাও পেতে পারি, কিন্তু সে আশাও সফল হওয়ার নয়।

দেখতে দেখতে এরোপ্লেন কয়েকবার পাক খেয়ে অনেক ঊর্ধ্বে উঠে পড়ল। নাগরকোটা শহরের ক্ষীণ আলো দূরে থাকায় আমাদের নামবার মাঠের চড়া আলোও তখন প্রায় অস্পষ্ট হয়ে গেছে। যা-কিছু আলো আমাদের মাথার ওপর। সেখানে তারায়-ভরা আকাশ ঝলমল করছে। শুক্লপক্ষের দশমী না একাদশী তিথির ভাঙা চাঁদের সামান্য

একটু লাল্‌চে রেখা পশ্চিমের দিগন্তে দেখা যাচ্ছিল। মাটির ওপর থেকে সে-চাঁদ অনেক আগেই অদৃশ্য হয়ে গেছে। আমরা অনেক উঁচুতে উঠেছিলাম বলে এখনো তাকে দেখতে পাচ্ছিলাম। সে-রেখাও খানিক বাদে মুছে গেল। তারাগুলির আলো ছাড়া আর কোথাও কিছু নেই। নিচে সমস্ত পৃথিবীর ওপর গাঢ় কালির ছোপ। সে-ছোপ কোথাও কোথাও বেশি গাঢ়, কোথাও বা একটু ফিকে। সেই সামান্য একটু রঙের তারতম্য থেকেই আমরা মাঠ, গ্রাম ও জঙ্গলকে যথাসম্ভব আলাদা ক'রে ধরতে পারছিলাম।

শহরের ওপর কয়েকবার চক্কর দিয়ে অশোক উত্তরের জঙ্গলের ওপর প্লেন চালিয়ে এনেছিল। আমাদের গতি তখন খুব বেশি নয়; ঘণ্টায় আন্দাজ আশী মাইল বেগে মাটি থেকে হাজার তিনেক ফিট ওপরে আমরা বিশাল বৃত্তাকারে জঙ্গলের ওপর পাক খাচ্ছিলাম। গ্রীষ্মকালে উপযুক্ত বৈমানিকের পোশাক থাকা সত্ত্বেও ঝড়ের মতো যে হাওয়া আমাদের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল, তাতে শীত করছিল। মোটরের গর্জন ছাড়া আর কিছু শব্দ নেই; তারা-খচিত অন্ধকার ছাড়া আর কিছু দেখবার নেই।

খানিকক্ষণ বাদে এই একঘেয়েমিতে যেন বিরক্তি ধরে গেল। মোটরের আওয়াজের ভেতর কথা কইবার সুবিধের জন্যে অশোকের ও আমার বসবার জায়গার মধ্যে চোঙ্‌-লাগানো রবারের নল আমরা লাগিয়ে নিয়েছিলাম। সেই চোঙের ভেতর দিয়ে বললাম—'এরকমভাবে কতক্ষণ ঘুরব! এতে লাভই বা কি?'

অশোক চোঙের ভেতর দিয়ে উত্তর দিলে—'অত অধীর হয়ো না। রাত্রে ওড়ার একটা আনন্দও তো আছে!'

আমার কিন্তু এটাকে ঠিক আনন্দ বলে মনে হচ্ছিল না। যাই হোক, এ নিয়ে তর্ক করা বৃথা বলে চুপ ক'রে গেলাম। তারপর কতক্ষণ যে আমরা সেই একভাবে চক্কর দিয়েছিলাম, তা বলতে পারি না। পুবের আকাশ যখন একটু ফিকে হয়ে আসছে প্রভাতের সূচনায়, তখন আমার খেয়াল হলো। আবার চোঙের ভেতর দিয়ে

বললাম—'সকাল তো হতে চলল। আর কতক্ষণ ঘুরবে এমন ক'রে ?'

চাপা উত্তেজিতকণ্ঠে জবাব এল—'শিগ্‌গির তোমার শিরস্ত্রাণ পরে ফেলে প্রস্তুত হয়ে ব'স।'

সত্যি-সত্যিই সেই কথায় ভয়ের একটা ঠাণ্ডা স্রোত যেন সমস্ত শরীরের ভেতর দিয়ে বয়ে শিউরে দিয়ে গেল।

কম্পিতস্বরে বললাম—'দেখতে পেয়েছ ?'

'হ্যাঁ, আমাদের দক্ষিণে চেয়ে দেখ। আমি এরোপ্লেনের বেগ বাড়িয়ে আরো ওপরে উঠছি। সেখান থেকে ওদের ওপর ছোঁ মেরে পড়তে চাই—অবশ্য যদি ওদের বেগ আমাদের চেয়ে বেশি না হয়।'

এরোপ্লেন হঠাৎ কার্নিক খেয়ে ওপরদিকে নাক তুলে প্রচণ্ডবেগে ঊর্ধ্বে উঠতে লাগল ; সেই মুহূর্তে আমিও দেখতে পেলাম। অন্ধকার তখনো বেশ গাঢ়, কিন্তু তারই ভেতর দু'টি বিশাল আবছায়া অদ্ভুত মূর্তি বেশ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল।

কিন্তু এগুলি কি ধরনের এরোপ্লেন ! আমি এরকম এরোপ্লেনের কথা কখন তো শুনি নি। সামনে তার কোনো প্রপেলার আছে কি না, বোঝা যাচ্ছিল না, কিন্তু অনেকটা বাদুড়ের ধরনে তাদের দু'ধারে ডানা যে ওঠা-নামা করছিল, এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এ-পদ্ধতিতে কোনো এরোপ্লেন যে নির্মিত হতে পারে, তা আমার জানা ছিল না।

এরোপ্লেন-দু'টির আকৃতিও অদ্ভুত। অস্পষ্টভাবে যেটুকু দেখতে পাচ্ছিলাম, তাতে মনে হলো, কোনো সাধারণ প্লেনের সঙ্গে তাদের কোনো মিল নেই।

তাদের বেগ বেশি হোক বা না হোক, আশ্চর্য তাদের ঘোরা-ফেরার কৌশল। সাধারণ এরোপ্লেনকে অনেকখানি জায়গা জুড়ে মোড় ফিরতে হয়, কিন্তু এরা যেন যে-কোনো জায়গা থেকে যেদিকে খুশি হঠাৎ বাঁক নিতে পারে। সামনে যেতে যেতে হঠাৎ ডিগ্‌বাজি খেয়ে সোজা পেছনদিকে যাওয়াও এদের পক্ষে অত্যন্ত সহজ।

সবেগে এরোপ্লেন চালিয়েও এই কৌশলের জন্যেই কিছুতেই আমরা তাদের বিরুদ্ধে সুবিধা করতে পারছিলাম না। ওপর থেকে তাদের কাছ দিয়ে চিলের মতো ছোঁ মেরে নামবার আগেই তারা অদ্ভুত কৌশলে আমাদের কাছ থেকে সরে যাচ্ছিল। গুলি করবার মতো নাগালের মধ্যে তাদের কিছুতেই পাচ্ছিলাম না।

প্রথমে ভেবেছিলাম, তারাও বুঝি দূর থেকে আমাদের লক্ষ্য ক'রে গুলি চালাতে পারে ; কিন্তু সেরকম কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। তারা যেন শুধু কোনোরকমে আমাদের প্লেনের ল্যাজের দিকটা আক্রমণ করবার ফিকির খুঁজছে মনে হলো।

বন্দুক বা কোনো অস্ত্র কেন যে তারা ব্যবহার করে নি, তা অবিলম্বেই বুঝলাম এবং সেইসঙ্গে সত্যিই আতঙ্কে ওই ঝোড়ো হাওয়ার ভেতরেও আমি এতক্ষণে ঘেমে উঠলাম।

পুবের আকাশ ফিকে হতে হতে তখন বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। আকাশের তারা ম্লান আর নিচের মাঠ, গ্রাম, জঙ্গল স্পষ্ট হয়ে আসছে। এমন সময় আমাদের প্লেন তাদের শ'দুয়েক গজের মধ্য দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। স্তম্ভিত হয়ে দেখলাম—যাদের আমরা এরোপ্লেন ভেবেছিলাম, প্রকৃতপক্ষে তারা মানুষের তৈরি কোনো-প্রকার যন্ত্র নয়, কল্পনাতীত একরকম প্রাণী—অতিবড় দুঃস্বপ্নেও যাদের রূপ ভাবা যায় না। আবছা অন্ধকারে তাদের অতিকায় বাদুড়ের মতো দেহ ও হিংস্র দাঁতাল মুখের যে আভাস আমি পেয়েছিলাম, তার সঙ্গে অতীত বা বর্তমানের কোনো প্রাণীরই মিল নেই।

নিজের চোখকে প্রথমটা বিশ্বাস করা শক্ত হলেও খানিকক্ষণের মধ্যেই বুঝলাম, ভুল আমার হয় নি। যতই অবিশ্বাস্য হোক সত্যিই অদ্ভুত ভয়ঙ্কর দু'টি প্রাণীর সঙ্গেই আমাদের আকাশ-যুদ্ধে নামতে হয়েছে।

অশোক নলের ভেতর দিয়ে উত্তেজিত স্বরে বললে—'কার সঙ্গে লড়তে হবে, এবার বুঝতে পেরেছ ?'

আমি বিস্মিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম—'তুমি কি আগে থেকেই জানতে ?'

উত্তর এল—'না, ঠিক জানতাম না বটে, কিন্তু একটু আঁচ করেছিলাম।'

আর আমাদের কোনো কথা হলো না। কথা কইবার আর সময়ও ছিল না। অন্ধকার কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শত্রুদের চেহারা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। পরস্পরকে বাগে পাওয়ার জন্যে তখন আকাশে তাদের সঙ্গে আমাদের প্লেনের অদ্ভুত প্রতিযোগিতা চলছে; কিন্তু প্রতিযোগিতায় আমরাই যেন ক্রমশ বেকায়দায় পড়ছিলাম, মনে হচ্ছিল।

আমাদের এরোপ্লেনের গতি হয়তো তাদের চেয়ে বেশি, কিন্তু তাদের ওড়বার কৌশল আমাদের চেয়ে ভালো। আমি এর মধ্যে কয়েকবার দূর থেকে বন্দুক চালিয়েছি, কিন্তু তাতে কিছু সুবিধে হয় নি। পাখার নানারকম কায়দায় উল্টেপাল্টে তারা শুধু আমাদের এড়িয়েই যাচ্ছিল না, ছুটোতে আমাদের দু'পাশে সরে গিয়ে আমাদের পেছনদিকে আক্রমণ করবার সুযোগ ক'রে নিচ্ছিল।

কিন্তু আক্রমণের কৌশল যে তাদের অমন হবে, আক্রান্ত হওয়ার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত আমরা তা ভাবতে পারি নি। খানিক আগেই একবার সুবিধে পেয়ে আমি তাদের একটির পাতলা চামড়ার ডানা গুলিতে ফুটো ক'রে দিয়েছিলাম। তাতে সে খুব বেশি জখম হয় নি, কিন্তু যে ভয়ঙ্কর চিৎকার ছেড়েছিল, আমাদের মোটরের গর্জন ছাপিয়েও তা তীক্ষ্ণভাবে আমাদের কানে এসে বিঁধেছে। আমাদের প্লেন একটিকে পাশে রেখে তাদের আরেকটির শ'দুয়েক ফুট তলা দিয়ে এখন যাচ্ছিল। আমি ওপরদিকে লক্ষ্য রেখে বন্দুকও ছুঁড়েছিলাম। হঠাৎ ভয়ঙ্করভাবে আমাদের প্লেন দুলে উঠে পাক খেতে খেতে নিচের দিকে প্রচণ্ডবেগে পড়তে শুরু করল। প্লেনের সীটের ধারটা সজোরে সে-সময়ে ধরে না ফেললে আমি বোধহয় ছিট্‌কেই পড়ে যেতাম।

হলো কি ? কি আর হবে। শকুনেরা যেমন ক'রে উঁচু থেকে

নামবার সময় পাখা মুড়ে ভারি জিনিসের মতো অনেকদূর থেকে দ্রুতবেগে পড়ে যায়, ঠিক তেমনিভাবে সেই বিশাল প্রাণীটি আমাদের পেছনের পাখার ওপর এসে পড়েছে। এই সুযোগেরই সে অপেক্ষা করছিল।

প্রথমটা সত্যিই আমি বিমূঢ় হয়ে গেছলাম এই আক্রমণের আকস্মিকতায় ও বিপদের ভীষণতায়। হাতের বন্দুকটা তুলে ধরবার কথাও আমার মনে ছিল না। প্লেন পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে হচ্ছিল, বিদ্যুদ্বেগে নিচের মাঠ-ঘাট-জঙ্গল আমাদের দিকে ছুটে আসছে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই মাটিতে আছাড় খেয়ে যখন মরতেই হবে, তখন আর বন্দুক ছুঁড়ে লাভ কি।

কিন্তু সে-বিমূঢ়তা আমার কেটে গেল অশোকের কথায়। সে তাহলে মাথা ঠিক রেখেছে এত বিপদের ভেতরও। চোঙের ভেতর দিয়ে সে চিৎকার ক'রে বললে—'দেখছ কি? গুলি কর, আমি প্লেন সামলে নিচ্ছি।'

এইবার সামনে ভালো ক'রে চেয়ে দেখলাম। সেদিকে চেয়ে অবশ্য মাথা ঠিক রাখা শক্ত। সামনের ও পেছনের পায়ের হিংস্র-নখরে আমাদের প্লেনের পেছনের দিকটা আঁকড়ে ধরে একটু একটু ক'রে সেই ভয়ঙ্কর প্রাণীটা আমার দিকে এগিয়ে আসছে। তার হিংস্র দাঁতাল মুখ একেবারে আমার সামনে। জানোয়ারটির বর্ণনা করা কঠিন। অতিকায় একটা গোসাপের সামনের পা-দুটো থেকে বাদুড়ের মতো পাতলা চামড়ার ডানা বেরিয়েছে বললে তার খানিকটা বর্ণনা হয়, কিন্তু তার হিংস্র মুখের ও সাপের মতো কুটিল ভয়ঙ্কর চোখের ভীষণতা বোঝানো যায় না।

অশোক সামলাবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও তখন আমাদের প্লেন পেছনের ল্যাজের ভারে টাল হারিয়ে একেবারে মাটির কাছাকাছি এসে পড়েছে। সেইসময়ে দাঁতে দাঁত চেপে সমস্ত শক্তি সংগ্রহ ক'রে আমি বন্দুকের নলটা সেই হিংস্র প্রাণীর একেবারে দাঁতাল মুখের ভেতর ঢুকিয়ে দিলাম এবং তারপরই দুটো ঘোড়াই দিলাম পর পর টিপে।

আর কিছু করবার দরকার হলো না। প্লেনের ওপর একবার একটু নড়ে উঠেই জানোয়ারটা গড়িয়ে পড়ে গেল নিচে। আমাদের বিমানপোতও মাটিতে আছাড় খেতে খেতে হঠাৎ তীরের মতো ওপরে উঠে গেল ভারমুক্ত হয়ে।

পুবের আকাশ তখন লাল হয়ে উঠেছে। কপালের ঘাম মুছে আমি চোঙের ভেতর দিয়ে বললাম—'এবার তো নামতে হয়!'

অশোক বললে—'না, আরেকটা যে এখনো বেঁচে আছে।'

'কিন্তু আমার বন্দুক যে সেই জানোয়ারটার সঙ্গে পড়ে গেছে!'

'বন্দুক পড়ে গেছে!'—সবিস্ময়ে চিৎকার ক'রে উঠে অশোক খানিক চুপ ক'রে রইল, তারপর আবার বললে—'তাহলেও ফেরা যায় না। এমন সুযোগ আর কখনো পাব কিনা সন্দেহ। এই ভীষণ জানোয়ার বেঁচে থাকলে আরো কত সর্বনাশ করবে, কে জানে! তুমি প্যারাস্থট দিয়ে নামবার জন্যে প্রস্তুত থাক।'

সে যে কি করতে চায়, কিছুই বুঝতে না পেরে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম! আর একটি জানোয়ারের নাগাল আমরা তখন ধরে ফেলেছি। চারিদিক আলোকিত হয়ে ওঠার দরুণ, কিংবা তার সঙ্গীর মৃত্যুতে ভয় পেয়ে কিনা, ঠিক বলা যায় না, সে তখন আক্রমণের বদলে পালাবার ফিকিরই খুঁজছে। বিশাল পাখাগুলো সবেগে আন্দোলিত ক'রে পশ্চিমদিকের ঘন জঙ্গলের দিকেই সে যাওয়ার চেষ্টা করছে মনে হলো।

অশোক হঠাৎ চোঙের ভেতর দিয়ে বললে—'লাফিয়ে পড় এইবার।'

কিন্তু লাফাব কি, আমি তখন অশোকের কাণ্ড দেখে বিমূঢ় হয়ে গেছি। আমাদের প্লেন সোজা সেই জানোয়ারটির দিকে বন্দুকের গুলির মতো ছুটে চলেছে। যন্ত্রপাতি সব ঠিক ক'রে অশোক তার বসবার খোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এবার শুধু সীটের ধারটুকু ধরে বাইরে ঝুলে পড়ল, তার ইঙ্গিতে আমিও তখন তাই করছি; তারপর একটি, দু'টি, তিনটি সেকেণ্ড। তার ইশারায় এবার হাত ছেড়ে দিয়ে

শূন্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়লাম। প্যারাসুটের বোতাম টেপবার আগেই শুনতে পেলাম, ওপরে ভয়ঙ্কর সজ্ঘর্ষের আওয়াজ। আমাদের এরোপ্লেন প্রচণ্ডবেগে গিয়ে জানোয়ারটিকে আঘাত করেছে।

আমাদের প্যারাসুট খোলার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের একরকম গায়ের পাশ দিয়েই সেই ভয়ঙ্কর প্রাণীটার মৃতদেহ সশব্দে মাটিতে গিয়ে পড়ল ; আমাদের এরোপ্লেনটি মাতালের মতো তখনো পড়তে পড়তে পাক খাচ্ছে।

নাগরকোটা থেকে ট্রেনে কলকাতায় পৌঁছোবার আগেই আমাদের খবর কিরকমভাবে সেখানে পৌঁছে গেছিল। এই আশ্চর্য জানোয়ারের মৃত্যুর খবরে সেখানে কিরকম চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল; আই. এন. এ. থেকে আমাদের, বিশেষত অশোককে কিরকম সম্মান করা হয়েছিল, সে-খবর অনেকেরই জানা।

এখানে শুধু আমাদের এই অভিযানের অদ্ভুত পরিণতির কথাটাই বলব।

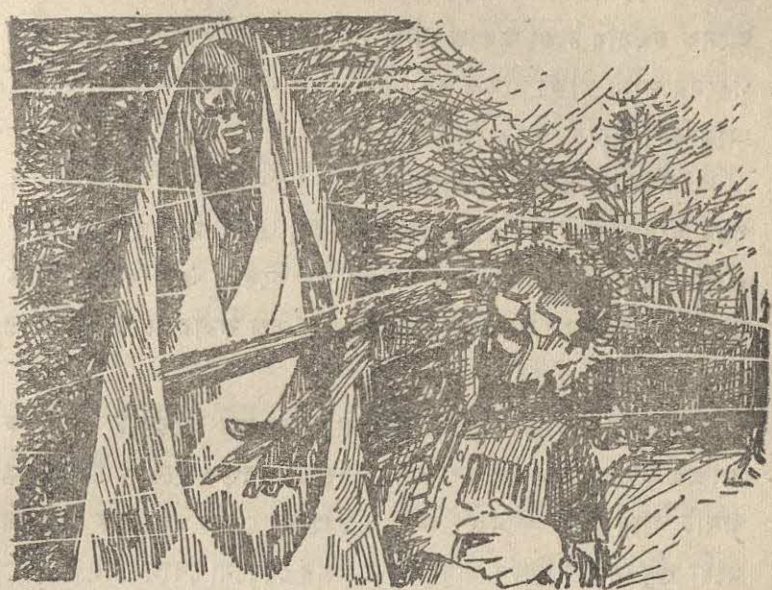
সে-পরিণতি স্যার চিরঞ্জীবের মুক্তি। শুধু মুক্তি নয়, বৈজ্ঞানিক হিসেবে এই ব্যাপারে তাঁর খ্যাতির পুনরুদ্ধারও হয়ে গেল। প্রাচীন যুগের সরীসৃপ-বংশ যে লোপ পায় নি, তার চাক্ষুষ প্রমাণ তো আমরাই পেয়েছি।

যে ভয়ঙ্কর প্রাণী দু'টিকে মেরেছিলাম, স্যার চিরঞ্জীব নিউগিনি-অভিযান থেকে তাদের ডিম এনে কৃত্রিম উপায়ে অদ্ভুত কৌশলে তাঁর পরীক্ষাগারে ফুটিয়ে তাদের ছানাগুলিকে পালন করছিলেন একদিন বৈজ্ঞানিক-জগৎকে দেখিয়ে স্তম্ভিত ক'রে দেবেন বলে। সেগুলি নাকি প্রাচীনযুগের 'টেরোড্যাক্টিলের'ই সুদূর বংশধর—আরো হিংস্র, আরো বিশালকায়। জানোয়ারগুলিও আশাতিরিক্তভাবে বেড়ে ওঠে ; কিন্তু একদিন হঠাৎ তাঁর চাকরের অসাবধানতায় তাদের খাঁচা থেকে তারা বেরিয়ে পড়ে বলেই বিপদ হয়। চাকরটিকে অমন নৃশংসভাবে তারাই হত্যা করেছিল।

তারা ছাড়া পেয়ে কি সর্বনাশ করতে পারে, তা বুঝেই স্যার চিরঞ্জীব বন্দুক নিয়ে এরোপ্লেনে তাদের মারবার জন্যে বেরুচ্ছিলেন। পুলিশ তাঁকে সেই অবস্থায় বাধা দেওয়ায় অত্যন্ত অপমানিত বোধ ক'রে তিনি একেবারে মৌন হয়ে যান।

খবরের কাগজে যে সংবাদ একদম চাপা পড়ে গিয়েছিল, অশোক স্যার চিরঞ্জীবের সেই খুনের রহস্যের সঙ্গে এই বিমানডাকের রহস্যের যোগসূত্র হঠাৎ একদিন আশ্চর্যভাবে আবিষ্কার না করলে অবশ্য সবদিক দিয়েই সর্বনাশ হয়ে যেত। আর মফঃস্বল-সংবাদে বুড়ির বাছুর-চুরির যে খবর গাঁজাখুরি বলে আমি পরিহাস করেছিলাম, তার থেকেই কিন্তু জানোয়ার দু'টিকে কোথায় সন্ধান করতে হবে, অশোক তার আভাস পায়। নইলে নাগরকোটার নামও সে জানতো না দু'দিন আগে।

মাঝরাতের 'কল'



যে পাঁচটা ইন্দ্রিয় দিয়ে আমরা পৃথিবীকে জানি, তাদের ত্রুটি অনেক। অনেক রকম ভুল তাদের হয়। তবু আমাদের মতো সাধারণ মানুষের তাদের ওপর বিশ্বাস অগাধ। অগাধ বিশ্বাস আমাদের সাধারণ বুদ্ধির ওপর। এই ক'টা ইন্দ্রিয়ের নাগালের মধ্যে না এলেই—আমরা অনায়াসে অনেক কিছুকে উড়িয়ে দিই। বুদ্ধি দিয়ে আমরা কঠিনভাবে সত্য বা মিথ্যা বলে সব কিছুর ওপর রায় দিই; কিন্তু এমন অনেক জিনিস আছে, যা সত্য-মিথ্যার মাঝামাঝি জগতের—যেখানে বুদ্ধি থই পায় না, ইন্দ্রিয় হার মেনে যায়।

সেইরকম একটা কাহিনীই আজ বলতে বসেছি।

গোড়ায় নিজের একটু পরিচয় দেওয়া ভালো। পশ্চিমের কোনো একটি মাঝারি গোছের সমৃদ্ধ শহরে আমি ডাক্তারি করি। শহরের নামের কোনো প্রয়োজন এ-গল্পে নেই, সুতরাং নামটা না-ই করলাম।

সেদিন রাত্রে শহরের প্রায় বাইরে বহুদূরের একটা 'কল' সেরে

একলাই ফিরছিলাম। একে দারুণ শীত এ-বছর, তার ওপর রাত অনেক হওয়ায় ঠাণ্ডা অত্যন্ত বেশি পড়েছিল। পুরু পুরু গোটাকতক গরমের জামা থাকা সত্বেও সব ভেদ ক'রে মনে হচ্ছিল ঠাণ্ডা হাওয়া আমার পাঁজরার ভেতর গিয়ে ঢুকছে!

আসছিলাম আমার পুরোনো মোটরে। এ-মোটর আমি আজ দশ বছর ধরে একাই চালিয়ে ফিরছি; কিন্তু এখন মনে হচ্ছিল, সঙ্গে একজন সোফার থাকলেই বুঝি ভালো হতো। এই দারুণ শীতে স্টিয়ারিং হুইল ধরে সমস্ত হাওয়ার ঝাপ্‌টা সহ্য করার চেয়ে কষ্ট আর কিছু নেই।

আমাদের শহরটি অত্যন্ত ছড়ানো। বড় বড় কয়েকটি রাস্তাকে আশ্রয় ক'রে চারিধারে অনেকদূর পর্যন্ত সে বিস্তৃত হয়ে আছে; কিন্তু জমাট বাঁধে নি। অনেক সময় একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তের মধ্যে শুধু একটি নির্জন রাস্তা ছাড়া আর কোনো যোগ নেই।

যে-রাস্তা দিয়ে আসছিলাম, সেটিও অত্যন্ত নির্জন। দু'ধারে মাঝে মাছে হর্‌তুকী বা মহুয়া গাছ। আর রাস্তার দু'ধারে শুধু শূন্য অসমতল মাঠ। তার ভেতর বাড়ি-ঘর নেই বললেই হয়। কে বাড়ি করবে এই নির্জন জায়গায়!

অন্ধকারে অবশ্য এসব কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। আমার মোটরের মিট্‌মিটে আলোয় সামনের পথের খানিকটা দেখা যাচ্ছিল মাত্র। যেতে যেতে মনে হচ্ছিল, অন্ধকারের সমুদ্রই যেন আমার মোটরের আলোয় কেটে চলেছি কোনোরকমে।

শীতের দরুণ কষ্ট পেলেও বেশ নিশ্চিন্তমনেই চলেছিলাম। আমার 'কার'টি পুরোনো হলেও মজবুত। বেয়াড়াপনা সে করে না। আধ-ঘণ্টার মধ্যেই বাড়ি পৌঁছে গরম লেপের মধ্যে আরাম ক'রে যে শুতে পাব, এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না।

অন্ধকার রাস্তার নিস্তব্ধতার ওপর শব্দের ঢেউ তুলে আমার মোটর চলেছে দ্রুতগতিতে। নিজেকে যথাসম্ভব আবৃত রেখে ভেতরে বসে সমস্ত চিন্তা পরিত্যাগ ক'রে আমি শুধু আমার গরম বিছানাটার

আরামের কথাই ভাবছি। ডাক্তারদের মতো পরাধীন আর কেউ নয়। তবু মনে হচ্ছিল, একবার বাড়িতে পৌঁছোতে পারলে প্রাণের দায়ে ছাড়া শুধু পয়সার জন্যে আর আমায় কেউ বের করতে পারবে না। এখন কোনোরকমে কুড়ি-পঁচিশ মিনিট কাটলেই হয়।

কিন্তু হঠাৎ অপ্রত্যাশিত এক ঘটনায় সুখস্বপ্ন আমার ভেঙে গেল। আমার একান্ত সুস্থ-সবল মোটর থেকে থেকে কেন অদ্ভুত একরকম ধাতব আর্তনাদ করতে শুরু করেছে! মোটরের এরকম আচরণের কোনো কারণই খুঁজে পেলাম না। আজ দুপুরেই আমার মোটরের ভালোরকম সেবা-শুশ্রূষা হয়ে গেছে। কোনোরকম রোগের আভাস তার ভেতর তখন ছিল না। হঠাৎ তার এরকম আকস্মিক বিকারের কারণ তবে কী?

এই দারুণ শীতের রাত্রে অন্ধকার নির্জন এই পথের মাঝে মোটরের এই বেয়াড়াপনায় সত্যিই ভীত হয়ে উঠলাম। এখনো প্রায় সাত-আট মাইল পথ বাকি। রাস্তার মাঝে মোটর সত্যি অচল হয়ে গেলে করব কী? এই রাত্রের ডাকেও সঙ্গে লোক না আনার নির্বুদ্ধিতার জন্যে এবার নিজের ওপরই রাগ হচ্ছিল। সঙ্গে একজন লোক থাকলে তবু বিপদে অনেক সাহায্য পাওয়া যেত।

দেখতে দেখতে মোটরের আর্তনাদ আরো বেড়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে মোটরের বেগও মন্থর হয়ে আসছে বুঝতে পারলাম। মোটর-চালনার সমস্ত বিদ্যা প্রয়োগ করেও সুরাহা কিছু করতে পারলাম না। কাতরাতে কাতরাতে খানিক দূর গিয়ে আমার মোটর হঠাৎ রাস্তার মাঝে এক জায়গায় একেবারে থেমে গেল। আর তার নড়বার নাম নেই। চেষ্টার আমি তখনো ত্রুটি করলাম না; কিন্তু আমার পীড়নে অস্ফুটভাবে একটু কাতরোক্তি ক'রে ওঠা ছাড়া আর কোনো সাড়া সে দিলে না।

ভয়ে, দুর্ভাবনায় সত্যিই তখন আমার সমস্ত দেহ আড়ষ্ট হয়ে এসেছে। মোটর ফেলে এই দারুণ শীতের মাঝে সাত-আট মাইল জনহীন পথ হেঁটে যাওয়ার কথা তো কল্পনা করা যায় না। এই

মাঠের মাঝে মোটরে সারারাত কাটানও অসম্ভব। এখন উপায়!

'ডাক্তারবাবু!'

হঠাৎ বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা যেন লাফিয়ে উঠল। এই জনশূন্য পথে এমন সময়ে কে ডাকলে?

আবার শুনতে পেলাম—'ডাক্তারবাবু!'

এদিক-ওদিক অন্ধকারে তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে এবার দেখতেও পেলাম। পথের ধারে ঝাঁকড়া একটা গাছের পাশে আব্‌ছা একটি দীর্ঘ শীর্ণমূর্তি দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ এমন জায়গায় কেমন ক'রে তার উদয় হলো, বুঝতে না পারলেও সাড়া দিয়ে বললাম—'কে তুমি?' মনে তখন আমার একটু আশার রেখাও দেখা দিয়েছে। তার আবির্ভাব যেমনই বিস্ময়কর হোক না কেন, লোকটার কাছে সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা তো আছে।

লোকটা সেই জায়গা থেকেই বললে—'আমায় চিনবেন না আপনি।'

চেনবার জন্যে আমি তখন ব্যস্ত নই। আমার সাহায্য করবার জন্যে একজন লোক তখন দরকার মাত্র। সেই কথাই আমি তাকে বলতে যাচ্ছি, এমন সময় লোকটা আবার বললে—'আপনাকে একটু আসতে হবে ডাক্তারবাবু! ভারি অসুখ একজনের।'

এমন সময়ে এ-অনুরোধে বিরক্ত যেমন হলাম, আশ্চর্যও হলাম তেমনি। ঠিক এই সময়ে রাস্তার ঠিক এই জায়গায় রোগী কি আমার জন্যে তৈরি হয়ে বসেছিল!

লোকটা আমার মনের কথাই যেন আঁচ ক'রে বললে—'এ ভগবানের দয়া ডাক্তারবাবু! এমন সময় আপনাকে এখানে পাব, স্বপ্নেও ভাবি নি, অথচ না পেলে কি বিপদই যে হতো!'

বেশি কথাবার্তা তখন আর ভালো লাগছিল না। একটু বিরক্ত হয়েই বললাম—'কোথায় তোমার রুগী?'

লোকটা এবার নিঃশব্দে অন্ধকারের ভেতর একদিকে হাত বাড়িয়ে নির্দেশ করলে। সেদিকে চেয়ে দেখলাম, সত্যি দূরে একটা বাড়ির

আলো যেন দেখা যাচ্ছে। এরকম নির্জন প্রান্তরের মাঝে এরকম বাড়ি খুব কমই থাকে। হঠাৎ এরকম জায়গায় এমন সময়ে যাওয়াও একটু বিপজ্জনক। তবে শত্রু আমার কেউ তো নেই এবং সঙ্গে টাকাকড়িও নিতান্ত সামান্য, এই যা ভরসা।

একটু ভেবে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—'কী অসুখ?'

উত্তর এল—'জানি না ডাক্তারবাবু, কিন্তু অত্যন্ত সঙীন অবস্থা, তাড়াতাড়ি না গেলে বোধ হয় বাঁচানো যাবে না। দোহাই আপনার চলুন, ডাক্তারবাবু!'

কোথায় নিজের বিপদ সামলাব, না হঠাৎ রাস্তার মাঝে মাঝরাতে যেতে হবে পরের চিকিৎসায়। তবু ডাক্তার মানুষ—জীবন-মরণের সমস্যা শুনলে চুপ ক'রে বসে থাকতে পারা যায় না। বাধ্য হয়েই তাই বললাম—'চল।'

মাঠের ওপর দিয়ে সরু একটা পথ। অন্ধকারে ভালো দেখাই যায় না। তাই ধরে লোকটার পিছু-পিছু মিনিট পাঁচেক হেঁটে একটি বাড়ির উঠোনে এসে দাঁড়ালাম। সামনে একটি ঘরের দরজা থেকে আলো দেখা যাচ্ছে। সেইদিক দেখিয়ে লোকটা বললে—'ঐ ঘরেই রুগী বাবু, আপনি যান, আমি এখুনি আসছি!'

অন্ধকারের ভেতরই বুঝতে পারছিলাম, বাড়িটি বিশেষ সমৃদ্ধ চেহারার নয়। গুটি-চার-পাঁচেক ঘর এবং একটুখানি ঘেরা উঠোন। ঘরগুলিও সব পাকা-ছাদের নয়, দু'পাশে খোলার ছাউনি।

লোকটার কথামতো সামনের ঘরে গিয়ে এবার ঢুকলাম। ঘরটি আয়তনে বিশেষ বড় নয়, তার ওপর নানান আকারের বাক্স-পেঁটরায় বোঝাই বলে ভেতরে নড়বার-চড়বার স্থান অত্যন্ত অল্প। দরজার মুখোমুখি একটি জানালা। সেই জানালার ধারে মিটমিট ক'রে একটি কেরোসিনের লণ্ঠন জ্বলছে। সেই আলোতেই অস্পষ্টভাবে দেখা গেল, দরজার বাঁ-ধারে চারপায়ায় অত্যন্ত শীর্ণ এক ভদ্রলোক শুয়ে আছেন।

আমি ঘরে ঢুকতেই ক্ষীণস্বরে তিনি বললেন—'এসেছেন ডাক্তারবাবু। আপনার দয়া কখনো ভুলব না, বসুন।'

ঘরের ভেতর এদিক-ওদিক চেয়ে বসবার জায়গা একটিই মাত্র দেখতে পেলাম। জানালার কাছে চারপায়া থেকে অনেক দূরে একটি বেতের মোড়া। সেইটেই টেনে চারপায়ার কাছে বসবার উদ্যোগ করতে ভদ্রলোক আবার ক্ষীণস্বরে বললেন—'বসুন, বসুন, ঐখানেই বসুন, আগে আমার রোগের কথা বলি শুনুন।'

একটু হেসে এবার সেইখানেই বসলাম। রোগীদের নানা অদ্ভুত বাতিকের সঙ্গে আমার যথেষ্ট পরিচয় আছে। বুঝলাম খানিকক্ষণ ধরে নিজের রোগ সম্বন্ধে নানা মতামত এখন আমায় শুনতে হবে। না শুনলে নিস্তার নেই।

ক্ষীণস্বরে প্রথমেই তিনি আরম্ভ করলেন—'আমার রোগ সারাতে আপনি পারবেন না ডাক্তারবাবু? বাঁচাতে পারবেন ডাক্তারবাবু?'

একটু হেসে বললাম—'সেই চেষ্টা করাই তো আমাদের কাজ! আর বাঁচবেন না-ই বা কেন?'

একটু অদ্ভুত হাসির আওয়াজ এল খাট থেকে—'বাঁচতেও পারি তাহলে ডাক্তারবাবু! কেমন?'

বললাম—'পারেন বই কি! কি তেমন আর হয়েছে আপনার?'

'না, তেমন আর কি হয়েছে!' ভদ্রলোক আবার যেন হাসলেন, তারপর বললেন—'ডাক্তারদের অনেক ক্ষমতা, কেমন না? কিন্তু ধরুন, তাতেও যদি না বাঁচি, যদি আজ রাত্রেই মারা যাই?'

রোগীর এই অর্ধোন্মত্ত প্রলাপের উত্তরে কি যে বলব, কিছুই ভেবে পেলাম না। মনে মনে তখন এই বিলম্বের জন্যে অস্থির হয়ে উঠছি।

রোগীই আবার বললেন—'যদি আপনি থাকতে থাকতেই মারা যাই ডাক্তারবাবু, কি হবে তাহলে? কে আপনার "ফী" দেবে?'

আচ্ছা পাগল রোগীর পাল্লায় তো পড়া গেছে! বললাম—'যদি নেহাৎই তাই হয়, তাহলে "ফী" না হয় না-ই পেলাম। আমরা শুধু ফীর জন্যেই সব সময়ে আসি না।'

'তা বটে, তা বটে! পৃথিবীতে ভালো লোক, পৃথিবীতে মনুষ্যত্ব

তাহলে এখনো আছে, না ডাক্তারবাবু? কিন্তু ফীর আপনার ব্যবস্থা আমি ক'রে রেখেছি ডাক্তারবাবু! হঠাৎ যদি মরে যাই, তাহলে ওই বাক্সটি খুলে ফেলবেন, বুঝেছেন ডাক্তারবাবু—ঐ বেতের ছোট্ট বাক্সটি!'

ভদ্রলোকের স্বর আরো মৃদু হয়ে এল—'ঐ বাক্স থেকে আপনার প্রাপ্য টাকা নেবেন। আরো একটা জিনিস নেবেন ডাক্তারবাবু। বলুন, নেবেন তো?'

একটু বিরক্ত হয়েই বললাম—'কী'?

'কিছু না, ডাক্তারবাবু, একটা কাগজ! কি ভয়ানক দরকারী কাগজ! এ-কাগজ যে ওখানে আছে, শুধু আমি জানি আর আপনি এখন জানলেন। আর কেউ জানে না। জানলে আর ওখানে ওটা থাকতো না।'

ভদ্রলোক একটু চুপ থেকে একটু হেসে আবার বললেন—'এ-বাড়িতে কাউকে না পেয়ে ভাববেন না যেন, আমার কেউ নেই! আমার অনেক আত্মীয় আছে—ওঁৎ পেতে আছে আমার মরার অপেক্ষায়। শুধু তাদের বিশ্বাস, আজ আমি হয়তো মরব না। তাদের বিশ্বাস, মরবার আগে আর আমি কিছু করব না। তারাই পাবে সব।'

আমি এবার বলতে যাচ্ছিলাম—'আপনার অসুখটা সম্বন্ধে—'

'হ্যাঁ, অসুখ তো দেখবেনই, তার আগে আর একটা কথা বলে নিই—ওই কাগজটি আমার উইল, ডাক্তারবাবু! আমার ছেলের নামে উইল। সে ছেলেকে আমি ত্যাজ্যপুত্র করেছিলাম একদিন, কোথায় আছে, তাও জানি না; কিন্তু জানেনই তো রক্ত জলের চেয়ে ঘন।'

আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করা যায় না। মোড়া থেকে উঠে পড়ে আমি বললাম—'এইবার আমি দেখতে পারি?'

খাট থেকে আওয়াজ এলো—'দেখুন।'

আমি খাটের কাছে এগিয়ে গিয়ে রোগীর নাড়ি দেখবার জন্যে

হাতটা তুলে ধরলাম এবং পরমুহূর্তেই সেই দারুণ শীতের ভেতরও আমার সমস্ত দেহ ঘেমে উঠল।

সে হাত বরফের মতো ঠাণ্ডা! রোগী মৃত! শুধু মৃত হলে এতখানি আতঙ্কের আমার বোধহয় কারণ থাকতো না। কিন্তু ব্যাপার যে আলাদা! ডাক্তারি-শাস্ত্রে যদি কিছু সত্য থাকে, তাহলে এ-রোগী এইমাত্র কখনোই মারা যায় নি। তার মৃত্যু হয়েছে অনেক আগে, কয়েক ঘন্টা আগে। সমস্ত দেহ তার কঠিন।

উন্মাদের মতো আরো খানিকক্ষণ পরীক্ষা করলাম। নাঃ, ভুল আমার হতেই পারে না। কিন্তু তাহলে এ-ব্যাপারের অর্থ কী?

তখন কিন্তু স্থিরভাবে কোনো চিন্তা করবার আর আমার ক্ষমতা নেই। আতঙ্কে আমার বুকের স্পন্দন পর্যন্ত যেন থেমে আসছে। হঠাৎ জানালার কাছে বাতিটা দপ্‌দপ্‌ ক'রে নেচে উঠল। সেটা একবার নেড়ে দেখলাম, তাতে তেল একফোঁটাও নেই। প্রান্তরের মাঝে নিস্তব্ধ নির্জন বাড়িতে এই ভয়ঙ্কর অবস্থায় আমি একা, এই বাতির আলোটুকুই যেন আমার একমাত্র সহায় ছিল, তাও নিভতে চলেছে দেখে আমি দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম। বুঝতে পারলাম, পিছনে আলোটা আর কয়েকবার নেচে নিভে গেল। তখন আমি উঠোন ছাড়িয়ে এসেছি প্রায়।

কিভাবে তারপর অন্ধকার প্রান্তরের ভেতর দিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে মোটরে উঠেছিলাম, তা আমার মনে নেই। মোটর চালিয়ে শহরের মাঝ বরাবর আসবার পর আমার যেন স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরে এল। সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার মনে হলো মোটরের এই চলা। খানিক আগে অদ্ভুতভাবে যে-মোটর বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ এবার বিনাচেষ্টায় আপনা হতে সে-মোটর এমন শুধরে গেল কি ক'রে?

তার পরদিন দিনের আলোকে লোক সঙ্গে ক'রে নিয়ে সেই প্রান্তরের মাঝেকার বাড়ির নিঃসঙ্গ রোগীর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করবার

ব্যবস্থা করেছিলাম। তাঁর ছেলেই আজকাল সমস্ত বিষয়ের মালিক।

সেদিনকার রহস্যের স্বাভাবিক মীমাংসা কিন্তু আমি এখনো করতে পারি নি।

মাহুরি-কুঠিতে একরাত



ট্রেনে যেতে যেতে ব্যাপারটা যতই ভেবে দেখছিলাম, ততই আরো অদ্ভুত লাগছিল। বাস্তব ঘটনা অবশ্য অনেক সময়েই কাল্পনিক গল্পের চেয়ে বিস্ময়কর হয় জানি, তবু যেন এই ব্যাপারটায় বিশ্বাস করতে কিছুতেই প্রবৃত্তি হচ্ছিল না।

দু'দিন আগেই বিমলের সঙ্গে আমার মেসের ঘরে প্রায় একটা পর্যন্ত জেগে তুমুল তর্ক করেছি। শেষ পর্যন্ত এ-বয়সের তর্কাতর্কির যা পরিণাম হয়, তাও আমাদের বচসায় হয়েছে। দু'জনেরই জেদ ও রাগ বেড়ে গেছে এবং পরস্পরকে যা-তা বলে যুক্তির অভাব পূরণ করেছি।

আমি বলেছি—'যেমন ছাতুখোরের দেশে জঙ্গলের মাঝে থাকিস, তেমনি জংলী বুদ্ধিও হয়েছে।'

বিমল বলেছে—'শহরের মাঝখানে ইলেকট্রিক লাইটের তলায় বসে বারফট্টাই মারতে সবাই পারে। একরাত ভেরেণ্ডির জঙ্গলের ধারে মাহুরি-কুঠিতে কাটাতে পারলে বুঝতাম।'

হেসে উঠে বলেছিলাম—'কাটাবার কি দরকার। তোর ভূত শহর

আর ইলেকৃট্রিক লাইটকেই বা ডরায় কেন? বেছে বেছে যত পোড়োবাড়ি আর জঙ্গলে না থেকে সে-ই তো এখানে এলে পারে!'

বিমল চটে উঠে জবাব দিয়েছে—'তার দায় পড়েছে। ভূত আছে, একথা তোর কাছে প্রমাণ করার জন্যে তার তো মাথাব্যথা নেই!'

বিমলকে আরো রাগিয়ে দিয়ে বলেছি—'তার না হোক, তোর তো আছে। তুই নিজে কোনোদিন মাহুরি না মুহুরি-কুঠিতে থেকে দেখেছিস!'

বিমল বলেছে—'রাত অবিশ্যি কখনো কাটাই নি, তবে বাইরে থেকে যা দেখেছি, তাই যথেষ্ট!'

আমি একথার উত্তরে এমনভাবে বিদ্রূপের স্বরে 'ওঃ!' বলেছি যে, বিমল মর্মাহত হয়ে চুপ ক'রে গেছে।

খানিক বাদে গম্ভীরমুখে শুধু বলেছে—'সাহস থাকে তো একবার সেখানে যাস।'

আমি ব্যঙ্গ ক'রে বলেছি—'গেলে অন্তত মুহুরি-কুঠির বাইরে থাকব না।'

পরের দিন সকালে অবশ্য আমাদের এই তর্ক নিয়ে মনকষাকষির কোনো চিহ্ন আর ছিল না। বিমল সকালের ট্রেনেই তার কাজের জায়গায় চলে যাবে। আমি স্টেশনে তাকে তুলে দিতে গিয়েছিলাম। আগের রাতের তর্কের কথা হু'জনে ভুলেও একবার উত্থাপন করি নি।

কিন্তু কে জানতো, সে তর্কের জের অমন ক'রে মেটবার নয়। হু'দিন বাদেই আমাকে সত্যিসত্যিই ভেরেণ্ডির জঙ্গলের উদ্দেশে রওনা হয়ে পড়তে হবে, তাই বা কে ভেবেছিল!

বিমল চলে যাওয়ার পর একটা রাত পার হতেই হুপুরবেলা হঠাৎ টেলিগ্রাম পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেছি। 'বিমল মরণাপন্ন, এখনি আমার যাওয়া দরকার!'—টেলিগ্রামের মর্ম এই।

যাওয়া যে দরকার, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ছোটনাগপুরের একটা নগণ্য স্টেশনে নেমে মাইলদশ-বারো গেলে ভেরেণ্ডির

জঙ্গল পাওয়া যায়। এই জঙ্গলের মাঝখানে একটা পুরোনো তামার খনিকে নতুন ক'রে আবিষ্কার ক'রে আজ দু'বছর বিমল সেখানে কাজ করছে। সেই নির্বান্ধব পুরীতে যে-সমস্ত কুলি-মজুর নিয়ে সে দিন কাটায়, সাংঘাতিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লে তারা যে কোনো সাহায্যই করতে পারবে না, এটা ভালো করেই বুঝতে পারছিলাম।

টেলিগ্রাম পাওয়ার পরই বিকেলে রওনা হয়ে পড়েছি। ভেরেণ্ডির জঙ্গলে বিমলের নিমন্ত্রণ এভাবে রক্ষা করতে যেতে হচ্ছে ভেবে সত্যিই অদ্ভুত লাগছিল। আর বিরক্তি লাগছিল যেতে এমন দেরি হওয়ায়। যে স্টেশনে নেমে ভেরেণ্ডির জঙ্গলে যেতে হয়, অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরনের প্যাসেঞ্জার ছাড়া আর সব গাড়ির কাছেই সে অস্পৃশ্য। তা বাধ্য হয়ে প্যাসেঞ্জারেই চাপলেও তার শামুকের মতো গতি ক্রমশই অসহ্য হয়ে উঠেছিল। এতক্ষণে কি যে বিপদ সেখানে হচ্ছে, কে জানে! বিমল অত্যন্ত শক্তধাতের ছেলে। সহজে সে কাতর কিছুতেই হয় না। সেই সুদূর জঙ্গলে একলা আজ সে দু'বছর যেভাবে বাস ক'রে আসছে, তা থেকে তার কাঠামোর পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং অত্যন্ত বিপদে না পড়লে সে যে আমায় 'তার' করত না, এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই; কিন্তু এরকম গদাইলস্করি-চালের গাড়িতে আমি সেখানে পৌঁছোবই বা কখন আর তাকে সাহায্যই বা করব কি!

বিকেলবেলা যে গাড়ি রওনা হয়েছিল, সমস্ত রাত গুটি গুটি ক'রে চলে ভোর প্রায় পাঁচটার সময় টিনের চাল দেওয়া নিতান্ত আখ্‌খুটে চেহারার একটি স্টেশনে সে-গাড়ি আমায় নামিয়ে দিলে। প্ল্যাটফর্ম বলতে কাঁকর-ফেলা খানিকটা জায়গা, ট্রেনের সব-কটা পা-দানি বেয়ে সেখানে নামতে হয়।

স্টেশন নয়, মনে হলো, যেন জনহীন কোনো প্রান্তরে নেমেছি। শীতের রাত্রে ভোর পাঁচটার সময় বেশ অন্ধকার থাকে। তার ওপর গাঢ় কুয়াশায় স্টেশনের একটি মিট্‌মিটে তেলের বাতি প্রায় অদৃশ্যই

হয়ে গেছে। প্ল্যাটফর্মে জনমানব কেউ আছে বলে মনে হলো না। মিনিট-খানেক থেমে গাড়িটা স্টেশন ছেড়ে চলে যেতেই তার নির্জনতা আরো যেন ভয়াবহ হয়ে উঠল। ট্রেনের আলোয় ও আওয়াজে নিজের নিঃসঙ্গতা এতক্ষণ এমন স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি নি।

কিন্তু এ-স্টেশন থেকে তো বেরুতে হবে। ভেরেণ্ডির জঙ্গলের রাস্তা এখান থেকে দশ-বারো মাইল দূর, এইটুকু মাত্র জানি—কোন্‌দিকে যে যেতে হবে, সে-সম্বন্ধে কোনো ধারণাই নেই। জিজ্ঞাসাই বা করি কাকে! টিকিট চাইতেও তো কেউ আসে না!

স্টেশনের অস্পষ্ট বাতিটার দিকে এবার এগিয়ে গেলাম। স্টেশনের ঘরে কোনো-না-কোনো লোক নিশ্চয়ই আছে।

'ঠারিয়ে!'

সত্যিই একেবারে আঁতকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লাম, মানুষ নয়, যেন বাঘের গলার আওয়াজ! পিছন ফিরে কুয়াশায় ঘোলাটে একটা নীল আলো ছাড়া কিন্তু কিছুই প্রথমটা দেখতে পেলাম না। নীল আলোটা আরো একটু কাছে এগিয়ে আসার পর বিশাল একটা বস্তার মতো জিনিস অস্পষ্টভাবে দেখা গেল। জিনিসটা বস্তা নয়, মানুষের মাথা। প্রকাণ্ড কম্ফর্টার ও তার ওপর কম্বল জড়িয়ে অত-বড় হয়েছে! সেই কম্বল ও কম্ফর্টারের সামান্য একটু ফাঁকের মধ্যে এবার প্রকাণ্ড একজোড়া গোঁফ ও দুটি জ্বলজ্বলে চোখ দেখা গেল। শরীরের অন্যান্য অংশ অন্ধকারে অস্পষ্ট।

সত্যিই, প্রথমটা কেমন যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেছলাম। সেই কম্বল-জড়ানো মুখ থেকে গম্ভীর বাজখাঁই গলায়—'টিকস্' শুনেও যেন প্রথমে ব্যাপারটা ভালো ক'রে বুঝতে পারি নি।

আবার আওয়াজ এল—'টিকস্ কাঁহা?'

এবার ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে পকেট থেকে টিকিট বার করলাম এবং পরমুহূর্তে ভাল্লুকের মতো একটা মোটা লোমওয়ালা হাত হঠাৎ অন্ধকার থেকে যেন বেরিয়ে এসে আমার হাত থেকে সেটা কেড়ে নিলে মনে হলো।

সাহস ক'রে এবার জিজ্ঞাসা করলাম—'ভেরেণ্ডির জঙ্গলের রাস্তাটা কোন্‌দিকে, বলতে পারেন ?'

নীল আলোটা দূরে সরে যেতে শুরু করেছিল ইতিমধ্যে সেটা থামল এবং কুয়াশার ভেতর থেকে শোনা গেল সবিস্ময় প্রশ্ন—'কাঁহা ?'

'ভেরেণ্ডির জঙ্গল, যেখানে তামার খনি আছে।'

নীল আলোটা আমার কাছে সরে এল। কম্ফর্টার ও কম্বলের বস্তার তলা থেকে দু'টি চোখ আমায় তীক্ষ্ণ-সবিস্ময়-দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে, বুঝতে পারছিলাম। ব্যাপারটা কী!

হঠাৎ 'উধর মৎ যানা' শুনে চমকে উঠলাম এবং কিছু জিজ্ঞাসা করবার পূর্বেই বিমূঢ় হয়ে দেখলাম, লোকটা চলে যাচ্ছে। পরমুহূর্তে নীল আলোটাই হঠাৎ বোধ হয় নিভে গেল, অন্ধকারে অন্তত আর কিছু দেখা গেল না।

কিন্তু আমার এখন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকলে তো চলবে না। স্টেশনের সেই আলোটি লক্ষ্য ক'রে আবার এগিয়ে গেলাম। সেই আলোর কাছেই বাইরে বেরোবার গেটটা পেয়ে তবু আশ্বস্ত হওয়া গেল। পাশেই স্টেশনের একটি মাত্র ঘর। ভেতর থেকে টেলিগ্রাফের 'টরে-টক্কা' আওয়াজ আসছে। গেট দিয়ে বেরুতে বেরুতে কৌতূহল-ভরে একবার জানালা দিয়ে উঁকি মেরে সত্যি বিস্মিত হলাম। একটা কুলি বা চাপরাশিরও সেখানে দেখা নেই।

বাইরেও কুয়াশাচ্ছন্ন অন্ধকার, শুধু একটা অস্পষ্ট পায়ের ধুসর ধোঁয়াটে রেখা কোনোরকমে চেনা যাচ্ছে। আপাতত আর কোনো পথ না দেখতে পেয়ে সেইটিকে অনুসরণ করাই যুক্তিসঙ্গত মনে হলো। খানিকবাদেই অন্ধকার কেটে গেলে আর ভাবনার কিছুই থাকবে না। তখন কাউকে জিজ্ঞাসা ক'রে নিলেই চলবে।

কিন্তু আকাশ পরিষ্কার হওয়া সত্ত্বেও কাউকে জিজ্ঞাসা করবার সুবিধা কিছুই হলো না। এরকম নির্জন পথ কোথাও আছে বলে জানতাম না। চারিধারে বিশাল ঘন-জঙ্গল একেবারে নিস্তব্ধ। মানুষ

দূরের কথা, এই ভোরের বেলা একটা পাখির আওয়াজও সেখানে শোনা যায় না। সৌভাগ্যের কথা জঙ্গলের মধ্যে পায়ে-চলার দু-একটা রেখা ছাড়া এ-পথ কোথাও দু'ভাগ হয়ে যায় নি।

ঘণ্টা-চারেক চলার পর পথ ক্রমশ ওপরে উঠেছে, বুঝতে পারলাম। জঙ্গলও সেখানে আরো নিবিড়। একটা চড়াই পার হয়েই দূরে একটা পাথুরে ঢিবির ধারে ছোট একটা বস্তির মতো দেখতে পাওয়া গেল। সে-বস্তির পিছনে একটা বিশাল ভাঙা পোড়োবাড়ি পাথুরে ঢিবির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জঙ্গলের ওপরে মাথা তুলেছে।

কাছে গিয়ে যন্ত্রপাতি ইত্যাদির চিহ্ন পেয়ে বুঝলাম, সেইটেই খনি; কিন্তু এখানেও যে জন-মানব নেই! খোলার চালের ঘরগুলির অধিকাংশই সকালবেলাও বন্ধ। টালিতে ছাওয়া বাংলো-প্যাটার্নের একটি বাড়ি তার মধ্যে দেখতে পেয়ে সেইটেই বিমলের থাকবার জায়গা হবে মনে ক'রে দরজায় গিয়ে কড়া নাড়লাম। কোনো সাড়া-শব্দ নেই।

দরজায় মৃদু একটা ধাক্কা দিতেই সেটা খুলে গেল। সামনেই বসবার ঘর, কয়েকটা বেতের চেয়ার ও একটা টেবিল পাতা। পেছনদিকে ভেতরের দিকের দরজায় পর্দা ঝুলছে। এঘরেও কেউ নেই।

পর্দাটা সরিয়ে ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছি, এমন সময়ে পেছনে পদশব্দ শুনে চমকে পেছন ফিরে তাকালাম। চমকে উঠবার কথাই বটে। প্রায় ছ'ফুট লম্বা অত্যন্ত রোগা ও সরু যে লোকটি ঘরে ঢুকেছে, বিজ্ঞাপনের ব্যঙ্গচিত্রে ছাড়া অমন চেহারা কোথাও চোখে পড়ে নি।

জিজ্ঞাসা করলাম—'বিমলবাবু কোথায় আছেন, বলতে পার?'

'কৌন্ বাবু?'

'বিমলবাবু। আমি তাঁর অসুখের টেলিগ্রাম পেয়ে আসছি। কেমন আছেন এখন?'

'নিজিনিয়ার বাবুকো মাঙ্গ্তা!' বলে লোকটা হাতের ও মুখের অপরূপ একটা ভঙ্গি করলে!

কিছু বুঝতে না পেরে বললাম—'নিঞ্জিনিয়ার বাবুই হলো, কিন্তু তিনি কোথায় ?'

লোকটা আমার দিকে খানিক অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থেকে যা বললে, তার মর্ম বুঝতে আমার মিনিট-দুয়েক লাগল এবং তারপর স্তম্ভিত হয়ে আমি ঘরের একটি চেয়ারে বসে পড়লাম।

ধীরে ধীরে তারপর সমস্ত ব্যাপারই শুনলাম। আমি টেলিগ্রাম পেয়ে যখন ট্রেনে রওনা হয়ে পড়েছি, তখন বিমল এ-জগৎ থেকেই রওনা হয়ে গেছে। সবচেয়ে আঘাত পেলাম যেভাবে সে মারা গিয়েছে, তার বিবরণ শুনে। এক হিসেবে আমিই তার মৃত্যুর জন্য দায়ী। কারণ কোনো অসুখে বিমল মারা যায় নি, তার মৃত্যু অত্যন্ত রহস্যজনক!

কলকাতা থেকে ফিরে এসে বিমল বোধহয় আমার বিদ্রূপ স্মরণ করেই জেদের বশে মাহুরি-কুঠিতে সমস্ত রাত একলা কাটায়। তার সঙ্গে যারা কাজ করে, তারা সকলেই মানা করেছিল, কিন্তু সে শোনে নি।

শেষরাত্রে অদ্ভুত একটা গোঙানি শুনে তার বেয়ারা রামদীন ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাইরের মাঠে বিমলকে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে। ধরাধরি ক'রে তাকে ভিতরে তুলে আনার পর দেখা যায়, তার মাথায় গভীর আঘাতের চিহ্ন, গায়েও নানা জায়গায় দাগ আছে। সে নিজেই পড়ে যাক বা কেউ তাকে ফেলে দিয়ে থাকুক, কোনো উঁচু জায়গা থেকে পড়ার দরুণ যে তার মাথায় দারুণ চোট লেগেছে, এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না।

অনেক সেবা-শুশ্রূষার পর সকালের দিকে আধঘন্টাটাক তার জ্ঞান হয়েছিল, সেই সময়েই সে আমায় টেলিগ্রাম করতে বলে; কিন্তু তারপর উন্নতির বদলে ক্রমশ তার অবস্থা খারাপের দিকে যেতে থাকে। বিকেলে চারটের সময় সে মারা যায়।

এদেশের লোকের, বিশেষত অশিক্ষিত কুলি-মজুরদের কুসংস্কার অত্যন্ত বেশি। তাদের ইঞ্জিনিয়ারবাবুকে ভূতেই যে ফেলে দিয়েছে,

এ-বিষয়ে তাদের কোনো সন্দেহ নেই, সেইজন্যে বিমলের মৃত্যুর পর তার সৎকার ক'রেই তারা সদলবলে খনির বস্তি থেকে চম্পট দেয়।

আমি সেইজন্যেই সকালে এসে কাউকে কোথাও দেখতে পাই নি। বেচারা রামদীনও পালিয়েছিল। যাওয়ার সময় তবু বুদ্ধি ক'রে সে স্টেশনে আমার ঠিকানায় আর একটা 'তার' ক'রে দেয়। আগেই রওনা হওয়ার দরুণ আমি সে 'তার' পাই নি। যে স্টেশন-মাস্টার সে 'তার' নিজের হাতে পাঠিয়েছিল, তার অদ্ভুত আচরণের ও কথা-বার্তার মানে এবার যেন একটু বোঝা গেল।

যার কাছে সমস্ত খবর পেলাম, ব্যঙ্গচিত্রের চেহারার মতো চেহারার অদ্ভুত সেই লোকটিই রামদীন। আজ সকালবেলা সে সাহস ক'রে বাবুর জিনিসপত্রের তদারক করতে কিংবা চুরির মতলবে, যে-কারণেই হোক 'নিঞ্জিনিয়ার'বাবুর কুঠিতে এসেছে।

সমস্ত ব্যাপার শোনবার পর আমার মনের অবস্থা যা হলো তা বর্ণনা করা অসম্ভব। বিমলের এ-পরিণামের কথা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি; কিন্তু এ-ব্যাপারের পর চুপ ক'রে চলে যাওয়াও আমার পক্ষে অসম্ভব। ভূতই হোক আর যাই হোক, এ-ব্যাপারের রহস্যভেদ আমায় করতেই হবে। আমার সংকল্প আমি তখনই ঠিক ক'রে ফেলেছি।

ভেরেণ্ডির জঙ্গল থেকে নিকটস্থ থানা প্রায় একবেলার পথ, দুপুরে রামদীনকে সেখানে খবর দিয়ে পাঠিয়ে আমি রাতের জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলাম।

আর কিছুর জন্যে না হোক, অন্তত বিমলের কাছে দেওয়া আমার প্রতিশ্রুতি রাখবার জন্যেই মাহুরি-কুঠিতে একরাত আমায় কাটাতেই হবে। তার জন্যে আয়োজন অবশ্য বেশি-কিছু করবার নেই। শুধু একটা জোরালো বৈদ্যুতিক টর্চ ও একটা ছোট লোহার রডই আমি সঙ্গে নেব, ঠিক করলাম।

সন্ধ্যের আগে রামদীনের ফিরে আসবার কথা, কিন্তু রাত প্রায় সাতটা হয়ে গেলেও তার কোনো পাত্তা পাওয়া গেল না। মুখে

আমায় কথা দিলেও ভূতের ভয়ে সে শেষ পর্যন্ত সরে পড়েছে, বুঝতে পারলাম ; কিন্তু পুলিশের লোকেরও দেখা নেই কেন ? রামদীন কি থানায় খবরও তা হলে দেয় নি ?

জঙ্গলের মাঝে পরিত্যক্ত খনির বস্তিতে আমি সম্পূর্ণ একা। রাত নটা বাজবার পর আর অপেক্ষা করতে পারলাম না। পুলিশের লোক আসুক বা না আসুক, মাহুরি-কুঠিতে একাই আমায় যেতে হবে।

বিমলের বাংলো থেকে মাহুরি-কুঠি বেশি দূর নয়। দিনের বেলা বাড়িটিকে ভালো ক'রে লক্ষ্য ক'রে দেখেছি। প্রকাণ্ড দোতলা তু'মহলা কুঠি, কি খেয়ালে যে এখানে এত বড় বাড়ি কেউ নির্মাণ করেছিল, বোঝা কঠিন। বাড়িটির অবশ্য অত্যন্ত ভগ্নদশা। বড় বড় গাছ তার দেয়াল ভেদ ক'রে বেড়ে উঠেছে ; বাইরের দিকে ঘরগুলির জানালা-দরজার চিহ্ন আর নেই। এই শুকনো দেশেও ভেতরের ঘরগুলিতে শ্যাওলা ও আগাছা জন্মেছে প্রচুর। ভাঙা দেউড়ি দিয়ে বাইরের মহল পার হয়ে গেলে ভেতরের বিশাল মহলে ওপর-নিচে অসংখ্য গোলকধাঁধার মতো যে-সমস্ত ঘর পাওয়া যায়, দিনের বেলাতেও সেগুলি অন্ধকার। দরজা-জানালা অধিকাংশরই নেই, যেগুলির আছে, সেগুলিও কব্জা থেকে খুলে পড়েছে, আসবাবপত্র অনেক ঘরে এখনো অত্যন্ত জীর্ণ অবস্থায় টিঁকে আছে, শুধু বোধ হয়, ভূতের ভয়ে চোরও সেখানে প্রবেশ করে নি বলে।

অমূলক ভয় আমার নেই, তবুও টর্চ হাতে বাইরের দেউড়ি দিয়ে মাহুরি-কুঠিতে প্রবেশ করবার সময় নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও গা যে ছমছম ক'রে উঠেছিল, তা স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি। এমন গাঢ় জমাট অন্ধকারের সঙ্গে পরিচয় আমার সত্যি কখনো হয় নি, টর্চের আলোকে যেন সবলে তাকে কেটে বেরুতে হচ্ছে। বাইরের মহলের ওপর-নিচের সমস্ত ঘরগুলো ঘুরে দেখে ভেতরের মহলে ঢুকলাম। নিচের ঘরগুলোর দুর্দশা অত্যন্ত বেশি। আগাছায় মেঝে প্রায় ছেয়ে গেছে। ইট-সুরকি-পাথর জায়গায় জায়গায় পড়ে আছে স্তূপাকার হয়ে। ঘরগুলিতে ঢোকাও বিপজ্জনক। সে-সমস্ত ঘর ছেড়ে এবার

ভগ্নপ্রায় সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠলাম। দোতলার ঘরগুলি এখনো অনেকটা ভালো অবস্থায় আছে। একটার পর একটা টর্চের আলোয় ভালো ক'রে পরীক্ষা ক'রে যেতে যেতে কিন্তু অস্বাভাবিক কোনো-কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। বিমলের মৃত্যুর রহস্য এ-বাড়ির সঙ্গে জড়িত না থাকলে অনায়াসে মনে করা যেত যে, নেহাৎ কুসংস্কারের দরুণ এখানকার লোক এই পোড়োবাড়িটাকে এমন বিভীষিকাময় ক'রে তুলেছে।

বাড়িটির একটি বিশেষত্ব অবশ্য আগেই উল্লেখ করেছি। ঘরগুলি এমন বিশৃঙ্খলভাবে সাজানো, যেখানে-সেখানে দরজা, ঘুলঘুলি প্রভৃতি এমনভাবে বসানো যে, সবশুদ্ধ একটা বিরাট গোলকধাঁধা বলে মনে হয়। এক ঘর থেকে আর এক ঘরে যেতে যেতে পথ গুলিয়ে ফেলবার সম্ভাবনা এখানে অত্যন্ত বেশি।

সম্প্রতি সত্যিই তাই গুলিয়ে ফেলেছি বলে মনে হচ্ছিল। খানিক আগে যে ঘর ছেড়ে গেছি, সেই ঘরেই আবার ঘুরে এসে সবিস্ময়ে তখন দাঁড়িয়ে পড়েছি। ওপরে ওঠবার সিঁড়িটাও যে ঠিক কোন্‌দিকে হবে, বুঝতে পারছিলাম না।

খানিক চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে মাথাটা ঠিক ক'রে নিয়ে আবার এগুতে যাব, এমন সময় পায়ে যেন কি একটা ঠেকল। টর্চের আলো সেখানে ফেলে অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে গেলাম। জিনিসটা আর কিছু নয়, একটা চামড়ার ব্যাগ ; কিন্তু এ-ব্যাগটির সঙ্গে আমি পরিচিত। কলকাতায় বিমলের কাছে আমি এটা দেখেছি এবং তার সুন্দর চামড়ার কাজের প্রশংসাও করেছি।

ব্যাগটা কুড়িয়ে নিয়ে খুলে ফেলে আরো আশ্চর্য হয়ে গেলাম। ব্যাগের ভেতর একটি খোপে সুতো দিয়ে বাঁধা একতাড়া করকরে নতুন দশটাকার নোট। আর একটি খোপে খুচরো কয়েকটি টাকা-পয়সা ও একটি ছোটো কাগজের টুকরা। এই কাগজের টুকরাটি দেখেই আমি চিনলাম—নিজের হাতে বিমলকে এই কাগজে আমার ঠিকানা আমি দিয়েছিলাম।

বিমল তার মৃত্যুর আগের রাত্রে এই ঘরে যে ঢুকেছিল এ-বিষয়ে আর কোনো সন্দেহই নেই, কিন্তু এ-ব্যাগ তার পকেট থেকে পড়লই বা কী ক'রে! আর কোনো শত্রুর হাতে যদি তার প্রাণ গিয়ে থাকে, তাহলে তারা এ-ব্যাগ ছোঁয়নিই বা কেন!

টর্চের আলোয় ঘরটা এবার আমি খুব ভালো ক'রে তন্ন তন্ন ক'রে দেখলাম। ঘরটি আকারে বেশ বড়, অন্যান্য ঘরের চেয়ে আসবাবপত্রও একটু বেশি—দু'টি ভাঙা তক্তপোষ, একটা পা-ভাঙা টেবিল। দেয়ালে লাগানো একটা কাঠের উইয়ে-খাওয়া বড় আলমারি ছাড়া খুচরো আরো অনেক জিনিস ঘরময় ছড়ানো, কিন্তু বিমলের আর কোনো চিহ্ন সেখানে পেলাম না। এমন কি কাল সে যে এখানে ছিল, তার কোনো পরিচয়ও নয়।

তবু এই ঘরেই রাত কাটাবার সংকল্প আমি তখন ক'রে ফেলেছি। রাত কাটাবার ব্যবস্থা আমার করাই ছিল, পকেট থেকে মোমবাতি বার ক'রে ভাঙা একটা তক্তপোষের ওপর রেখে জ্বেলে ফেললাম। টর্চের আলো তো সারারাত জ্বালা যায় না।

বাতিটা জ্বেলে তক্তপোষের ওপর বসতে গিয়ে কিন্তু উঠে পড়তে হলো। পাশের ঘরে হঠাৎ হুড়মুড় ক'রে কি একটা ভারি জিনিস পড়ে যাওয়ার শব্দ। এতক্ষণ এই পোড়োবাড়িতে এ-ধরনের কোনো শব্দ কিন্তু শুনি নি।

টর্চটা তুলে নিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে কিন্তু প্রথমটা একেবারে বিমূঢ় হয়ে গেলাম, হুড়মুড় ক'রে পড়বার মতো কোনো জিনিস সেখানে নেই; অথচ আমি স্পষ্ট সে শব্দ শুনেছি। হতভম্ব হয়ে খানিক দাঁড়িয়ে থেকে আবার আগের ঘরে ফিরলাম। বাতিটা কেমন ক'রে ইতিমধ্যে নিভে গেছে, কে জানে! দেশলাই বার ক'রে আবার সেটা জ্বালতে গিয়ে জ্বালা আর হলো না।

বাইরের বারান্দায় চটি পায়ে দিয়ে ফট্‌ফট্‌ ক'রে চলার স্পষ্ট শব্দ। ঝড়ের মতো এবার ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম। টর্চ ফেলবার আগেই কিন্তু শব্দটা গেছে থেমে। টর্চ ফেলে অবাক হয়ে

দেখলাম, সত্যিই দু'টো মান্ধাতার আমলের শুকনো চিমড়ে ছেঁড়া বেহারী-চটি সেখানে পড়ে রয়েছে।

না, ভয় তখনো আমি পাই নি, বরং কোনো দুষ্টলোকের কারসাজি যে এর ভেতর আছে, সেই সন্দেহই আমার তখন দৃঢ় হয়েছে। সে-কারসাজির সমুচিত শাস্তি দিতে হবে।

চটি-দু'টো হাতে ক'রে তুলে নিয়ে আবার ঘরে ফিরলাম এবং বাতি জ্বেলে গ্যাঁট হয়ে ভাঙা তক্তপোষের ওপর বসলাম ঘটনার পরিণতি দেখবার জন্যে। ভুতুড়ে চটি যদি হয়, তো আমার চোখের সামনেই চলুক দেখি! মিনিটদশেক কোনো কিছুই হলো না। ভুতুড়ে চটির ক্ষমতার বহর দেখে নিজের মনেই হাসছি, এমন সময় সত্যিই—সমস্ত গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

চুপি চুপি আমার পেছনে কে যেন স্পষ্ট আমার নাম ধরে ডাকলে একবার!

মোমের বাতিতে ঘরে তেমন আলো না হলেও সব পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। পেছনে কেউ কোথাও নেই। তবে এ শব্দ এল কোথা থেকে!

আমার মনের ভুল! কিন্তু মনের এরকম ভুল হওয়াও তো ভালো লক্ষণ নয়! ভয় পেয়ে যাদের মাথা খারাপ হয়ে যায়, তারাই চোখে নানারকম ভুল দেখে, কানে নানারকম আওয়াজ শোনে বলেই তো জানি।

নাঃ, আরো সতর্ক এবং সজাগ হয়ে থাকতে হবে এবার। নিজের মনের ভুলে ভয় পাওয়ার মতো লজ্জাকর ব্যাপার আর কিছু হতে পারে না।

হাতের ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখলাম, রাত প্রায় সাড়ে বারোটা। এতক্ষণ শুধু ঘরগুলো ঘোরাফেরা করতেই কেটে গেছে, বুঝতে পারি নি। শীতকালের ভোর হতে এখনো প্রায় ছ'ঘণ্টা বাকি। এই ছয় ঘণ্টায় শুধু ঘুমে চোখ না জড়িয়ে আসে, এইটুকু দেখতে হবে! বসে থাকলে পাছে ঘুম আসে বলে এবার ঘরে পায়চারী করবার জন্যে উঠে দাঁড়ালাম।

কিন্তু কি আশ্চর্য! আমার প্রত্যেক পা ফেলার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে বাইরে যেন আর একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে। সে যদি কারুর পায়ের শব্দ হয়, তাহলে তার চেহারাখানা যে কিরকম, তা কল্পনা করাও কঠিন! বারান্দায় একটা হাতি হাঁটলেও বোধ হয় অমন শব্দ হতো না।

পায়চারী করতে করতে ইচ্ছে ক'রে একবার থমকে দাঁড়ালাম। বাইরের শব্দও গেল থেমে। আবার চলতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই সে-শব্দ শোনা গেল।

এবার বাইরে ব্যাপারটা দেখতে যেতেই হলো। টর্চ নিয়ে সমস্ত পথটা কিন্তু তন্ন তন্ন ক'রে বৃথাই খুঁজে দেখলাম।

ফিরে এসে দেখি আবার আলো গেছে নিভে। নাঃ, ব্যাপারটা ক্রমশই বিরক্তিকর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। দেশলাইটা বার করছি, এমন সময়—

'আলো জ্বেলো না ভূপেন!'

মিথ্যেকথা বলে লাভ নেই, সমস্ত শিরদাঁড়া বেয়ে একটা যেন বরফ-গলানো জলের স্রোত নেমে গিয়ে সমস্ত শরীর অবশ ক'রে দিলে। এ যে স্পষ্ট বিমলের গলা!

খানিকক্ষণ শুকনো গলা দিয়ে কোনো আওয়াজ বেরুল না, তারপর জড়িতস্বরে কোনোরকমে বললাম—'কে তুমি?'

'আমি—আমি বিমল! দোহাই তোমার, আলো জ্বেলো না।'

'কেন?'

'তাহলে আমার এখানে থাকা হবে না। তোমাকে দু'টো কথা বলে যেতে চাই, তাও বলতে পারব না। তুমি ভয় পেয়েছ ভূপেন?'

ধরা-গলায় ঢোক গিলে বললাম—'না।'

'তাহলে টর্চ না জ্বেলে এগিয়ে এসে তক্তপোষটায় বস।'

আমি হাতড়ে হাতড়ে তক্তপোষটায় এসে বসলাম।

অন্ধকারে আবার শোনা গেল—'তুমি আসাতে কি খুশি যে হয়েছি, বলতে পারি না!'

কথাটা শুনে নিজে যথেষ্ট খুশি না হলেও বললাম—'তাই নাকি!'

'হ্যাঁ, তুমি না এলে আমায় এইখানে কতকাল বন্দী হয়ে থাকতে হতো কে জানে!'

'কেন?'

'দু'টো দরকারী কথা না বলে আমি পৃথিবী ছেড়ে যেতে পারছিলাম না।'

'পৃথিবী ছেড়ে কোথায়?'

খানিকক্ষণ কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। আবার জিজ্ঞাসা করলাম—'কোথায়, বললে না?'

'সে-কথা জানতে চেয়ো না, তোমাদের জানবার অধিকার নেই।'

'ও, কিন্তু তুমি কি বরাবর এখানে আছ?'

'বরাবর। যতক্ষণ তুমি এসেছ, তোমার পাশে পাশে ঘুরে বেড়িয়েছি, এখন একটু তোমার পাশে বসব?'

তাড়াতাড়ি বললাম—'না-না, কি দরকার! কিন্তু ওসব শব্দ-টব্দ কি তুমি করছিলে?'

'আমি! না-না, আমি নয়, ও ওরা-সব করেছে!'

সভয়ে—সবিস্ময়ে বললাম—'ওরা!'

'হ্যাঁ, ওরাও আছে, ওরা ঐরকম করতে ভালোবাসে, আমার কিন্তু ভালো লাগে না। তবে—'

'থামলে কেন? কি তবে?'

'তবে অনেকদিন পৃথিবীতে থাকতে হলে বিরক্তি আসে, তখন ঐ-সব বদখেয়াল হয়।'

'ওরা কি অনেকদিন আছে?'

'অনেকদিন! যোধমল তো মানসিংহের সঙ্গে মনসবদার হয়ে এসেছিল, আর দেবদত্ত অশোকের সময়ে।'

'এতদিন ওরা কেন এখানে আছে?'

'কী করবে, মায়ার বন্ধন! যোধমল এখানকার এক রাজকোষ লুট

করবার সময় দামী একটা মোতির মালা পেয়ে এক জায়গায় লুকিয়ে রেখেছিল। সেই লুকানো জায়গার কথা কাউকে জানাবার আগেই তলোয়ারের খোঁচায় মারা যায় বলে বেচারার আজও মুক্তি হলো না।'

একটু উৎসুকভাবে বললাম—'কাউকে জানালেই তো পারে।'

'উহুঁ, যাকে-তাকে জানালে হবে না, ওর বংশধর, আত্মীয়স্বজন, অন্তত দেশের লোক না হলে জানাবার উপায় নেই।'

'অর্থাৎ মাড়োয়ারী চাই ?'

'হুঁ—মাড়োয়ারীরা আবার এধার মাড়ায় না।'

যোধমল-সম্বন্ধে নিরুৎসাহ হয়ে বললাম—'আর দেবদত্ত ?'

'দেবদত্ত ? দাঁড়াও জিজ্ঞেস ক'রে দেখি।'

খানিকক্ষণ সব নিস্তব্ধ ; তারপর শোনা গেল—'দেবদত্তের উদ্ধার হওয়া আরো শক্ত।'

'কেন ?'

'অশোকের সময় ও মঞ্জুশ্রী না ধ্যানশ্রীর কি একটা মূর্তি গড়েছিল।'

'সেটা এখনো আবিষ্কৃত হয় নি বুঝি ? কোথায় সেটা ? আমি না হয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগে···'

'না-না, আবিষ্কৃত হয়েছে বই কি! কিন্তু পণ্ডিতরা তর্কাতর্কি ক'রে তার নাম নিয়ে বাধালে গোল, কেউ বলছে—সেটা মূর্তিই নয়, কেউ বলছে—কি বলে—প্রজ্ঞা পারমিতা!'

'তাতে কি!'

'চুপ চুপ। দেবদত্ত একেবারে ক্ষেপে উঠবে এক্ষুনি! তাতেই তো সব! নাম ঠিক হওয়া না দেখে ও কিছুতেই যেতে পারছে না এখান থেকে!'

'আমি না এলে তুমিও যেতে পারতে না ?'

'বোধ হয় না।'

'ঐ সব বদখেয়াল ?'

'তাও হয়তো হতো! এক্ষুনি তো মাঝে মাঝে কিরকম নিশ্‌পিশ্‌ করে…'

'কি নিশ্‌পিশ্‌ করে? হাত!'

একটু হাসির শব্দ শোনা গেল—'হাত তাকে বলে না! তবে…'

গলার স্বরে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ ক'রে বললাম—'যাক্‌গে ভাই, তোমার কি কথা ছিল না, যা বললেই তোমার ছুটি?'

'হ্যাঁ ছুটি, একেবারে ছুটি!'

একটু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—'বলা হলেই তুমি চলে যাবে?'

'তৎক্ষণাৎ!'

'কিন্তু তুমি চলে গেলে এই—এই যোধমল আর দেবদত্ত—'

'না-না, তোমার কোনো অনিষ্ট করবে না এরা, আমার বারণ আছে।'

'তবে বল এবার!'

'এই বলছি—কুঁক্‌!'

'ও আবার কি?'

'ও কিছু না!'

'কিন্তু হেচ্‌কির মতো শোনালো যেন!'

'পাগল! হেঁচ্‌কি কোথায়—কুঁক্‌।'

'কিন্তু আমরা তো ওকেই হেঁচ্‌কি বলি।'

'আমরা বলি না।'

'তবে কি ওটা?'

'ও আমাদের ভৌতিক দেহের বুৎকার!'

'বুৎকার কি?'

'ও-কথার মানে তোমরা বুঝবে না! ওটা এ-জগতের কথা!'

'ও-জগতের কথা আলাদা না কি! এতক্ষণ তো বেশ বাংলা বলছিলে!'

'অনেক কষ্টে অনুবাদ ক'রে বলতে হচ্ছিল, কিন্তু বুৎকারের অনুবাদ হয় না…কুঁক্‌!'

'না ভাই, এটা হেঁচ্‌কি !'

'উহুঁ, বুৎকার।'

'আমি তাহলে আলোটা জ্বালছি !'

'দোহাই তোমার ! এখনো আমার কথা বলা হয় নি···কুঁক্।'

'কথা তুমি পরে বোলোখন। এখন একটু জলের চেষ্টা দেখি।'

'আমাদের জল লাগে না, আলো জ্বাললেই আমায় চলে যেতে হবে···কুঁক্ !'

'তা নয় খানিক চলে গিয়ে তোমার "বুৎকারটা" থামিয়ে এসো।' বলে সত্যিই দেশলাই বের ক'রে মোমবাতিটা জ্বেলে ফেললাম।

কিন্তু একি ! ঘরে যে কেউ নেই ! একি ব্যাপার !

'কুঁক্ !'—

'বিমল, তুমি আছ এখানে !'

বিমলের কোনো উত্তরের বদলে শোনা গেল—'কুঁক্ !'

কয়েক সেকেণ্ড মাত্র বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবার পর আমার মনে আর কোনো সংশয় রইল না। এগিয়ে কড়া দুটো ধরে সজোরে কাঠের আলমারির পাল্লা দুটো আমি খুলে ফেললাম।

'একি ! বিমল, তুমি !—সশরীরে ?'

ব্যাপারটা এতক্ষণে বোধ হয়, অনেকখানিই বোঝা গেছে। হেঁচ্‌কিটুকু উঠে সব না খেঁচড়ে দিলে বিমলের ফন্দিকে সার্থক বলা চলত। তার টেলিগ্রামে আমি বিশ্বাস করেছিলাম এবং আগের দিন মাইল-দশেক দূরের এক মস্ত মেলার জন্যে খনির লোকজনকে ছুটি দেওয়ায় তার অন্যদিকে সুবিধে হয়ে গেছিল। শুধু রামদীনকে ষড়যন্ত্রের মধ্যে তাকে টানতে হয়েছিল। পোড়োবাড়িতে তার দুর্মুষ ফেলা ও পেটানোর আওয়াজের যে নমুনা সে দেখিয়েছে, তাতে তারিফ তাকে অবশ্যই করতে হয়। অবশ্য স্টেশন-মাস্টারের অদ্ভুত মূর্তি ও আচরণ বিমলের ফন্দিকে সাহায্য করবে, একথা সেও ভাবে নি।

নিশুতিপুর



'নিশুতি পু—র। নি-শু-তি-পু-র—'

রাণু ধড়মড়িয়ে বাঙ্কের ওপর উঠে বসল। এইখানেই নামবার কথা না? সঙ্গে মালপত্র তো কিছু নেই! সুতরাং নেমে পড়লেই তো হয়। যেমন মনে হওয়া, তেমনি বাঙ্ক থেকে কামরার মেঝেতে, আর কামরার মেঝে থেকে একেবারে প্ল্যাটফর্মে।

কি ঘুটঘুটে অন্ধকার রে বাবা! এমন অখদ্দে স্টেশন তো কখনো দেখি নি! ব্ল্যাক-আউট তো উঠে গেছে। স্টেশনে এখনো একটা আলো দিতে পারে না? দূরে যদি বা একটা মিটমিটে আলো দেখা গেল, সেটা জ্বলে উঠেই আবার গেল নিভে।

এখন কি করা যায়? ট্রেনটাও ঠিক স্টেশনের মতোই অন্ধকার, দেখতে দেখতে সেটাও যেন অন্ধকার কুয়াশার সঙ্গে মিলিয়ে গেল।

কার সঙ্গে যেন রাণুর দেখা করবার কথা। কে যেন তাকে নিয়ে যেতে আসবে বলে কথা দিয়েছিল। কিন্তু কোথায় কে!

দূরে—ঐ ওখানে ক'টা টিমটিমে আলোর জটলা দেখা যাচ্ছে না? ওদিকে এগিয়ে খবর নেওয়া ছাড়া আর উপায় কি!

রাণু সেদিকেই পা বাড়ালো দো-মনা হয়ে।

'এই যে!'

রাণু থমকে দাঁড়াল। গলাটা সে যেন চেনে।

'তোমাকেই খুঁজতে এসেছিলাম।'

রাণু অন্ধকারে একটা ঝাপ্সা চেহারা দেখতে পেয়ে বললে—'কিন্তু, আমি তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না!'

'দাঁড়াও, আলোটা একটু জ্বালছি।'

মিটমিটে একটা ছোট্ট কুপির মতো আলো এবার জ্বলে উঠতে রাণু ছেলেটিকে দেখতে পেলে। তার বয়সীই হবে। ছেলেটি লাজুকের মতো একটু হেসে বললে—'আমি তামসকুমার।'

'তামসকুমার!'

রাণর মনে হলো, তামসকুমারেরই যেন তার জন্যে স্টেশনে আসবার কথা।

তামসকুমারের সঙ্গে পরিচয়ও যেন তার অনেক দিনের।

শুধু এখন সব কথা মনে পড়ছে না।

আলোটা কিন্তু ইতিমধ্যে আবার নিভে গিয়েছে। আবার সেই গাঢ় অন্ধকার চারিদিকে। এ অন্ধকারে কতক্ষণ এমন ক'রে দাঁড়িয়ে থাকা যায়, কোথাও যাবার উপায় তো নেই। পথই তো চেনা যাবে না।

'তোমার আলোটা আবার নিভে গেল নাকি?'—রাণু এবার জিজ্ঞাসা করলো।

'না, নিভিয়ে দিলাম।'—বললে তামসকুমার।

'নিভিয়ে দিলে! এ আবার কি অদ্ভুত কথা! শখ ক'রে কেউ এই অন্ধকারে থাকে নাকি!' রাণু একটু বিমূঢ় হয়েই বললে—'কেন তেল নেই নাকি বাতিতে!'

'তেল? না, তেল একেবারেই নেই এমন নয়। তবে···'

তামসকুমারের কেমন যেন একটু কুণ্ঠিত ভাব।

'তবে কি?'

'কি তা তো তুমিও জান ভাই।' তামসকুমার একটু যেন ক্ষুণ্ণ হয়ে বললে।

বলে কি তামসকুমার! রাণু তো মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছে না। অথচ তার যেন বোঝা উচিত, মনের ভিতর এরকম একটা সন্দেহও হচ্ছে।

যাই হোক, বোকা বলে ধরা দিতে রাণু সহজে রাজি নয়। একটু ভারিক্কিভাবেই বললে—'তা কি আর জানি না, তবে একটু জ্বাললে দোষ কি? কেউ তো আর ধরে নিয়ে যাবে না!'

'ধরে নিয়ে যাবে না! বল কি! আর তাহলে ধরবে কিসে?'—তামসকুমার সবিস্ময়ে বলে উঠলো।

না, মাথাটা একেবারে গুলিয়ে দিয়ে ছাড়লে! আলো জ্বাললে ধরে নিয়ে যায়—এ আবার কোন্ মগের মুল্লুক! মনে যাই হোক, বাইরে নিজের চাল বজায় রাখবার জন্যে রাণু গম্ভীরভাবে বললে—'আহা ঠাট্টা করছিলাম, বুঝতে পারছ না? তবে একবার যদি আলোটা একটু জ্বালতে ভাই, একটু খুঁজে নিতাম!'

'কিছু হারিয়েছে নাকি! কি খুঁজতে চাও?' তামস উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলে।

'তেমন কিছু নয়, নিজের হাত-পাগুলো আছে কিনা একটু খুঁজে দেখতাম।'

তামস একটু হেসে বললে—'আচ্ছা এত ক'রে যখন বলছো তখন একটুখানি না হয় জ্বালছি। তবে বুঝতেই তো পারছ, যতখানি পারা যায়, তেল আজ বাঁচিয়ে রাখতে হবে সেই মুহূর্তটির জন্যে—যার যত আলো সব দরকার।'

ও বাবা! ধাঁধা যে ক্রমশ আরো ঘোরালো হয়ে উঠছে।—এ আবার কোন্ মুহূর্তের কথা বলে! যাই হোক, আলোটা তো একবার জ্বলুক। অন্ধকারে বুদ্ধিটাও যেন কেমন ভোঁতা হয়ে গেছে।

কিন্তু আলো জ্বালা আর হয়ে উঠলো না। তামসকুমার দেশলাই না চক্‌মকি-পাথর কি একটা ঠোক্‌বা মাত্র অদূরেই লোহা-বাঁধানো

জুতোর আওয়াজের সঙ্গে বাজখাঁই-গলার হাঁক শোনা গেল, 'কোন্ হ্যায়। বত্তি জ্বলাতা কোন্?'

চোখের পলক পড়তে না পড়তে তামসকুমার সেই হাঁক শুনেই রাণুকে এক হেঁচ্‌কা টান দিয়ে টেনে দৌড়।

হোঁচট খেয়ে হাত-পা ছড়ে অনেক দূরে গিয়ে যখন সে থামল তখন দু'জনেই বেশ হাঁফাচ্ছে।

'আর একটু হলেই ধরে ফেলেছিল আর কি!'—তামস হাঁফাতে হাঁফাতে বললে।

চালাক সেজে থাকা বুঝি আর চলে না। তবু কায়দা ক'রে ব্যাপারটা জানবার ফিকিরে রাণু একটু বেপরোয়াভাব দেখিয়ে বললে—'ধরে ফেলত তো ফেলত! ধরে আর করতো কি?'

'ধরে আর কি করতো!' তামসকুমার সত্যি যেন স্তম্ভিত হয়ে বললে—'তুমি কি সব ভুলে গেছ না কি? ধরলে জেলে পুরে দিত না! আমার কি আলোর লাইসেন্স আছে?'

'আলোর লাইসেন্স?'—রাণুর মুখ দিয়ে আপনা থেকেই কথাটা বেরিয়ে গেল।

'হ্যাঁ, আলোর লাইসেন্স নেবার মতো টাকা আমার কোথায়? এ তো আমার চোরাই আলো।'

রাণুর মুখ দিয়ে এবার কোনো কথা বেরুলো না। সে সত্যি তাজ্জব বনে গেছে।

তামসকুমারই আবার বললে—'শুধু আজকের জন্যে, কত কষ্টে যে এই চোরাই আলো যোগাড় করেছি কি বলব?'

'কিন্তু আজকে···' রাণু কথাটা ইচ্ছা করেই শেষ করলো না। এখনো সে একেবারে ধরা দিতে প্রস্তুত নয়।

'বাঃ, আজকেই তো শ্রাবণের অমাবস্যা—মহামহিমের অভিষেক-তিথি।'

'বাঃ, তাও তো বটে! ভুলেই গেছলাম।' নিজের মর্যাদা রাণু এখনো বাঁচাবার চেষ্টা করছে।

'সেই কথাটাই ভুলে গেছলে? তাহলে এসেছ কি করতে?' তামসকুমার বেশ যেন ক্ষুণ্ণ।

কি করতে এসেছে তা কি ছাই সে নিজেই জানে! কিন্তু এসে যখন পড়েছে ব্যাপারটা না বুঝে সে যাবে না। আপাতত কথাটা তাড়াতাড়ি চাপা দেবার জন্যে রাণু বললে—'আচ্ছা, আমারও তো চোরাই আলো একটা হলে হতো, কোথায় এখন পাওয়া যায় বল তো।'

তামস এবার উৎসাহিত হয়ে উঠল—'চোরাই আলো চাই? তা বলনি কেন এতক্ষণ? চোরাই আলোর অনেক আড্ডা আছে। তবে পুঁথি-পাড়াতে যাওয়াই সবচেয়ে সুবিধে।'

'কেন?'—রাণু সোজাসুজি এবার জিজ্ঞেস ক'রে ফেললে।

'ওদের আলো ভারি মজার। ফুঁ দিলে নেভে না, জলে ডোবালেও জেগে থাকে। আর লুকিয়ে নিয়ে বেড়াবার ভারি সুবিধে। চৌকিদাররা সহজে চিনতেই পারে না। তাছাড়া ও আলোর কখনো ক্ষয় নেই। বিনা-তেলেই যুগযুগান্ত জ্বলে। চলো, ওই পাড়াতেই যাই।'

তামস রাণুর হাত ধরে এবার এগিয়ে চলল।

দু'পাশের আবছা সব বাড়ি অমাবস্যার অন্ধকারে যেন বিভীষিকার মতো দাঁড়িয়ে আছে। কোনোটা একেবারে অন্ধকার, কোনোটার বন্ধ জানালার ভেতর দিয়ে অতি ক্ষীণ একটু আলোর রেখা যেন ভয়ে ভয়ে উঁকি দিচ্ছে।

এই অন্ধকারের ভেতর রাস্তার একটা মোড় ঘুরে হঠাৎ দূরে একটি প্রকাণ্ড উজ্জ্বল আলো-ঝলমল বাড়ি দেখে রাণু অবাক হয় গেল।

'ওটা কি?'

'বাঃ, ওটাই তো জেলখানা। এতদিনে যেখানে যে কেউ বে-আইনি আলো জ্বেলেছে, সকলের হয়ে আলো জ্বালার অধিকারের জন্যে যারা লড়াই করেছে, সবাই ওই জেলখানায় বন্দী! সারা

বছর ওরা নীরবে সব সয়ে যায়, শুধু বছরে এই একটিবার ওরা বিদ্রোহ করে। ও তো ওদের বিদ্রোহেরই আলো! দেখতে পাচ্ছ না, এরই মধ্যে জমাদারেরা সব নিভিয়ে ফেলছে। ও আলোর দিকে চাওয়াও যে অপরাধ।'

সত্যি। দেখতে দেখতে সে আলো নিভে গেল। আবার সেই জমাট অন্ধকার।

পুঁথি-পাড়ার দিকে বেশিদূর কিন্তু আর তাদের যেতে হলো না। রাস্তার ধারে হঠাৎ একটা আলো তারা কুড়িয়ে পেলো।

তামসকুমার তার হাতে আলোটা তুলে দিতে রাণু অবাক হয়ে বললে—'এ আলো এখানে এখন পড়েছিল কি ক'রে?'

'হয়তো কেউ ধরা পড়ার ভয়ে ফেলে গেছে, কিংবা কেউ হয়তো আমাদের মতো কারুর হাতে পড়বার আশাতেই এ আলো এখানে রেখে গেছে। নিজের জীবন দিয়ে কত জন এমন আলোর আয়োজন ক'রে রেখে যায় ভবিষ্যতের জন্যে।'

তামসের কথা শেষ হতে না হতেই দূরে মাঝ রাতের প্রহর বাজছে শোনা গেল। যেখানে যা সামান্য আলোর রেখা দেখা যাচ্ছিল, সব এবার একেবারে গেল নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে। সঙ্গে সঙ্গে কাছেই কোথায় অশরীরী কণ্ঠে না বেতারে, বজ্রগম্ভীর ঘোষণা শোনা গেল 'জয়, তিমিরেশ্বরের জয়! যিনি আদি, যিনি অনন্ত, সেই তিমিরেশ্বরকে আমরা প্রণাম করি।'

—'হে আমার নিশুতিপুরের ভক্ত প্রজাবৃন্দ…'

রাণু ভয়ে ভয়ে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলে—'এ আবার কি ভাই?'

এই স্বর শোনার সঙ্গে সঙ্গে তামসকুমার কি যেন হয়ে গেছে। কেমন যেন অভিভূত ভাবে সে বললে—'চুপ চুপ! মহামহিমের আহ্বান—বুঝতে পারছ না—'

রাণু হতভম্ব হয়ে একেবারে নীরব হয়ে গেল।

মহামহিম তখন বলে যাচ্ছেন: 'আমার অভিষেক-তিথির এই সাংবৎসরিক উৎসবে তিমিরেশ্বরের পদতলে দাঁড়িয়ে সেই

চিরন্তন সমাচারই আবার আমি তোমাদের জানাই।—আলোক আমাদের পরম শত্রু, আমাদের জীবনের অভিশাপ। সমস্ত অমঙ্গল, সমস্ত অশান্তি, সমস্ত বিপ্লব-বিপর্যয়ের মূল, এই আলো। যার চোখ একবার আলোর স্পর্শ পেয়েছে, সমস্ত জীবন তার অভিশপ্ত—দেহ-মন তার চিরদিনের মতো বিষাক্ত,…উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর আলোর তৃষ্ণায় জীবনে কোনোদিন সে আর শান্তি পায় না। আলোক-পিপাসার এই সংক্রামক ব্যাধি অন্যের মধ্যেও সে ছড়িয়ে দেয়।'

'আলোকের এই অমঙ্গল থেকে চিরদিন আমি তোমাদের রক্ষা ক'রে এসেছি, চিরদিন রক্ষা করব। এখনো এদেশ সম্পূর্ণ নিরালোক করা সম্ভব হয়নি—কিন্তু ভ্রান্ত, ধর্মভ্রষ্ট, সমাজদ্রোহী যে সমস্ত পাষণ্ড আলোকের মাদকতার দ্বারা ভুলিয়ে এই পরম শান্তি ও সুখের রাজ্যের ভিত্তি শিথিল করতে চায়, তাদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করতে কোনোদিন আমি ত্রুটি করি নি।—আমাদের একমাত্র উপাস্য, তিমিরেশ্বরকে প্রণাম ক'রে আবার আমি বলি: চির-স্নিগ্ধ, চির-মধুর, চির-কল্যাণময় অন্ধকার আমাদের আচ্ছাদিত ক'রে রাখুক, এ রাজ্য থেকে সমস্ত আলো চিরকালের মতো নির্বাপিত হয়ে যাক্।'

'জয় তিমিরেশ্বরের জয়।'

'জয় তিমিরেশ্বরের জয়!'—বলে হঠাৎ তামসকুমারকে তার হাতের আলোটা ফেলে দিতে দেখে রাণু অবাক হয়ে বলে উঠল,—'ওকি, করছ কি?'

তামসকুমার কাতরভাবে বলে উঠল—'না, না, আমি পাপী, আমি পাষণ্ড! হে তিমিরেশ্বর, আমার অপরাধ তুমি মার্জনা করো।'

তামসকুমার সেইখানেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আর কি! তার হাত ধরে বেশ একটা ঝাঁকুনি দিয়ে রাণু বললে—'দেখতে পাচ্ছ ওদিকে দিয়ে কারা আসছে?'

কারা আসছে? তামস যেন ঘুম থেকে জেগে উঠল। অবাক হয়ে বললে—'সত্যিই তো,' ওই তো বিদ্রোহী আলোর মিছিল চলেছে পাহাড়ের ওপর তিমিরেশ্বরের মন্দিরে। অন্ধকার যাঁর চিরদিনের আবরণ সেই অদর্শনীয় মহামহিমকে ওরা স্বচক্ষে দেখবে, নিজের মুখে তাঁকে জানাবে নিজেদের নিবেদন…'

ফেলে-দেওয়া আলোটা মাটি থেকে কুড়িয়ে সে আবার বললে—'কিছু মনে কোরো না ভাই, কিছুক্ষণ কেমন যেন বেহুঁশ হয়ে গেছলাম। মহামহিমের স্বর শুনলেই কেমন যেন আমার সমস্ত দেহমন অবশ হয়ে যায়। কিন্তু আর ভয় নেই—এই মিছিলে যোগ দিতেই তো আমরা এসেছি, চল।'

তারা কয়েক পা যেতে-না-যেতেই কিন্তু চারিদিকে ভয়ংকর কাণ্ড বেধে গেল। কোথা থেকে যমদূতের মতো বিশাল মিশ্‌কালো সব প্রহরী এসে আলোর মিছিলের ওপর নির্মমভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল সব দল। একে-একে সবাই বুঝি বন্দী হয়ে যাচ্ছে, সমস্ত আলো যাচ্ছে নিভে।

কিন্তু রাণুর শরীরের ভেতর দিয়ে যেন একটা আগুনের শিখা লাফ দিয়ে উঠল। মিছিলের একজনের হাত থেকে একটা জ্বলন্ত মশাল তুলে নিয়ে তামসকে টানতে টানতে ঝড়ের বেগে সে সমস্ত প্রহরীদের এড়িয়ে একেবারে সেই তিমিরেশ্বরের মন্দিরে গিয়ে না ওঠা পর্যন্ত থামল না।

মন্দিরের দরজা বন্ধ। কিন্তু রাণুর আর তামসকুমারের গায়ে তখন যেন শত-হস্তীর বল। দু'জনের ধাক্কায় মন্দিরের দরজা মড়-মড় ক'রে ভেঙে পড়লে। মশাল হাতে মন্দিরের ভেতর ঢুকে পড়ে এদিক-ওদিক চারিদিকে ব্যাকুলভাবে চোখ বুলিয়ে তারা অবাক। কোথায় বা তিমিরেশ্বরের মূর্তি, কোথায় বা মহামহিম! তাদের কোনো চিহ্নই নেই। শুধু কয়েকটি ধেড়ে ইঁদুর আলো দেখে সভয়ে চারিদিকে হুড়দাড় ক'রে ছুটে পালাল।

হঠাৎ একদিকে চোখ পড়তে তারা হাসবে না কাঁদবে ভেবে

পেল না। আম্‌সির মতো শুক্‌নো আর কোলা ব্যাংএর মতো ধুমসো গুটিপাঁচেক লোক একদিকে একটা চাদর মুড়ি দিয়ে কাঁপছে। তাদের কারুর হাতে একটা মুখে-দিয়ে চেঁচাবার চোঙ, কারুর হাতে পুজোর ঘণ্টা, কারুর বা বাটখারা, কারুর বা শ্যামলা, কারুর মাথায় ঝলমলে জরীর পাগড়ি। রাণু আর তামসকে এগিয়ে আসতে দেখে তারা কাঁপতে-কাঁপতে চাদর সরিয়ে বেরিয়ে এসে কাঁদ-কাঁদ মুখে বললে—'দোহাই বাবা, আমাদের প্রাণে মেরো না। তোমরা যত খুশি আলো জ্বালো, আর আমরা কিছু বলব না। কেনা-দামে যত তেল লাগে তোমাদের বিক্রি ক'রে দেব।'

কথা শুনে রাণু আর তামস তো এবার থ। 'ওঃ, তোমরাই তাহলে এতদিন ফাঁকি দিয়ে আমাদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে এসেছ! আচ্ছা, দাঁড়াও!'

কিন্তু সে কিছু করবার আগেই যমদূতের মতো সেই প্রহরীরা মন্দিরের ভেতর ঢুকে পড়ে তাদের জাপটে ধরলো। একজন রাণুর হাত থেকে মশলাটা কেড়ে নিয়ে মন্দিরের জানালা দিয়ে নিচে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। অন্যেরা তখন পিছ মোড়া ক'রে তাদের বাঁধছে।···

রাণু প্রাণ-পণে তাদের হাত ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে চিৎকার ক'রে উঠল—'বুজরুকি, তোমাদের সব বুজরুকি আমি ফাঁস করে দেব।'

হঠাৎ নিচে থেকে তাকে নাড়া দিয়ে মামাবাবু বললেন—'আরে পড়ে যাবি যে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কার সঙ্গে কুস্তি করছিস?'

রাণু ধড়মড় করে ওপরের বাঙ্কে উঠে বসল। আরে কোথায় নিশুতিপুর, কোথায় তিমিরেশ্বর, আর কোথায় মহামহিম। সে তো মামাবাবুর সঙ্গে রাতের ট্রেনে মধুপুর যাচ্ছে।

কিন্তু নিচে ডানদিকের বেঞ্চিতে ওই চিম্‌সে রোগা আর ধুমসো মোটা লোক দুটিকে চেনা-চেনা লাগছে না?

তিমিরেশ্বরের মন্দিরে এদেরই দেখেছিল না কি?

কলকাতার গলিতে



বিশ্বনাথ পাড়াগাঁয়ের ছেলে।

ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকারে দুপুর-রাতে বাঁশবনের ভেতর দিয়ে সে তিন-ক্রোশ অনায়াসে বেড়িয়ে আসতে পারে। অমাবস্যায় গ্রামের সীমানার শ্মশান থেকে মড়াপোড়ানো কাঠ সে কতবার বাজি ধরে নিয়ে এসেছে ; কিন্তু ভয় তার শুধু কলকাতা শহরকে।

যেখানে দু'পা এগুতে হলে মানুষের গায়ে ধাক্কা লাগে, ইলেক্‌ট্রিক আর গ্যাসলাইটের কল্যাণে যেখানে দিন কি রাত চেনবার জো নেই বললেই হয়, সেইখানেই একরাতে সে যা বিপদে পড়েছিল, তা জীবনে ভোলবার নয়।

বিশ্বনাথ বলে—'না, কলকাতা শহরে সন্ধ্যার পর বেরোনো নিরাপদ নয়।'

আমরা হেসে উঠলে বলে—'না হে না, চৌরঙ্গী, সেণ্ট্রাল-অ্যাভেনিউ-এর কথা বলছি না। কলকাতাটা আগাগোড়া চৌরঙ্গী নয়। শোনো তাহলে—'

সেবার গাঁয়ের লাইব্রেরির জন্যে বই কিনতে কলকাতা গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, একদিন থেকেই বইপত্র সব কিনে রাতের ট্রেনেই বাড়ি চলে আসবো ; কিন্তু কলকাতায় গেলে নতুন বায়স্কোপ-থিয়েটার না দেখে কেমন ক'রে ফেরা যায়। প্রথম দিনটা তাতেই কেটে গেল। দ্বিতীয় দিনে কলেজ স্ট্রিটে গিয়ে বই-টই সব কিনে ফেললাম। সঙ্গে বিছানা-পত্র বা তোরঙ্গ-বাক্সর ঝঞ্ঝাট ছিল না। শুধু একটিমাত্র স্যুটকেশ, তাতে বইগুলো ভরে একেবারে সোজা শেয়ালদা স্টেশনে গিয়ে উঠলেই হতো।

কিন্তু হঠাৎ কি খেয়াল হলো, একবার অবিনাশের সঙ্গে দেখা ক'রে যাই।

অবিনাশ আমাদের গ্রামের ছেলে। ইস্কুলে আমার সঙ্গেই পড়া-শুনা করেছে। কলেজেও কয়েক বছর আমরা একসঙ্গে পড়েছিলাম। অবিনাশ বেশিদিন অবশ্য কলেজে থাকে নি। অত্যন্ত খেয়ালী ছেলে —কোনো কাজে বেশিদিন লেগে থাকবার মতো ধৈর্য তার ছিল না। ছেলেবেলা থেকেই কেমন যেন তার উড়ু উড়ু ভাব। বাড়ি থেকে যে কতবার সে ছেলেবেলায় পালিয়ে গেছে, তার ঠিক-ঠিকানা নেই। বড় হয়েও তার সে স্বভাব যায় নি। কথা নেই, বার্তা নেই, হঠাৎ একদিন হয়তো শুনলাম, অবিনাশ হেঁটে সেতুবন্ধ যাওয়ার জন্যে বেরিয়ে পড়েছে। তারপর হয়তো দু'মাস তার দেখা নেই। আমরা কোনোরকমে প্রক্সি দিয়ে হয়তো সেবার তার কলেজের খাতায় কামাই-এর সংখ্যা কমিয়ে রাখলাম ; কিন্তু এমন ক'রেই বা কতদিন রাখা যায়? বছরের শেষে এগ্‌জামিনেশনের সময়ে দেখা গেল, অবিনাশ আমাদের প্রক্সি দেওয়া সত্ত্বেও কলেজে এত কমদিন এসেছে যে, তার পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি পাওয়া অসম্ভব। আমরা দুঃখিত হলাম। ছেলেটা এত আমুদে—এত মিশুক ছিল যে, আমরা সবাই তাকে ভালোবাসতাম; কিন্তু অবিনাশের যেন স্ফূর্তিই হলো। বললে—'তবে আর কি? বর্মাটা একবার ঘুরে আসি ভাই!' তারপর অবিনাশের আর দেখা নেই! আমাদের থেকে তার ধাতই ছিল আলাদা।

পৃথিবীটা যে মস্ত বড়, এই আনন্দেই তার মন ভরপুর হয়ে থাকতো। পৃথিবীর এই বিশালতাকে দেশে-দেশে নতুন পথে ঘুরে ঘুরে উপভোগ ক'রে তার আশ আর মিটতে চাইতো না। যে-সব দেশ সে এখনো দেখে নি, তার আকর্ষণের কথা সে মাঝে মাঝে এমন তন্ময় হয়ে বলতো যে, আমাদেরও কখনো কখনো মোহ ধরে যেত—কেমন যেন মনে হতো, এই ছোট্টো শহরের ছোট্টো জানা ক'টি রাস্তায় ছ'বেলা যাওয়া-আসায় জীবনের কোনো সার্থকতাই নেই—পথ যেখানে অফুরন্ত, আকাশের যেখানে কূল-কিনারা নেই, এমন জায়গায় বুক ভরে বড় ক'রে নিঃশ্বাস নিতে না পারলে যেন বাঁচাই বৃথা।

আমাদের এই ক্ষণিক মোহ অবশ্য খানিক বাদেই কেটে যেত, কিন্তু অবিনাশের এই মোহই ছিল সব।

মাস-তিনেক আগে আমার গ্রামের ঠিকানায় এই অবিনাশেরই একটা চিঠি পেয়েছিলাম বহুদিন বাদে। একটা গলির ঠিকানা দিয়ে লিখেছিল যে, অনেক জায়গা ঘুরে-ফিরে সে কলকাতার এই ঠিকানায় আপাতত আছে। আমি এসে তার সঙ্গে যেন দেখা করি। এতদিন বাদে তাকে সেই ঠিকানায় পাওয়া হয়তো যাবে না জেনেও একবার যেতে ইচ্ছে হলো।

বাড়ির নম্বরটা ভুলে গিয়েছিলাম, কিন্তু গলিটার নাম মনে ছিল। ভাবলাম, কলেজ স্ট্রীট থেকে বেশি দূর হবে না। ট্রেনেরও এখন দেরি আছে। একবার দেখা করেই যাই, যদি তাকে পাওয়া যায়।

একটু খোঁজাখুঁজির পর—একটা গলি-রাস্তায় ঢুকে একজনকে জিজ্ঞেস ক'রে জানলাম যে, আর একটু গেলেই অবিনাশ যে গলিতে থাকে, তা পাওয়া যাবে।

রাত তখন বেশি নয়। বড়জোর আটটা হবে ; কিন্তু গলি দিয়ে খানিক দূর হেঁটেই একটু আশ্চর্য হয়ে গেলাম। গলিই হোক, আর যাই হোক, কলকাতার পথ তো বটে। অথচ এই আটটা-রাতে সেখানে একটা জন-প্রাণীও নেই।

ভেবেছিলাম, খানিকদূর গিয়ে আবার কাউকে পথের কথা জিজ্ঞেস করব; কিন্তু লোক কোথায়? তা ছাড়া গলিটাও যেন ফুরোতে চায় না।

একবার সন্দেহ হলো, হয়তো ভুল-পথে এসেছি; কিন্তু যে লোকটা আমায় খবর দিয়েছে, আমায় ভুল-পথ দেখিয়ে তার লাভ কি? নির্জন রাস্তায় চুরি-ডাকাতি? কিন্তু আমার কাছে কি-এমন লাখ-পঞ্চাশ টাকা আছে যে, চোরদের ষড়যন্ত্র করতে হবে? আমার সাজপোশাক দেখেও বড়লোক বলে ভুল করবার কোনো সম্ভাবনাও নেই! তবে?

আরো খানিকটা এমনি ক'রে এগিয়ে গেলাম। পথ তেমনি নির্জন! বাতিগুলোও এ-পথের মিট্‌মিট্ ক'রে জ্বলে সেই নির্জনতা যেন আরো বাড়িয়ে তুলেছে। একে গ্যাসপোস্টগুলো অত্যন্ত দূরে দূরে; তার ওপর কি কারণে জানি না, আলো তাদের এত ক্ষীণ যে, রাস্তায় আলো হওয়া দূরের কথা, সেগুলো যে জ্বলছে, এইটুকুও বুঝতে কষ্ট হয়।

খাস কলকাতার ভেতর এমন রাস্তা যে আছে, কে তা জানতো! দু'পাশের বাড়িগুলো যেন মান্ধাতার আমলের তৈরি। কোনোরকমে হাড়-বেরোনো ইট-কাঠের জীর্ণ দেওয়ালগুলো দাঁড়িয়ে আছে। না আছে কোনো বাড়িতে একটা আলো, না জন-মনিষ্যির একটা শব্দ। সে-রাস্তার বাড়িগুলো সারের পর সার পোড়োবাড়ির মতো খাঁ খাঁ করছে।

ক্রমশ মনে হলো, কেমন যেন একটা ভ্যাপ্‌সা গন্ধ নাকে আসছে। বহুদিন আলো-বাতাস যেখানে ঢোকে নি, মানুষের বাস যেখানে বহুদিন ধরে নেই, এমনি ঘরে ঢুকলে যেমন গন্ধ পাওয়া যায়, গলিটার ভেতর ঠিক সেইরকম একটা গন্ধ পাচ্ছিলাম।

লোকটা বলেছিল, কিছু দূর গেলেই ডাইনে গলি পাওয়া যাবে; কিন্তু জন-মানবহীন জীর্ণবাড়ির সারের ভেতর ডাইনে কি বাঁয়ে—কোথাও কোনো পথ নেই।

সামনের পথও খানিকদূর গিয়ে দেখলাম বন্ধ। যে-পথে ঢুকেছি, গলিটার ওই একটিমাত্রই তাহলে বেরোবার রাস্তা। আশ্চর্য ব্যাপার! লোকটা মিছিমিছি আমায় ভুল-পথ দেখালে কেন?

সেখান থেকে ফিরলাম। গলিটা যেন আরো অন্ধকার মনে হচ্ছিল। এতক্ষণ যে গ্যাসগুলো মিট্‌মিট্‌ ক'রে জ্বলছিল, তারই ক'টা একেবারে নিভে গেছে দেখলাম। মনে হলো, এ-গলি থেকে বেরুতে পারলে বাঁচি। ভীতু আমি নই কস্মিন্ কালে, কিন্তু কলকাতা শহরের ভেতর এমন অভাবনীয় ব্যাপার দেখে গা-টা কেমন যেন ছম্ ছম্ করছিল।

সবে তো প্রথম রাত! কলকাতা শহরের সমস্ত রাস্তা এখনি লোকজনে, গাড়ি-ঘোড়ায়, মানুষের শব্দে গম্ গম্ করছে; অথচ এই পথটা কেমন ক'রে এমন নির্জন—নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

মনে হলো, আমি যেন বহুকালের প্রাচীন একটা শহরে এসে পড়েছি। সে শহরের লোকজন বহুকাল আগে বাড়ি-ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেছে। কত বছর যে মানুষের পা সে শহরে পড়ে নি, কেউ যেন তা জানে না। আমি যেন প্রথম সে-শহরের নিস্তব্ধতা ভাঙ্‌লাম।

খট্‌ খট্‌ খট্‌—আমার নিজের পায়ের শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ কোথাও নেই। সে-শব্দ অদ্ভুতভাবে নির্জন অন্ধকারে বাড়িগুলোর দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। আমার চোখের ওপরই রাস্তার ক'টা বাতি দপ্ দপ্ ক'রে নিভে গেল। ভ্যাপ্‌সা গন্ধটা ক্রমশ যেন বেড়ে গিয়ে অসহ্য মনে হচ্ছিল। নাঃ, এ-গলি থেকে যত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়তে পারি, ততই মঙ্গল! কাজ নেই আর অবিনাশের খোঁজ ক'রে। পরে একদিন আবার আসলেই হবে।

খানিকদূর গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে পড়লাম। এদিকেও যে গলির পথ বন্ধ; কিন্তু তা কেমন ক'রে হতে পারে? আমি একটা পথে যে গলিতে ঢুকেছি এ-বিষয়ে তো কোনো সন্দেহ নেই। এ-গলি দিয়ে এগোবার সময়ে আশেপাশে কোনো পথই তো দেখতে পাই নি। তাহলে গলির দু'মুখ বন্ধ হয় কেমন ক'রে?

ভাবলাম, হয়তো আরো একটা পথ ছিল। যাওয়ার সময় আমার দৃষ্টি কোনোরকমে এড়িয়ে গেছে, এখন আসবার সময় ভুল ক'রে সেইটেতেই হয়তো ঢুকে পড়েছি। সেইটেরই মুখ এখানে বন্ধ; কিন্তু এরকম ভুলই বা হবে কেমন ক'রে? আমি তো অন্যমনস্ক হয়ে ছিলাম না। আগাগোড়াই তো সজাগ হয়ে চলেছি। রাস্তায় লোক না থাক, একটা বাড়িতেও যদি একটা আলো দেখা যেত, তাহলে না হয় ডেকেই জিজ্ঞেস করতাম।

যাই হোক, এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কোনো লাভ নেই জেনে আমি আবার ফিরলাম। গলি থেকে বেরুতে আমায় হবেই। আবার সেই নির্জন অন্ধকার গলি দিয়ে শুধু নিজের পায়ের শব্দ শুনতে শুনতে এগিয়ে চললাম। গলিটা যেন ক্রমশ দীর্ঘই হয়ে চলেছে। আমার অজান্তে কে যেন ইতিমধ্যে সেটা বাড়িয়ে আরো লম্বা ক'রে দিয়েছে।

এবারেও যখন দেখলাম, গলির মুখটা বন্ধ, তখন সত্যিই বুকের ভেতরটা যেন কেমন ক'রে উঠল। একে আমরা পাড়াগাঁয়ের লোক —ফাঁকা আকাশ, ফাঁকা মাঠের মধ্যে মানুষ হয়েছি; শহরে এলে অম্‌নিই আমাদের হাঁফ ধরে; তার ওপর এই ভ্যাপ্‌সা-গন্ধভরা অন্ধকার গলি—চারিদিক থেকে সে যেন জেলখানার মতো আমাকে বন্দী ক'রে ফেলবার ষড়যন্ত্র করেছে। ওপরে চেয়ে যে একটু আকাশ দেখতে পাবো, তারও যো নেই। এমন একটা ধোঁয়াটে কুয়াশায় বাতাস আচ্ছন্ন হয়ে আছে যে, তার ভেতর দিয়ে একটা তারাও দেখা যায় না।

যতই এই অদ্ভুত ব্যাপারটার কথা ভাবছিলাম, মাথাটা ততই গুলিয়ে আসছিল। কি করব, কিছুই ভেবে পাচ্ছিলাম না। সুটকেশটা বইয়ের ভারে বেশ ভারিই ছিল। সেটা বয়ে বেশ ক্লান্তই নিজেকে মনে হচ্ছিল। এমনি ক'রে আর খানিকক্ষণ ঘুরতে হলে ক্লান্তিতেই তো বসে পড়তে হবে।

হঠাৎ বুকটা ধড়াস্‌ ক'রে উঠল। দূরে একটা মিট্‌মিটে বাতির তলায় একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে না! তাড়াতাড়ি সেইদিকে এগিয়ে

গেলাম—এই তো আমাদের অবিনাশ! এতক্ষণের ভয়-ভাবনা নিমেষে ভুলে গেলাম।

আনন্দে চিৎকার ক'রে তার নাম ধরে ডাকতেই সে চম্‌কে ফিরে তাকালো। বললাম—'কি আশ্চর্য! তোর খোঁজ করতেই প্রায় একঘণ্টা এই গলির ভেতর ঘুরে হয়রান হচ্ছি যে। বাব্বাঃ! কি অদ্ভুত গলিতে থাকিস্ তুই! ঢুকে আর বেরোনো যায় না!'

অবিনাশ একটু হেসে বললে—'এসেছিস্ তাহলে ঠিক?'

বললাম—'এসেছি আর কই! তোর দেখা না পেলে এই গলির ভেতর তোর বাড়ি কি খুঁজে বার করতে পারতাম!'

সে-কথার কোনো উত্তর না দিয়ে অবিনাশ বললে—'আমায় তাহলে তোর মনে আছে ভাই!'

'মনে থাকবে না কেন রে?'

'না ভাই, মনে থাকে না! অথচ মানুষ যেটুকু মনে ক'রে রাখে, তার ভেতরেই আমরা বেঁচে থাকি!'

আমি হেসে বললাম—'ছিলি তো ভূপর্যটক, আবার দার্শনিক হলি কবে থেকে? যাক, এখন তোর বাড়ি চল্ দেখি। তোর সব গল্প শুনতে চাই।'

অবিনাশ কেমন যেন একটু নিরুৎসাহ হয়ে বললে—'আমার বাড়ি! আচ্ছা চল্। আমার চিঠি পেয়েছিলি?'

'হ্যাঁ, সে তো তিনমাস আগে।'

'তোর জন্যে কতদিন অপেক্ষা করেছিলাম। তারপর আবার বেরিয়ে পড়েছিলাম।'

'আবার? তাহলে ফির্‌লি কবে?'

অন্যমনস্কভাবে অবিনাশ বললে—'এই আজ।'

'এই আজ? এবারে গেছিলি কোথায়?'

'বল্‌ছি, চল্।'

সেই নির্জন গলি দিয়েই আমরা এগিয়ে চলেছি; কিন্তু আর তখন আগের কথা কিছুমাত্র মনে ছিল না।

অবিনাশ বলতে লাগল—'এবারে ভাই গেছলাম বহুদূর। খিদিরপুরের ডকে বেড়াতে বেড়াতে একদিন সুন্দর একটি জাহাজ দেখলাম। সুন্দর বলতে নতুন মনে করিস্‌নি যেন। জাহাজটা অনেক পুরোনো। নোনা-জল লেগে লেগে তার গায়ের রঙ্‌ চটে গেছে। মাস্তুলগুলো বহুদিনের পুরোনো। চিম্‌নিগুলো ধোঁয়ায় কালো হয়ে গেছে। আগাগোড়া জাহাজটা দেখলেই মনে হয়, বহুকাল ধরে পৃথিবীর কত সমুদ্রে সে যেন পাড়ি দিয়ে ঝুনো হয়ে গেছে। তার চেহারাতেই কেমন যেন একটা ভবঘুরে রুক্ষু রুক্ষু ভাব। সেইটেই তার সৌন্দর্য। তার ওপর যখন শুনলাম যে, এখান থেকে মাল নিয়ে যাবে যবদ্বীপে, তখন আর লোভ সামলাতে পারলাম না।

যবদ্বীপ! নারকেল আর তালগাছের সার তার তীর পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে সমুদ্রকে অভ্যর্থনা করতে। বাতাসে তার জঙ্গলের মশলা-গাছের গন্ধ! তার ওপর গভীর বনের মাঝে তার বোরোবুদুর!

একেবারে মেতে উঠলাম; যেমন ক'রে হোক যেতেই হবে এই জাহাজে। জাহাজের ভাড়া দেওয়ার মতো পয়সা নেই! অনেক কষ্টে জাহাজের হেড্‌খালাসিকে খোঁজ ক'রে তার সঙ্গে ভাব ক'রে, তাকে কিছু ঘুষ দিয়ে লুকিয়ে যাওয়ার বন্দোবস্ত করলাম। জাহাজের একধারে বিপদের সময় ব্যবহার করবার জন্যে তের্‌পল-ঢাকা ছোট ছোট বোট টাঙানো থাকে। ঠিক হলো, তারই একটার ভেতর আমি থাকবো। কেউ তাহলে টের পাবে না। হেড্‌খালাসি কোনো এক সময়ে লুকিয়ে এসে আমায় খাবার দিয়ে যাবে।

গভীর-রাতে জাহাজে চড়ে সেই বোটের ভেতরে গিয়ে হেড্‌-খালাসির নির্দেশমতো লুকিয়ে রইলাম। ভোর হওয়ার আগে জাহাজ ছেড়ে দিলে।

তারপর ক'দিন 'কি অদ্ভুতভাবেই না কাটিয়েছি! সারাদিন তার ভেতর লুকিয়ে থাকি—তের্‌পল একটু ফাঁক ক'রে আকাশ দেখি, আর জাহাজের শব্দ শুনি। গভীর-রাতে যখন সব নির্জন হয়ে যায়, জাহাজের খোলে ক'জন ইঞ্জিনিয়ার ও ফায়ারম্যান এবং ওপরে

হাল-ঘোরাবার হুইলে একজন নাবিক ছাড়া যখন আর কেউ থাকে না, তখন একবার ক'রে বেরিয়ে নির্জন ডেকের একটি কোণে রেলিং ধরে দাঁড়াই।

এমনি ক'রে ক'দিন বাদে যাভায় এসে পৌঁছোলাম। আগে ঠিক ছিল—সবাই নেমে গেলে কোনো এক সময়ে হেড্‌খালাসি এসে আমার নামবার ব্যবস্থা ক'রে দেবে ; কিন্তু বন্দরে জাহাজ ভেড়বার আগের রাতে সে এসে আমায় জানিয়ে গেল যে, তা হওয়ার উপায় নেই। এখানে মাল নামানো হয়ে গেলেই জাহাজটাকে সটান ড্রাই-ডকে রঙ্‌ করবার জন্যে পাঠানো হবে, ঠিক হয়েছে। সুতরাং সেভাবে নামা যাবে না।

তাহলে উপায় ? হেড্‌খালাসি বললে যে, উপায় আছে। সবাই যখন জাহাজ ভেড়বার সময় যে-যার কাজে ব্যস্ত থাকবে, তখন যদি আমি জাহাজ থেকে জলে পড়ে একটুখানি সাঁতরে যেতে পারি, তাহলেই হয়। তাতেই রাজি হলাম।

জাহাজ জেটিতে লাগবার আয়োজন চলছে, এমন সময় সন্তর্পণে আমি বোটের ঢাক্‌নি সরিয়ে নেমে পড়লাম। পুঁট্‌লিটা আমার পিঠেই বাঁধা ছিল। রেলিঙের ধারে গিয়ে জেটির উল্টোদিকে ঝাঁপ দিতে আর কতক্ষণ! কেউ দেখতেও পেল না।

ঝাঁপ দিয়ে পড়লাম ঠিক, কিন্তু সেই মুহূর্তে জাহাজটা জেটিতে ভেড়বার জন্যে পাশে সরতে আরম্ভ করলো। জাহাজের বিশাল প্যাড্‌লের ঘায়ে জল তোলপাড় হয়ে উঠল, কি ভীষণ তার টান! প্রাণপণেও আমি সে টান ছাড়িয়ে আসতে পারলাম না, সেই ঘূর্ণ্যমান ভয়ংকর প্যাড্‌লের দিকে তলিয়ে গেলাম।'

আমি শিউরে উঠে বললাম—'তারপর ?'

'তারপর সেই প্যাড্‌লের ঘা! কি ভয়ংকর লেগেছে দেখবি।'

সামনে একটা গ্যাসের বাতি তখনো জ্বলছিল। অবিনাশ তার জামাটা তুলে দেখালে।

একি! জামার নিচে যে কিছুই নেই—একেবারে ফাঁকা, শূন্য।

ভালো ক'রে আবার চেয়ে দেখলাম—দেহ নেই, কিছু নেই : ওধারের গ্যাসপোস্টটা সে-জামার তলা দিয়ে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। উপরের দিকে চাইলাম। সেখানে অবিনাশের মাথা নেই—শূন্য, শূন্য—সব শূন্য !

অস্ফুট চিৎকার ক'রে সুটকেশ-হাতে আমি দৌড়তে শুরু করলাম ; কিন্তু কোথায় যাব ? সেদিকে যাই, নির্জন গলির মুখ বন্ধ। চিৎকার ক'রে একটা পোড়োবাড়ির দরজায় ঘা দিলাম। তার ভেতরের দরজা-জানালাগুলো পর্যন্ত সে-আঘাতের প্রতিধ্বনিতে ঝন্ ঝন্ ক'রে উঠল ; কিন্তু কারোর সাড়া নেই। অন্ধকার গলি—মনে হলো—আমার চারিধারে সংকীর্ণ হ'য়ে আসছে। অসহ্য তার ভ্যাপ্সা গন্ধ। তারপরে আমার আর মনে নেই।

জ্ঞান যখন হলো, তখন দেখি, কে একজন আমায় বলছে—'উৎরিয়ে বাবু, ইয়ে শিয়ালদা ইষ্টিশন হ্যায়।'

শেয়ালদা স্টেশন ! অবাক হয়ে দেখি—আমি আমার সুটকেশ-সমেত একটা রিক্‌শ'য় বসে আছি। সামনে শিয়ালদা স্টেশন।

নেমে পড়ে তার ভাড়া চুকিয়ে দিলাম ; কিন্তু কখন, কেমন ক'রে যে আমি রিক্‌শ'য় উঠেছি, কিছুই মনে করতে পারলাম না।

হ্যাঁ, তারপর খোঁজ নিয়ে জেনেছি, অবিনাশ দু'মাস আগে যাভার বন্দরে অমনি করেই মারা গেছিল।

চড়ুই পাখিরা কোথায় যায় ?



বলতে পার, চড়ুই পাখিরা কোথায় যায় ?

তারা তো মরে না। ছোটবেলা দু'-একটা বাচ্চা কখনো-কখনো বাসা থেকে গড়িয়ে পড়ে, কিন্তু বড় চড়ুই পাখিকে মরতে দেখেছ কেউ কি ?

মানুষকে তারা ভালোবাসে। একদিন সব পাখিই হয়তো বাসতো। কিন্তু আমাদের চালচলন, স্বভাব-চরিত্র দেখে হতাশ হয়ে সবাই আমাদের ছেড়ে গেছে ! শুধু চড়ুই পাখিরা আজও আছে আমাদের সঙ্গে। আমাদের উঠোন, দালান-ঘর-দোরে তারা সারাদিন খেলা করে, আমাদের ছাদের কড়িকাঠের ফোকরে বাসা বেঁধে রাতে তারা ঘুমোয়। তাদের ভাষা আমরা বুঝি না, নইলে সারাদিন তারা কিচির-মিচির ক'রে আমাদের কথাই যে বেশির ভাগ বলে, আমরা জানতে পারতাম।

চড়ুই পাখিরা সবাইকে ভালোবাসে, কিন্তু এক-একটি চড়ুই-এর এক-একটি বিশেষ আদরের ছেলেমেয়ে থাকে। সে তার একেবারে আপনার। তাকে নিয়েই তার জীবন।

· দু'টো চড়ুই যখন ঝটাপটি ক'রে ঝগড়া করছে মনে হয়, তখন হয়তো তোমাদের কথা নিয়েই তাদের তর্ক বেধেছে।

কালো ঠোঁটওয়ালা ঐ ডাগর পাখিটা হয়তো ঘাড়ের রোঁয়া-ফোলানো অন্য চড়ুইকে বলেছে, তোমার কুট্টুস বড় হিংসুক, অতগুলো লজেঞ্চ কিনে এনে দিদিকে একটা দিতে চায় না।

এই না শুনেই ও-চড়ুইয়ের ঘাড়ের রোঁয়া উঠেছে ফুলে,—আমার কুট্টুস হিংসুক! সেদিন রাস্তা থেকে আইসক্রীম কিনে কে ছুটতে ছুটতে এসেছিল দিদিকে ভাগ দেবার জন্য?

কিন্তু আজ? আজ বুঝি দিদিকে একটা লজেঞ্চ দেওয়া যায় না?

যাবে না কেন? কিন্তু কুট্টুসের বুঝি রাগ হতে নেই। সকাল-বেলায় দিদি ওকে অমন বকুনি খাওয়ালো কেন? বাবার চশমাটা চোখে দিয়ে না হয় একটু বড় হতেই চেয়েছিল। ভেঙে তো আর ফেলে নি!

কুট্টুস আর দিদির ভাব হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও ঝগড়া অবশ্য মিটে যায়। কিচির-মিচির করতে করতে তারা কলতলায় উড়ে যায় চাল ধোওয়ার তদারক করতে।

যে-সব চালগুলো ধুতে গিয়ে পড়ে যায়, সেগুলো তো আর নষ্ট হতে দেওয়া যায় না!

যতদিন পারে চড়ুইরা এমনি ক'রে মানুষের সুখদুঃখের ভাগ নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে থাকে। কিন্তু এখানকার মেয়াদ তাদেরও একদিন ফুরোয়। তখন তারা কোথায় যায়? কেউ তা জানে না।

আমাদের কুট্টুস সকলকে জিজ্ঞাসা করেছে। কেউ ঠিক ক'রে কিছু বলতে পারে না।

ঠাকুরমা হেসে বলেছেন, জানি না বাপু, এমন অনাছিষ্টি কথাও কখনো শুনি নি। নিজে এখন কোথায় যাবো তারই ঠিক নেই, চড়ুই পাখিরা কোন্ চুলোয় যায় তার ঠিকানা বার করতে হবে!

মা বলছেন, কোথায় যাবে আবার? স্বর্গে যায়।

কিন্তু কোথায় সেই চড়ুই পাখিদের স্বর্গ···কেমন ক'রে তারা সেখানে যায়?

দিদি বলেছে, জানিস না? রাত হলে ওরা সব জোনাকি হয়ে উড়ে যায়। কথাটা মন্দ নয়, কিন্তু জোনাকি হয়ে যেতে কেউ তো ওদের দেখে নি।

মাস্টারমশাই বলেছেন, এসব বাজে কথা। কোথায় আবার যাবে। রাস্তায় ঘাটে মরে পড়ে থাকে, কাকে-চিলে নিয়ে যায়।

কথাটা কুটুসের মোটেই পছন্দ হয় নি। রাস্তায় ঘাটে মরা চড়ুই সে তো কখনো দেখে নি!

বাবা বলেছেন হেসে, চড়ুই পাখিরা কোথায় যায়? নিজেই একদিন দেখো না, তাহলেই জানতে পারবে।

কুটুস তাই নিজেই দেখবে ঠিক করেছে। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি সে দিন এসে পড়বে কে জানতো! সেদিন রাত্রে সেই রোঁয়া-ফোলানো চড়ুইটা কিছুতেই আর বাসায় যেতে চায় না। কুটুস জানে, সন্ধ্যে হতে-না-হতে রান্নাঘরের চালের ওপর শেষ মজলিস সাঙ্গ ক'রে তারা যে যার বাসায় গিয়ে ঢোকে। আজ কিন্তু পড়াশুনো খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে সে শুতে যাচ্ছে, এমন সময় শুনল মা বলছেন, দেখেছ পাখিটার কাণ্ড! হতভাগা বাসায় না গিয়ে মরতে এখানে বসে আছে কেন?

সত্যিই সেই রোঁয়া-ফোলানো চড়ুইটা তার ঘরের ইলেকট্রিক ফ্যানের ওপর ডানা গুটিয়ে কুঁকড়ে-মুঁকড়ে বসে আছে চুপ ক'রে।

কুটুসের মশারি ফেলে দেবার জন্য মা ঘরে এসে আলোটা জ্বালতেই পাখিটা একবার চমকে উঠে ফরফর ক'রে এদিক-ওদিক খানিক উড়ে বেড়ালো। তারপর আবার বসল সেই পাখার ওপর।

মা বললেন, আচ্ছা মুশকিল তো রে বাপু! এখুনি পাখা চালালে হতভাগা তো এদিকে-সেদিকে যেখানে হোক বসে শেষ পর্যন্ত বেড়ালের পেটে যাবে!

কুট্টুস তাড়াতাড়ি বলে উঠল, আজ আর পাখা চালিও না মা, আমার একটুও গরম লাগছে না।

মা হেসে বললেন, দূর, তা কি হয়! তারপর পাখিটাকে বাসায় পাঠাবার কত চেষ্টাই তিনি করলেন। কিন্তু সে ঘুরে-ফিরে সেই পাখায় এসে বসবেই। কিছুতেই বাসায় যাবে না।

কুট্টুস হতাশ হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, কেন আজ বাসায় যাচ্ছে না মা?

কেন আর! মরণ ঘনিয়ে এসেছে বোধ হয়! বলে পাখিটার ওপর রাগ করেই মশারি ফেলে দিয়ে চলে গেলেন।

কুট্টুসের কিন্তু ঘুম আর আসে না। সত্যিই কি পাখিটার মরণ ঘনিয়ে এসেছে! আজ তাহলে সে, সব চড়ুই পাখিরা যেখানে যায় সেইখানে যাবে? না, কিছুতেই আজ ঘুমোনো হবে না। আজ তাকে দেখতেই হবে, চড়ুই পাখিরা কোথায় যায়!

একটু একটু ক'রে অনেক রাত হলো। দূরের রাস্তায় ট্রামের শব্দ অনেকক্ষণ গেছে থেমে। কোথায় একটা ঝিঁঝি পোকা ডাকছে—ডাক নয়, সে যেন ঘুমপাড়ানি সুর। আকাশ থেকে ঝিম ঝিম ক'রে ঘুম নেমে আসছে।

কিন্তু কুট্টুস কিছুতেই ঘুমোবে না—কিছুতেই না। বিছানায় সে উঠে বসল। বাঃ ঘরটায় আর অন্ধকার নেই। এরই মধ্যে আলো জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে কে!

সে উঠে বসতেই চড়ুই পাখিটা পাখার ওপর থেকে বলে উঠল, কী কুট্টুস!

আশ্চর্য। চড়ুই-এর কথা সে বুঝতে পারছে নাকি! চড়ুই সত্যিই তার নাম ধরে ডেকেছে! অবাক হয়ে তার দিকে চোখ তুলে তাকাতে আর কোনো সন্দেহ রইল না। চড়ুই বললে, আজ আমি চললাম ভাই। ভালোই হলো, যাবার সময় তোমার সঙ্গে কথা বলে গেলাম। কতদিন তোমার কাছে-কাছে থেকে কত কথা বলেছি, তুমি তো বুঝতে পার নি!

তুমি আজ সত্যিই যাবে? কুটুসের চোখ তখন ছল্ ছল্ করছে।

চড়ুই বললে, যেতেই হবে যে ভাই! যতদিন তুমি খুব ছোট ছিলে, ততদিন তোমার জন্যই এখানে ছিলাম। এবার আমার এখানকার মেয়াদ ফুরিয়েছে।

কোথায় তুমি যাবে, আমার বড় দেখতে ইচ্ছে করে। নিয়ে যাবে আমায়?

যাবে তুমি? কিন্তু সে যে অনেক দূর!

তা হোক, আমায় নিয়ে যেতেই হবে।

বেশ, তাহলে তৈরি হয়ে থাকো। আর বেশি দেরি নেই।

দেরি নেই শুনে কুটুসের বুকটা উৎসাহে উত্তেজনায় কেঁপে উঠল। কিন্তু তৈরি হয়ে থাকবে কি ক'রে সে তো জানে না। সে ভাবনা অবশ্য আর বেশিক্ষণ ভাবতে হলো না। দেখতে দেখতে হালকা একটা সাদা মেঘ জানলা দিয়ে ঘরের ভেতর নেমে এল। চারিদিক আবছা হয়ে গেল কুয়াসার পর্দায়। তারপর কুটুস টের পেল, ঘর-দোর বাড়ি শহর সব কোথায় হারিয়ে গেছে। সাদা মেঘের আঁচলে জড়িয়ে চড়ুই-এর সঙ্গে সে শূন্য আকাশে ভেসে চলেছে। অনেক নিচে চেয়ে দেখলে হয়তো রাতের পৃথিবী এখনো দেখা যায়। শহরের আলো-গুলো জোনাকির মৌচাকের মতো এক এক জায়গায় জমে আছে। সে-আলোও ক্রমশ হারিয়ে গেল। শুধু অসীম শূন্য! রঙ-বেরঙের মেঘ এদিকে-ওদিকে তাদেরই পাশ দিয়ে ভেসে যাচ্ছে।

খানিক বাদেই বোঝা গেল যে, সেগুলো নেহাৎ শুধু মেঘ নয়। হঠাৎ একটা করুণ কান্না শুনে কুটুস চমকে উঠে দেখে, একটা ছোট্ট জলভরা কালো মেঘ তাদের পাশ দিয়েই ভেসে যাচ্ছে। অবাক হয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে, একি কাঁদছে কে?

চড়ুই বললে, কাঁদছে বোধ হয় পৃথিবীর কোনো ছেলেমেয়ে। ওরকম কান্না এখানে অনেক শুনবে। পৃথিবীর সমস্ত কান্না-হাসি এখানে ভেসে আসে। এটা কান্না-হাসির আকাশ কিনা!

চড়ুই-এর কথা শেষ না হতেই মেঘটি নিজে থেকে বলে উঠল,

হ্যাঁ, আমি একটি ছোট মেয়ের কান্না। তার মা-বাবা কেউ নেই। যাদের বাড়ি থাকে তারা অনেক কষ্ট দেয়। রাতদিন খাটায়। আজ কাচের একটা গেলাস ধুতে গিয়ে সে ভেঙে ফেলেছে। তাই মার খাবার ভয়ে সে কাঁদছে…

কুট্টুসের আরো শোনবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সাদা মেঘ সে কান্নাকে পিছনে ফেলে হু হু ক'রে এগিয়ে গেল। চড়ুই পাখি বললে, শুধু কান্না নয় এখানে হাসিও মাঝে মাঝে ভেসে আসে।

বলতে বলতে একটা রাঙা সোনালি মেঘ তাদের পাশ দিয়ে আনন্দে ঝলমল করতে করতে উড়ে গেল। সারা গা দিয়ে তার হাসি যেন ঠিকরে পড়ছে। কুট্টুস শুনতে পেল, সে বলছে, পেয়েছি! পেয়েছি!

কী পেয়ে ওর এত খুশি? কুট্টুস অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে।

চড়ুই বললে, এমন কিছু নয়। অনেক কষ্টে ফুটবল ম্যাচ দেখবার একটা টিকিট পেয়েছে কিনা, তাই ছেলেটির এত আনন্দ। আকাশে এবার যেন হু হু ক'রে তাদের সাদা মেঘ ভেসে চলেছে। হঠাৎ কড়্ কড়্ কড়াৎ। আগুনের হল্‌কায় চোখ-মুখ তাদের যেন ঝল্‌সে গেল। তারপর সে কি দুর্যোগ! চারিদিক থেকে আকাশ গর্জন করছে, আগুনের সাপের মতো লক্‌লকে জিভ বার ক'রে বিদ্যুৎ ঝিলিক দিচ্ছে মুহূর্তে-মুহূর্তে।

চড়ুইকে জড়িয়ে ধরে কুট্টুস ভয়ে-ভয়ে বললে, এ আমরা কোথায় এলাম?

চড়ুই বললে, পৃথিবীর মানুষের মনে যেখানে যত বিষ আছে এখানে তাই বজ্র-বিদ্যুৎ হয়ে ফুটে ওঠে। মানুষের যত অন্যায় অত্যাচার বা হিংসা লোভ, যত শয়তানি আর স্বার্থপরতা—সব মিলে এইখানে এই ঝড় তুলেছে। মানুষের মনের বিষ না কাটলে এ ঝড় আর থামবে না।

অনেকক্ষণ বাদে সেই তুফানের রাজ্যও তারা পেছনে ফেলে এল। ক্রমশ যেন বড় ঠাণ্ডা মনে হচ্ছে। কুট্টুসের বেশ শীত করছে। দেখতে

দেখতে তাদের মেঘও সেই ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে তুষার হয়ে ধীরে ধীরে তাদের নিয়ে নিচে ঝরে পড়লো।

এ কী আশ্চর্য দেশ! যতদূর দেখা যায় শুধু সাদা তুষারে ঢাকা। ঠাণ্ডায় হাড়ের ভেতর পর্যন্ত কাঁপিয়ে দেয়।

শীতে কাঁপতে কাঁপতে যতখানি সম্ভব চড়ই-এর গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে কুট্টুস ভয়ে-ভয়ে বললে, এখানেই তোমায় থাকতে হবে নাকি?

চড়ুই বললে—হ্যাঁ, পৃথিবী ছেড়ে এসে এইখানেই আমরা থাকি।

কিন্তু এখানে যে তোমার বড় কষ্ট হবে। চারিদিকে শুধু যে বরফ।

চারিদিকে বরফ বটে, কিন্তু তোমার কাছে ভরসা পেলে এখানে থাকতে আমার কষ্ট নাও হতে পারে। এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে চড়ুই আবার বললে—ভালো ক'রে চেয়ে দেখ, এ তুষারের দেশ বটে কিন্তু সব জায়গায় বরফে ঢাকা নয়।

সত্যিই, চড়ুইয়ের কথা মিথ্যে নয়। চারিধারে তুষারের মাঝে এক-একটা জায়গা কোন্ যাদু-মন্ত্রে যেন সবুজ হয়ে আছে। কোন্ অদৃশ্য উত্তাপ যেন সেখান থেকে সমস্ত তুষার গলিয়ে সরিয়ে দিয়েছে।

চড়ুই বললে—পৃথিবীর যেখানে যে যতখানি ভালো কাজ করে, তার হৃদয়ের উত্তাপ এমনি ক'রে এখানকার বরফ ততখানি গালিয়ে দেয়। শুধু নিজের কথা না ভেবে সবাইকার জন্যে যারা কাজ ক'রে যায়, তাদের বুকের উত্তাপ এইখানে এসে জমা হয়। আর সেই উত্তাপ পেলে আমাদের কোনো কষ্ট কখনো থাকে না।

তাদের চোখের সামনেই কাছাকাছি একটা জায়গায় তুষার উত্তাপে গলে গিয়ে উজ্জ্বল সবুজ খানিকটা ঘাসে ঢাকা জমি ফুটে উঠলো। দেখা গেল একটি চড়ুই সেখানে পাখনা ঝাড়ছে।

তুমি কোথা থেকে আসছ গো? কুট্টুস এগিয়ে গিয়ে না জিজ্ঞাসা ক'রে পারলো না।

পাখনা ঝাড়া শেষ ক'রে নতুন চড়ুইপাখিটি বললে—চীন থেকে। তান্‌কু বলে একটি ছোট ছেলের মন আছে আমার জিম্মায়। বড় তারা গরিব। যুদ্ধের সময় তারা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল, ফিরে এসে দেখে, গ্রাম একেবারে শ্মশান হয়ে গেছে। তাদের গাঁয়ের পাশে একটা পাগলা প্রকাণ্ড নদী আছে। ফি-বছর তাদের ঘর-বাড়ি ক্ষেত-খামার সব বানে ভাসিয়ে দেয়। তান্‌কু ঠিক করেছে, বড় হয়ে সেই নদীতে সে একটা বাঁধ দেবে আর পোল বানাবে একটা এপার থেকে ওপারে। ইঞ্জিনিয়ার হবার জন্য তাই কাউকে কিছু না বলে সে একলা শহরে পালিয়ে যাচ্ছে। তার মনের উত্তাপেই এখানকার বরফ এমন গলে গেছে।

চীনদেশের চড়ুই-এর কথা শেষ হবার আগেই দেখা গেল, কুট্টুস আর তার নিজের চড়ুই-এর চারিধারে অনেকখানি বরফ গলে সরে গিয়েছে! কুট্টুসের চড়ুই পাখি ঘাড়ের রোঁয়া ফুলিয়ে ডানা দুটো দু'বার ঝেড়ে বললে—জানতাম, আমি আগেই জানতাম! আমার কুট্টুস থাকতে কোনোদিন আমায় শীতে কষ্ট পেতে হবে না। মনে মনে আজ যে প্রতিজ্ঞা করেছ, কোনোদিন যেন তা না ভাঙে।

কুট্টুসের গলা তখন ধরে এসেছে। প্রায় চুপি চুপি সে বললে—না, ভাঙবে না। রোঁয়া-ফোলানো চড়ুই বললে—পৃথিবীর সব ছেলেমেয়ের মন যেদিন তোমার মতো হবে, সেদিন এ-দেশের কোথাও কোনো তুষার আর থাকবে না। সাজানো বাগানের মতো ফুলে ফলে সব ভরে যাবে।

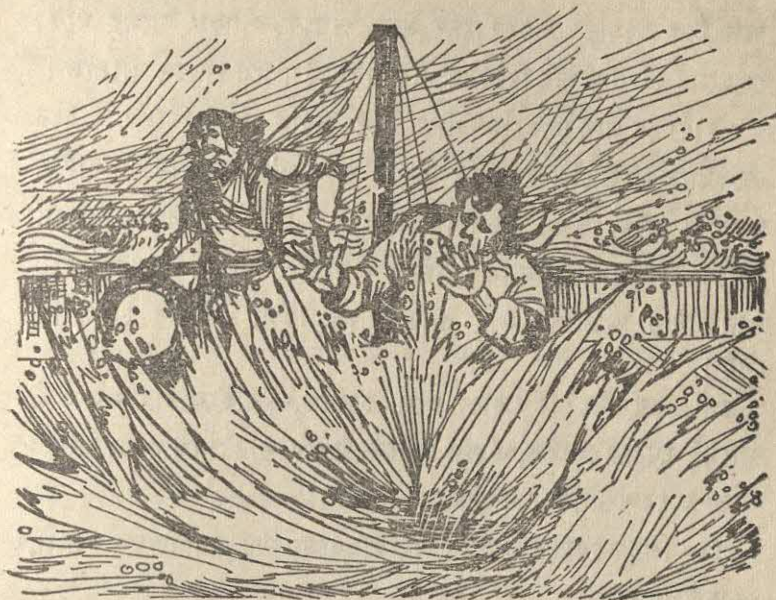
চড়ুই-এর কথা শেষ হতে-না-হতে কুট্টুসের মনে হলো, চারিদিকের তুষার যেন ধোঁয়া হয়ে সব উড়ে যাচ্ছে। আবার চারিদিকে ঝাপসা ক'রে ঝড়ের মতো হাওয়া বইছে আর কুট্টুস তাইতে ভেসে চলেছে।

হঠাৎ কুট্টুস শুনতে পেল, মা তাকে ডাকছেন। চোখ রগড়ে সে বিছানায় উঠে বসল, তারপর প্রথমেই তার চোখ গেল সেই

ফ্যানের পাখার ওপর। চড়ুই পাখিটা সেখানে নেই। মা যেন তার মনের কথা টের পেয়ে বললেন—চড়ুই পাখিটা খুঁজছিস! সে কি আর আছে? গেছে কোথায় কোন্ বেড়ালের পেটে!

কুটুস কোনো উত্তর দিলে না। চড়ুই পাখিরা কোথায় যায় সে জানে।

ছড়ি



ফন্দিটা ভালোই আঁটা হয়েছিল।

ঘনাদাকে জব্দ করার ফন্দি।

রোজ রোজ তিনি আমাদের মাথায় আষাঢ়ে গল্পের চাঁটা মেরে যাবেন, আর আমরা মুখ বুজে তাই সয়ে থাকবো, সেটি আর হচ্ছে না।

এবার তাঁর ওপরেও টেক্কা দেওয়া চাই।

ঘনাদা তখনো এসে পৌঁছোন নি।

ইতিমধ্যে চর পাঠিয়ে খবর নেওয়া হয়েছে যে সন্ধ্যেবেলায় লেকের ধারে বেড়ানো সেরে তিনি এইমাত্র মেসের গলির মুখে দেখা দিয়েছেন।

সিঁড়িতে তাঁর পায়েরশব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা বেশ তন্ময় হয়ে যে যার জায়গায় বসে পড়লাম।

ঘনাদা যখন ঘরে ঢুকলেন তখন আমরা রুদ্ধনিঃশ্বাসে সবাই শুনছি আর গৌর বলে যাচ্ছে,—

যেদিকে তাকাই, শুধু সাদা বরফ,—আকাশ সাদা, সব কিছু সাদা,

আর ঠিক আমার পেছনে সেই সাদা ভাল্লুক, সাক্ষাৎ যমের মতো পেছনের দু-পায়ে ভর দিয়ে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে আসছে।

ঘনাদা যে ঘরে ঢুকেছেন আড়চোখে সবাই দেখে নিলেও বাইরে একেবারে কেউ টের পাই নি এমনি ভান ক'রে রইলাম। ঘনাদার মুখখানা সত্যি তখন দেখবার মতো। এরকম অবস্থায় আগে কখনো বোধ হয় পড়েন নি। চিরকাল সভার মধ্যমণি হয়ে জাঁকিয়ে বসাই যাঁর অভ্যাস—তাঁর প্রতি আজ কিনা কারুর ভ্রুক্ষেপও নেই।

গৌর তখন উত্তেজিতভাবে বলে চলেছে,—রাইফেলের সব গুলি আগেই ফুরিয়ে গেছিল, এবার কোনো উপায় না দেখে সেটা লাঠির মতো ক'রে ধরে ফিরে দাঁড়ালাম…

ভয়ে শিবুর যেন গলা দিয়ে স্বর বার হচ্ছে না, এমনিভাবে বললে, —তারপর ?

কিন্তু গৌর কিছু বলবার আগেই ঘনাদার গলা-খাঁকারি শোনা গেল।

এবার আর তাঁকে অবজ্ঞা করা যায় না। গৌর তাঁর মৌরসীপাট্টা ইজিচেয়ারটা ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে,—আরে ঘনাদা যে! কখন এসেছেন টেরই পাই নি।

নির্বিকার মুখে ইজিচেয়ারটায় এসে বসে ঘনাদা বললেন,—তা পাবে কি ক'রে ? যে রকম মশগুল হয়ে গল্প করছিলে। তা গল্পটা হচ্ছিল কোথাকার ?

আজ্ঞে, দক্ষিণ মেরুর।—পাছে ঘনাদার দিকে চাইলে নিজেকে সামলাতে না পারে সেই ভয়ে গৌর মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে যতদূর সম্ভব সহজ গলায় বলে গেল,—সেবার একটা অভিযানে দক্ষিণ মেরুতে যেতে হয়েছিল কিনা!

হাসি চাপবার জন্যে আমরা মুখ নিচু করে রইলাম।

ঘনাদার কিন্তু কোনো প্রকার ভাবান্তর দেখা গেল না। গৌরের পক্ষে দক্ষিণ মেরু যাওয়াটা যেন নিতান্তই বোটনিক্‌স্‌ কি চিড়িয়াখানা

যাওয়ার সামিল এইভাবে তিনি বললেন,—তা সাদা ভাল্লুকটাকে করলে কি? বন্দুকের বাড়িতেই সাবাড় ক'রে দিলে নাকি?

গৌরের সেইরকমই কিছু বলবার বাসনা ছিল, কিন্তু ঘনাদার ওপর আর এক কাঠি সরেস হবার এমন সুযোগ কি ছাড়া যায়! একটু হেসে সে বললে,—আজ্ঞে না, তার দরকার হলো না। বন্দুকের ঘা দেবার আগেই দেখি ভাল্লুক ভায়া চিৎপটাং। বরফের মেঝে একেবারে কাচের মতো তেলা কিনা!

ঘরময় এমন কয়েকটা শব্দ শোনা গেল যা অন্য কেউ হলে চাপা হাসি বলেই মনে করত।

কিন্তু ঘনাদার সেদিকে গ্রাহ্য নেই। গম্ভীরভাবে বললেন,—সাদা ভাল্লুকটার ছাল-চামড়া না হোক, নিদেনপক্ষে একটা দাঁত কি নখও যদি আনতে পারতে, বিজ্ঞানের রাজ্যে হুলুস্থুল পড়ে যেত।

এবার আমাদেরই হতভম্ব হবার পালা।

কেন বলুন তো?—অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে গৌর,—বৈজ্ঞানিকেরা কি সাদা ভাল্লুক দেখেন নি?

অন্তত দক্ষিণ মেরুতে কখনো দেখি নি। পেঙ্গুইন পাখি ছাড়া সেখানে ডাঙায় চরবার মতো কোনো প্রাণীই নেই।—ঘনাদা হাই তুলে দু'বার তুড়ি দিলেন।

এমনভাবে জব্দ হব ভাবি নি। কথাটা তাড়াতাড়ি ঘুরিয়ে দিয়ে শিবু জিজ্ঞেস করলে,—দক্ষিণ মেরুতেও গিয়েছিলেন আপনি?

হ্যাঁ গেছলাম একবার। যা গরম!

এবার আমাদের চোখ কপালে উঠল। ঘনাদাকে আমরা চিনি, তবু তাঁর মুখে দক্ষিণ মেরুতে গরম শুনে খানিকক্ষণ মুখ দিয়ে কথা বেরুল না।

শুধু বললাম,—দক্ষিণ মেরুতে গরম!

হ্যাঁ, গরম বলে গরম! কবে সেখানে গরমে গলে পচে মরতাম। ভাগ্যিস এই ছড়িটা ছিল।—ঘনাদা হাতের ছড়িটা যেন আমাদের দিকেই দু'বার আস্ফালন করলেন।

আমাদের আর কিছু বলতে হলো না। ঘনাদা শিশিরের দিকে ফিরে বললেন,—কই হে, একটা সিগারেট ধার দাও না!

ঘনাদার আবার হিসেবে ভুল হবার জো নেই। শিশিরের কাছে সিগারেট নিয়ে ধরিয়ে বললেন,—এই নিয়ে ২৩৯৮টা হলো কিন্তু।

তারপর সিগারেটটায় একটা সুখটান দিয়ে শুরু করলেন,—সেবার সমুদ্রে যেন তিমির গাঁদি লেগেছিল। দক্ষিণ মেরুর দিকে তিমি-ধরা জেলেদের নজর কয়েক বছর হলো তখন পড়েছে। অবাধ বেপরোয়া তিমি শিকারের দরুন উত্তর অঞ্চলের তিমি প্রায় নিঃশেষ হওয়ার ফলেই দক্ষিণ দিকে ইংরেজ, নরউইজিয়ান, জাপানী আর আর্জেন্টাইন জেলেরা হানা দিতে শুরু করে বটে, কিন্তু দক্ষিণ মেরু অঞ্চলেও এত তিমি এর আগে কখনো দেখা যায় নি। নেহাত আনাড়ী জেলে-জাহাজও সেবার তিমির চর্বিতে বোঝাই হয়ে ঘাঁটিতে ফিরেছে! তুখোড় তিমি-শিকারীদের তো কথাই নেই।

আমার জাহাজ যে তিমির চর্বিতে বোঝাই তা বোধ হয় বলতে হবে না। নরওয়ের এক জেলে-জাহাজ আধাআধি বখরায় বন্দোবস্ত ক'রে আর সব দল থেকে আলাদা হয়ে, ক্যাম্পবেল দ্বীপে তখন আমার ঘাঁটি করেছি। আমার বখরাদারকে আমি 'সেন' বলে ডাকি। তবে সে বাঙালী নয়, নরওয়ের লোক; পুরো নাম ওলাফ সোরেনসেন। আমি তাকে ছোট করে নিয়েছি 'সেন' বলে।

সেন পাকা তিমি-শিকারী। বিশ বছর ধরে উত্তর দক্ষিণের দুই মেরুর হেন জাতের তিমি নেই যে শিকার করে নি। দূর থেকে শুধু তিমির নিঃশ্বাসের ফোয়ারা দেখে সে নারওয়াল না স্পার্ম, কুঁজো না নীল তিমি, বলে দিতে পারে। আমাদের জাহাজের নাম আমি রেখেছিলাম 'যমুনা'। জাহাজ বললে অবশ্য খানিকটা ভুল বোঝানো হয়। মাত্র চারশো টনের বড় স্টিমার, মোট ১৭৫ ফুট লম্বা। তবে তিমি-ধরা জাহাজের মধ্যে একেবারে সেরা আর সবচেয়ে হালফ্যাসানের। এই 'পিল্যাজিক' জাহাজে তিমি ধরে চর্বি ছাড়াবার

জন্যে আর ঘাঁটিতে বয়ে নিয়ে যেতে হয় না। জাহাজের খোলের ভেতরেই সব বন্দোবস্ত আছে।

আমাদের জাহাজে মাঝি-মাল্লা নিয়ে লোক সবসুদ্ধ আমরা ১৮ জন। সেন জাহাজের 'কাকের বাসা' অর্থাৎ মাস্তুলের ওপরকার পাহারা-মাচায় দূরবীন ধরে সমুদ্রে তিমির সন্ধান করে। আর আমি হারপুন-ছোঁড়া কামান চালাই। আমাদের জাহাজে সম্পূর্ণ আধুনিক Svend Foyn হারপুন-কামান বসানো! চার ফুট লম্বা সওয়া মণ ওজনের হারপুন তা থেকে বিদ্যুৎগতিতে তিমির গায়ে গিয়ে বেঁধে। সে হারপুনের মাথায় আবার ছোট বোমা গাঁথা। একবার ঠিকমতো তাগ করতে পারলেই তিমির গায়ে বেঁধবার তিন সেকেণ্ডের মধ্যে সে-বোমা ফেটে গিয়ে তিমিকে কাবু ক'রে ফেলবেই।

ডিসেম্বর মাসের শেষ। তিমি ধরার মরশুম প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আর কিছুদিন বাদেই দক্ষিণ মেরুর শীত চরমে নামতে শুরু করবে। আমাদের জাহাজ তিমির চর্বির ভারে প্রায় ডুবুডুবু। যা চর্বি আমরা পেয়েছি তাতে বছর তিনেক দু'হাতে খরচ করেও রাজার হালে বসে আমরা কাটাতে পারব। সেন রোজ তাই ফেরার জন্যে পেড়াপীড়ি করে। কিন্তু আমি কিছুতেই রাজি নই।

সেদিন সকালবেলা 'কাকের বাসায়' পাহারা দিতে দিতে সেন হঠাৎ নিচে নেমে এল। আমি তখন একজন খালাসীকে দিয়ে হারপুন-কামানটা পরিষ্কার করাচ্ছি। সেনকে দেখে একটু অবাক হয়ে বললাম—নেমে এলে যে বড়! এইটুকুর মধ্যে বড় কোনো শিকার যদি ফসকে যায়!

ফসকে গেলে ক্ষতিটা কি?—সেনের মুখ বেশ বিরক্ত—আর শিকার গাঁথলে মাল কোথায় রাখতে বলতে পারো? জাহাজে আর জায়গা আছে?

সেনের বিরক্তি দেখে একটু হেসে বললাম,—আমি যে শিকারের সন্ধান করছি তার মাল রাখবার যথেষ্ট জায়গা এখনো জাহাজে আছে। আর সে মালের কাছে তোমার জাহাজভর্তি চর্বি নেহাত তুচ্ছ।

সেন খানিকক্ষণ অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললে,— তার মানে এখনো তুমি 'অ্যাম্বারগ্রিস'-এর আশায় আছ ?

আমাদের মুখের ভাব দেখে ঘনাদা গল্প থামিয়ে একটু যেন করুণার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন, 'অ্যাম্বারগ্রিস' কাকে বলে, জানো না বুঝি ?

আমরা মাথা নাড়লাম। ঘনাদা ঈষৎ বিদ্রূপের হাসি হেসে বললেন,—সাপের মাথায় মণির কথা শুনেছ তো ? সে মণি শুধু আজগুবি কল্পনা, কেউ কখনো পায় নি। কিন্তু 'অ্যাম্বারগ্রিস' তিমির মাথার নয়, পেটের সত্যিকার মণি। শুধু একজাতের তিমির নাড়িভুঁড়ির মধ্যে পাওয়া যায়। তাও আবার সে-জাতের সব তিমির নয়, দু'চারটির। তিমির পেট থেকে ছাড়া সমুদ্রের জলে আর সমুদ্রের ধারের পলিতেও অনেক সময় হাল্‌কা নুড়ির মতো কালচে ধোঁয়াটে রঙের 'অ্যাম্বারগ্রিস' পাওয়া যায়। এসেন্স আতরের কারবারে সে নুড়ির দাম তার ওজনের সোনার চেয়ে কম নয়।

হ্যাঁ, তারপর যা বলছিলাম। সেনের কথা শুনে একটু হেসে বললাম,—'অ্যাম্বারগ্রিস'-এর আশায় আছি মানে ? তুমি কি মনে কর তোমার ঐ নোংরা চর্বির লোভে এই যমের দক্ষিণ দুয়ারে তিমি-শিকারে এসেছি ? না হে না, আমার নজর আরো অনেক উঁচুতে। 'অ্যাম্বারগ্রিস' বেশ ভালোরকম আছে, এমন একটা তিমি যদি পাই, তাহলে ও চর্বির বখরা তোমায় এমনিই দিয়ে দেব।

তোমার উদারতার জন্য ধন্যবাদ।—সে একটু বিদ্রূপ ক'রেই বললে,—তবে 'অ্যাম্বারগ্রিস' তো আর যেখানে-সেখানে ছড়ানো নেই—স্পার্ম-তিমি ছাড়া ও-জিনিস পাওয়া যায় না জানো বোধ হয়, আর স্পার্ম-তিমি এ অঞ্চলে খুব কমই পাওয়া যায়।

হেসে বললাম,—কিন্তু পাওয়া যা যায় তা দস্তুর মতো বড় গোছের। এ অঞ্চলে ছুটোছাটা ছিটকে যে কটা স্পার্ম-তিমি এসে পড়ে সেগুলো সবই বুড়ো ধাড়ী। 'অ্যাম্বারগ্রিস' তাদের পেটেই পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

যেন আমার কথার মান রাখবার জন্যেই আধ মাইলটাক দূরে একটা জলের ফোয়ারা হঠাৎ সমুদ্র থেকে লাফ দিয়ে উঠল।

হাজার হলেও সেন জাত-শিকারী। এক মুহূর্তে ঝগড়াঝাঁটি ভুলে দূরবীন চোখে লাগিয়ে সে উত্তেজিত হয়ে উঠল।

তিমি! স্পার্ম-তিমি! সমুদ্রের দেবতা তোমার কথা শুনেছে দাস। আর ভাবনা নেই।

হায়! সমুদ্রের দেবতার মনে কি ছিল তখন যদি জানতাম!

উত্তেজনার ঝোঁকে সেন দূরবীন ছেড়ে তখন হারপুন-কামানে হাত দিয়েছে। আমি বাধা দেবার আগেই প্রচণ্ড শব্দে 'ভেণ্ড-ফয়েন' কামানের হারপুন ছুটে বেরিয়ে গেল।

সেন এমনিতে বেশ ভালো শিকারী। কিন্তু উত্তেজনাতেই তার টিপ তখন বুঝি খানিকটা নষ্ট হয়ে গেছে। বোমামুখো হারপুন তিমিটার গায়ে না লেগে কাছাকাছি পড়ে ফেটে গেল। আর তাইতেই হলো সর্বনাশ। সঙ্গে সঙ্গে একটি ফোয়ারা ছেড়ে তিমিটা এমন ডুব মারল যে আর পাত্তাই নেই।

কিন্তু আমরাও তখন নাছোড়বান্দা। এতবড় একটা স্পার্ম-তিমির সন্ধান পাওয়ার পর আর আমরা তাকে বেহাত হতে দিই! যত গভীর জলেই ডুব দিক না কেন, বাছাধনকে নিঃশ্বাস নিতে দূরে হোক কাছে হোক কোথাও উঠতেই হবে। খুব বেশিক্ষণ ডুবে থাকাও তার চলবে না, কারণ আমাদের হারপুনের ধমকিতে ভালো ক'রে নিঃশ্বাস নেবার ফুরসত তার মেলে নি। তিমিরা নিঃশ্বাস নেবার পর বহুক্ষণ ডুবে থাকতে পারে বটে, কিন্তু পুরোপুরি দম নেওয়া তাদের একেবারে সারা হয় না। জল থেকে হাওয়ায় এসে তারা বারকয়েক ফোয়ারা ছেড়ে, নিঃশ্বাস নিয়ে, তবে আবার অনেকক্ষণের জন্যে ডুব পাড়ে। এ-বেচারাকে কিন্তু একটিবার ফোয়ারা ছেড়েই তাড়াহুড়ো ক'রে ডুব দিতে হয়েছে। সুতরাং সাধারণ অবস্থায় মিনিট পঁয়তাল্লিশ ডুব মেরে থাকা সম্ভব হলেও এখন মিনিট দশ-পনরোর বেশি জলের তলায় থাকতে সে পারবে না।

সেনকে কাকের বাসায় পাঠিয়ে হারপুন-কামান ধরে আমি সজাগ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। সারেঙ আমাদের হুকুমমতো তখন মাইল-খানেক ব্যাস ধরে জাহাজটাকে চক্কর দেওয়াতে শুরু করেছে।

কিন্তু স্পার্ম-তিমি নয়, নিয়তিই ওই ছদ্মবেশে আমাদের নাকাল করতে এসেছে কি ক'রে বুঝব! তিমির দেখা আমরা আবার কেন, অনেকবার পেলাম, কিন্তু সে যেন মন্ত্রপড়া তিমি, হারপুন দিয়ে তাকে কিছুতেই ছুঁতে পর্যন্ত পারা গেল না। সে যেন ভেলকি জানে। হারপুন-কামান থাকে জাহাজের সামনের দিকে। তিমিটা যেন তা জেনেই প্রত্যেকবার ঠিক জাহাজের পেছন দিকে ভেসে ওঠে। জাহাজ ঘুরিয়ে ভালো করে তাকে তাগ করবার আর সুযোগ মেলে না। তার আগেই সে ডুব দেয়। দু'চারবার এমনি ক'রে ফসকাবার পর হঠাৎ আমাদের হারপুন-কামানটাই গেল আশ্চর্যভাবে বিগড়ে। কামান মেরামত যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ তিমিটাকে নজরে রাখা ছাড়া আর আমাদের কোনো উপায় নেই। তিমিটা যেন আমাদের মতলব বুঝেই তখন ক্রমশ আরো দক্ষিণে পাড়ি দিতে শুরু করেছে। কিন্তু আমরাও তখন মরিয়া হয়ে উঠেছি। হারপুন-কামান ঠিক যদি না হয় তাহলে হাতে-ছোঁড়া হারপুন দিয়েও আগেকার যুগের তিমি-শিকারীদের মতো তাকে আমরা ধরবই এই আমাদের পণ।

কিন্তু সে পণরক্ষা আর হলো না। দু'দিন দু'রাত্রি তার পিছু-পিছু ধাওয়া ক'রে আমরা তখন মেরুবৃত্তের দিকে অনেকখানি এগিয়ে গেছি। হঠাৎ তারপর এল ঝড়। দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের ঝড় যে কি বস্তু, এখানে কল্পনাই করা যায় না। ঘণ্টায় একশো মাইল ঝড়ের বেগ সেখানে নেহাত স্বাভাবিক ব্যাপার।

কোথায় রইল তিমি-শিকার, নিজেদের জাহাজ বাঁচাতেই তখন আমাদের প্রাণান্ত। ক'দিন ক'রাত্রি যে ঝড়ের সঙ্গে যুঝলাম খেয়ালই নেই। এইটুকু শুধু বুঝতে পেরেছিলাম যে, ক্রমশ দক্ষিণ দিকেই আমাদের ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। তুষার-ঝড়ে দিগ্বিদিক অন্ধকার, তারই ভেতর উত্তাল সমুদ্রের ঢেউ আর পাহাড়ের মতো

বিরাট সব বরফের স্তূপ প্রতি মুহূর্তে যেন আমাদের পিষে ফেলবার জন্যে ষড়যন্ত্র করছে। সে ষড়যন্ত্র শেষ পর্যন্ত সফলই হলো। কয়েকদিন ঝড়ের সঙ্গে অবিরাম যুদ্ধের পর বিরাট এক বরফের পাহাড়ের সঙ্গে ধাক্কা লেগে আমাদের জাহাজ চৌচির হয়ে গেল। কি যে তারপর হয়েছে, কি যে করেছি কিছুই মনে নেই।

জ্ঞান যখন হলো তখন দেখি বিরাট এক তুষার-প্রান্তরের ওপর পড়ে আছি। চোখ মেলতেই মনে হলো কেতাদুরস্তভাবে ডিনার স্যুটের সাদা শার্ট কালো কোট-পরা ক'জন ভদ্রলোক যেন আমায় নিবিষ্ট মনে দেখছে।

চোখের ঘোর একটু কাটবার পর বুঝলাম কোটপ্যান্ট পরা ভদ্রলোক নয়, সেগুলি পেঙ্গুইন পাখি।

পেঙ্গুইনরা এই তুষারের রাজ্যে মানুষ কখনো দেখে নি। ভয় না পেয়ে তারা নিজেদের ভাষায় আমার সম্বন্ধে খোলাখুলিভাবেই তখন আলোচনা শুরু ক'রে দিয়েছে।

উঠে বসে এবার চারিদিকে তাকালাম। আমাদের জাহাজের নানা টুকরো তুষারময় তীরের ওপর চারিদিকে ছড়ানো। বুঝলাম একই ঢেউয়ের মাথায় ভাঙা জাহাজের টুকরোর সঙ্গে আমি এই তুষার-উপকূলে এসে পৌঁছেচি। পেঙ্গুইনদের কথা আগে অনেক শুনেছি। এখানে তাদের আস্তানা দেখে মনে হলো রস দ্বীপের কাছাকাছি কোনো জায়গায় আছি। এ-জাতের পেঙ্গুইন এই অঞ্চলেই শীতের আগে ডিম থেকে বাচ্চা ফুটিয়ে বড় করতে আসে।

কিন্তু আমি ছাড়া আমাদের জাহাজের আর কেউ কি রক্ষা পায় নি?

চারিধারে অনেক দূর পর্যন্ত খুঁজে দেখলাম। জীবিত দূরে থাক, কোনো মানুষের মৃতদেহও একটা দেখতে পেলাম না। দেখবার আশা করাই অবশ্য ভুল। তুষার-ঝড়ে জাহাজডুবির পর যদি বা কেউ বেঁচে গিয়ে থাকে, এখানকার সমুদ্রের হিংস্র গ্রাম্পস্ তিমির কবল থেকে তার রক্ষা পাওয়া অসম্ভব। এই দিকের সমুদ্রে নেকড়ের

পালের মতো ঝাঁকে ঝাঁকে তারা ঘুরে বেড়ায়। তাদের নজরে পড়লে বিরাট নীল তিমি থেকে অক্টোপাস আর সীল পর্যন্ত কারুর আর রক্ষা নেই। হাঙরের চেয়ে তারা অনেক বেশি বুদ্ধি ধরে; শক্তি, সাহস এবং হিংস্রতা—তাতেও তারা অনেক ওপরে।

আমি যে তাদের কবলে পড়ি নি এটা নেহাত আমার সৌভাগ্য!

কিন্তু খানিকক্ষণ সেই তুষার-শ্মশানে কাটাবার পর বেঁচে যাওয়াটা সৌভাগ্য না দুর্ভাগ্য বেশ একটু সন্দেহ হতে লাগল। জলে ডুবে বা হাঙর-তিমির কবলে পড়ে মারা গেলে সঙ্গে সঙ্গে সব চুকে যেত, কিন্তু সে-সব বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে এই তুষার-রাজ্যে যে তিলে তিলে মরতে হবে। এখান থেকে উদ্ধার পাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই কখনো নেই। তিমি-ধরা জাহাজ সাধ ক'রে এ জায়গার ধারে-কাছে কখনো আসে না। কালেভদ্রে তোড়জোড় ক'রে যারা মেরু অভিযানে এ অঞ্চলে আসে তাদের সঙ্গে দেখা হওয়ার আশা সমুদ্রের বালির গাদায় একদানা চিনি খুঁজে পাওয়ার সমান।

তবু প্রাণ থাকতে হাল ছেড়ে দিতে নেই। যতদিন পারা যায় এই তুষার মরুভূমিতে বেঁচে থাকবার জন্যে যা সাধ্য তাই করবার চেষ্টায় মন দিলাম। জাহাজের ভাঙা যে-সব টুকরোটাকরা চারিধারে ছড়িয়ে ছিল তা থেকে এত সাহায্য পাব ভাবি নি। সে সাহায্য না পেলে একটা দিনও আমায় টিঁকে থাকতে হতো না বোধ হয়।

বরফের ওপর ঘুরতে ঘুরতে প্রথমেই পেলাম এই ছড়িটি। সাউথ জর্জিয়ার বন্দর থেকে তিমি-শিকারে বেরুবার সময়ে শখ ক'রে এই ছড়িটি কিনেছিলাম। এই তুষার-রাজ্যে ছড়িটিকে পেয়ে যেন পুরোনো বন্ধুকে ফিরে পেলাম মনে হলো। ছড়িটি বাদে কিছু টিনে ভর্তি খাবার-দাবারও এখানে-সেখানে কুড়িয়ে পেলাম। দিন দশেক অন্তত সে খাবারে চলে যেতে পারে। কিন্তু সবচেয়ে দরকারী যে জিনিসটি পেলাম, সেটি একটি রেশম আর পাতলা রবারের তৈরি গোল তাঁবু। এমনিতে গোটা তাঁবুটা এমন হালকা যে পাকিয়ে কাঁধে ফেললে একটা আলোয়ানের চেয়ে বেশি ভারি লাগে না। কিন্তু ফাঁপিয়ে

মাটিতে খাটালে জন-চারেক লোক তার মধ্যে অনায়াসে রাত কাটাতে পারে। তিমি-ধরা জাহাজ বিগড়ে হঠাৎ যদি দক্ষিণ মেরুর কোনো দ্বীপে শীতকালটা কাটাতে হয়, সেইজন্যে সেন এই তাঁবুটা দেশ থেকে বিশেষভাবে অর্ডার দিয়ে তৈরি করিয়ে এনেছিল। সেটা যে দক্ষিণ মেরুর তুষার-রাজ্যেই কাজে লাগবে সে বা আমি ভাবতেই পারি নি।

এই তাঁবুটি না পেলে এই রক্ত জমান শীতের দেশে এস্কিমোদের মতো বরফের ঘর তৈরি করবার চেষ্টাই হয়তো আমায় করতে হতো। তাও কতদূর কি পারতাম জানি না।

তাঁবু খাটিয়ে বসবার পর কয়েকটা দিন ভাঙা জাহাজের টুকরো-টাকরা থেকে আর কি পাওয়া যায় তারই খোঁজে কেটে গেল।

পেঙ্গুইন ও সামুদ্রিক স্কুয়া চিলই আমার একমাত্র সঙ্গী। যে জায়গায় আমি তাঁবু ফেলেছিলাম তা থেকে মাইলখানেক দূরে হাজার হাজার পেঙ্গুইন ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা বড় করবার জন্যে তখন নুড়ি সাজিয়ে বাসা তৈরি করতে ব্যস্ত। পুরুষ পাখিরা নুড়ি মুখে ক'রে নিয়ে আসে। মেয়ে পাখিরা তা সাজায়। পেঙ্গুইনদের হাব-ভাব চাল-চলন দেখলে পাখির বদলে মানুষ বলেই ভুল হয়। তাদের আচার-ব্যবহারে সামাজিক সভ্যতার আভাস বেশ স্পষ্ট।

স্কুয়া চিলেরা পেঙ্গুইনদের চিরশত্রু। ইতিমধ্যেই তারা পেঙ্গুইনদের জ্বালাতন করতে শুরু করেছে। পেঙ্গুইনরা ডিম পাড়বার পর তাদের লুটতরাজ আরো বেড়ে যাবে। পেঙ্গুইনদের সজাগ পাহারা একটু ঢিলে হলেই ছোঁ মেরে ঠোঁটে ডিম বিঁধে নিয়ে যাওয়া তাদের দস্তুর।

কিন্তু পেঙ্গুইন আর স্কুয়া চিলের ঝগড়া দেখে দিন কাটালে আমার চলবে না। মাত্র দশ দিনের খোরাক আমার হাতে। পেঙ্গুইনরা ডিম পাড়বার পর স্কুয়া চিলদের মতো আমাকেও হয়তো তাদের ওপর ডাকাতি করতে হবে, কিন্তু তার আগে কিছু খাবার সংগ্রহ না করলেই নয়। ভাঙা জাহাজের ছড়ানো মাল থেকে একটা লম্বা লোহার শিক যোগাড় করেছিলাম। তাই দিয়ে এ-অঞ্চলের একটা

চিতা-সীল শিকার করবার চেষ্টায় বেরিয়ে পড়লাম। জলে নেমে সড়কিতে সীল মাছ গাঁথা অসম্ভব। কিন্তু সীল অনেক সময়ে বরফের মধ্যে নিঃশ্বাসের একটা ফুটো তৈরি ক'রে তার তলায় শীতটা কাটায়। সেইরকম একটাকে সুবিধেমতো পাওয়াই আমার উদ্দেশ্য।

বরফের ওপর দিয়ে একমনে শিকার খুঁজতে খুঁজতে কতদূর গিয়ে পড়েছিলাম জানি না, হঠাৎ চোখ তুলে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। মাত্র আধমাইলটাক দূরে বরফের প্রান্তরের ওপর একটা বহুদূরব্যাপী লম্বা সাদা ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখা যাচ্ছে। যেন মেঘের একটা লম্বা ফিতে বরফের ওপর নেমে এসেছে।

সীল শিকার মাথায় রইল। এ রহস্যের মীমাংসা আগে না করলে নয়। কাছে গিয়ে যা দেখলাম তাতে আরো হতভম্ব হয়ে গেলাম। মেঘের ফিতের মতো দূর থেকে যা দেখেছিলাম, তার তলায় তরতর ক'রে একটা জলের ধারা বয়ে যাচ্ছে আর সে জল আগুনের মতো গরম। এখানকার দারুণ ঠাণ্ডায় সেই জল থেকে বাষ্প উঠে তুষারকণা হয়ে জমে যাবার দরুনই তার চেহারা দূর থেকে মেঘের মতো দেখাচ্ছে।

এই তুষার-রাজ্যে এরকম জলের স্রোত কোথা থেকে আসছে?

সেদিন তৈরী ছিলাম না। তাই পরের দিন লম্বা পাড়ির জন্যে প্রস্তুত হয়েই বেরিয়ে পড়লাম। প্রস্তুত হওয়া মানে আর কিছুই নয়, কাঁধের একটা ঝোলায় টিনের খাবারের কৌটোগুলো, কোমরে চাদরের মতো জড়ানো সেই তাঁবু, আর হাতে এই ছড়ি। যদি দরকার হয় যেখানে খুশি তাঁবু খাটিয়ে রাত কাটাতে পারব এই জন্যেই এসব নেওয়া।

ঘণ্টা-চারেক বরফের ওপর দিয়ে হাঁটবার পর গরম জলের স্রোতের রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেল বটে কিন্তু যা দেখলাম সে আরেক বিস্ময়।

সামনে তুষার-প্রান্ত ঢালু হয়ে ওপর দিকে উঠে গেছে আর তারই মাঝে আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে এক খাড়া পাহাড়ের চূড়া। পাহাড় এখানে চারিদিকেই, কিন্তু সেগুলি আগাগোড়াই বরফে

ঢাকা। এই পাহাড়ের গায়ে শুধু নেড়া পাথর ছাড়া একটি বরফের কুচিও নেই। এই পাহাড়েরই নিচের দিকের একটি গুহা থেকে ফুটন্ত গরম জলের স্রোত বেরিয়ে আসছে তা বলাই বাহুল্য।

দক্ষিণ মেরুতে মাউন্ট ইরেবাস ও আরেকটি আগ্নেয়গিরি আবিষ্কৃত হয়েছে বলে আগেই জানতাম। আমি কি তাহলে ভাগ্যক্রমে সে দু'টির চেয়েও আশ্চর্য আরেকটি আগ্নেয়গিরি আবিষ্কার ক'রে ফেলেছি! আনন্দের সঙ্গে দুঃখও হলো এই যে, আবিষ্কারের কথা পৃথিবীর কেউ জানতেও পারবে না। এই তুষার-রাজ্যে এ আবিষ্কার আমার সঙ্গেই শেষ হয়ে যাবে।

তবু এ আগ্নেয়গিরির সন্ধান ভালো ক'রে না নিয়ে ফিরতে পারি না।

সামনের দিকে পাহাড় অত্যন্ত খাড়াই। ডানদিকের পাহাড় কিছুটা ঢালু দেখে সেইদিক দিয়েই উঠতে শুরু করলাম।

ওপরে গিয়ে যখন পৌঁছলাম, তখন দক্ষিণ মেরুর এই সময়কার ছোট রাত শুরু হয়ে গেছে। সন্তর্পণে কিছুদূর যেতেই আগ্নেয়গিরির বিরাট মুখটার প্রান্ত দেখা গেল। সাধারণ আগ্নেয়গিরির চেয়ে এই পাহাড়ের হাঁ অনেক বেশি প্রকাণ্ড।

কিন্তু ঠিক মুখটার কাছে ওটা কি প্রাণী!

দক্ষিণ মেরুতে পেঙ্গুইন ছাড়া ডাঙায় চরবার মতো কোনো প্রাণীই নেই জানি। এ বিশাল প্রাণীটা তা হলে কোথা থেকে এল? আবছা অন্ধকারে সেটাকে প্রকাণ্ড একটা পাখি বলেই মনে হচ্ছিল। কিন্তু এত বড় আকারের কি পাখি এখানে থাকতে পারে! দক্ষিণ মেরুর সম্রাট পেঙ্গুইনই সবচেয়ে বড় আকারের পাখি, কিন্তু সে পাখি তো কখনো এত বিশাল হতে পারে না! তাছাড়া সেরকম পাখি একলা এই পাহাড়ের চূড়ায় কি ক'রে আসবে!

ভালো ক'রে একটু খোঁজ নেবার জন্যে সন্তর্পণে যেই একটু এগিয়েছি, অমনি বিরাট পাখিটা হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে কি একটা চিৎকার ক'রে উঠল।

পরমুহূর্তে হঠাৎ চমকাবার দরুনই হোক বা তলার পাথর সরে গিয়েই হোক, সে সশব্দে আগ্নেয়গিরির মুখের ভেতর গড়িয়ে পড়ল এবং এক লাফে তাকে ধরতে গিয়ে দেখলাম সঙ্গে সঙ্গে আমিও সবেগে নিচে গড়িয়ে যাচ্ছি।

একেবারে নিচে এসে গড়িয়ে পড়ার পর জখম খুব বেশি না হলেও আরেক দিক দিয়ে অবস্থা যা হলো তা বর্ণনা করা যায় না।

দারুণ গ্রীষ্মের দিনে দার্জিলিঙ থেকে শিলিগুড়িতে নামলে যে অবস্থা হয় তা এর কাছে কিছুই নয়। পাহাড়ের ওপর ছিল দক্ষিণ মেরুর দুরন্ত শীত আর পাহাড়ের এই গহ্বরের তলায় একেবারে যেন আফ্রিকার কঙ্গোর জঙ্গলের দারুণ ভ্যাপসা গরম। সমস্ত শরীর জ্বলে গিয়ে যেন দম বন্ধ হয়ে মরে যাবার যোগাড় হলো।

যার জন্যে এই গহ্বরে পড়তে হলো সেও তখন উঠে বসে আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। বিরাট কোনো অজানা পাখি নয়, সে আমারই বন্ধু সেন।

সেনের মুখে সমুদ্র থেকে উদ্ধার পাওয়া আর পাখি সাজার বৃত্তান্ত তারপর শুনলাম। আমার মতো সমুদ্রের ঢেউ তাকেও তুষার-তীরের ওপর ফেলে যায়। কিন্তু আমার মতো রবারের তাঁবুর সুবিধে না থাকায় শীতে প্রাণ বাঁচাবার জন্যে কয়েকটা পেঙ্গুইন পাখি মেরে তাদের চামড়া আর পালক তাকে গায়ে আঁটতে হয়। তারপর গরম জলের স্রোত দেখে আমারই মতো কৌতূহলী হয়ে সে এই পাহাড়ের সন্ধানে আসে।

অন্য সময় হলে এ গল্প হয়তো যথেষ্ট উপভোগ করতাম, কিন্তু দারুণ গরমে যখন প্রাণ যাবার উপক্রম তখন অন্য কিছুতে কি মন যায়!

দু'দিন দু'রাত সেই আগ্নেয়গিরির খোল থেকে বেরুবার প্রাণপণ চেষ্টা করলাম, কিন্তু কোনো ফল হলো না। চারিধারে পাথরের দেওয়াল কতকটা ঢালু হলেও এমন উল্টোভাবে খাঁজ-কাটা যে তা বেয়ে গড়িয়ে পড়া সহজ হলেও ওঠা একেবারে অসম্ভব।

ইতিমধ্যে আগ্নেয়গিরির গরম জলের স্রোতের রহস্য আমরা বুঝে ফেলেছি। যে খোলের ভেতর আমরা পড়েছি তার দু'দিকে দুটি ছোট ছোট ফোকর আছে। একদিকের ফোকর দিয়ে বাইরের তুষার ভেতরে এসে মাঝখানের একটা কড়াই-এর মতো গর্তে জমা হয়ে নিচেকার প্রচণ্ড উত্তাপে ফুটে উঠছে। তারপর সেই ফুটন্ত জল আর একদিকের ঢালু ফোকর দিয়ে স্রোত হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। নামবামাত্র একেবারে সেদ্ধ হয়ে যাবার ভয় না থাকলে সেই স্রোতের জলের সঙ্গেই বেরুবার চেষ্টা হয়তো আমরা করতাম, কিন্তু তার কোনো উপায় নেই।

এদিকে প্রচণ্ড গরমে মারা যাবার আগেই আমাদের পাগল হবার উপক্রম। আগ্নেয়গিরিটা এখনো একরকম ঘুমন্ত বলা চলে। স্রোতের জলকে ফুটিয়ে তোলা ছাড়া তার কোনো উপদ্রব এখনো দেখা দেয় নি। কিন্তু দেখা দিতে কতক্ষণ!

বাইরের তুষার-প্রান্তরে থাকলেও খুব বেশি দিন আমরা বেঁচে থাকতে পারতাম না জানি, কিন্তু এই বদ্ধ গুহায় মরার চেয়ে সে যেন অনেক ভালো।

দু'দিন দু'রাত ধরে এ গহ্বর থেকে বেরুবার ব্যর্থ চেষ্টায় হয়রান হয়ে সেনকে সেই কথা বলতে গিয়ে রাগের মাথায় ছড়িটা যেই গহ্বরের মেঝেতে ঠুকেছি, অমনি এক ভয়ংকর আশ্চর্য কাণ্ড ঘটে গেল।

দমকলের মুখ দিয়ে যেমন তোড়ে জল বেরোয়, আমার ছড়ির ডগায় মেঝের সেই জায়গাটা ফুটো হয়ে তেমনি প্রচণ্ড বেগে সাতটা ইঞ্জিনের শিষের মতো আওয়াজ ক'রে ধোঁয়াটে গ্যাসের পিচকিরি আগ্নেয়গিরির মুখ ছাড়িয়ে লাফিয়ে উঠল। গ্যাসের সে ফোয়ারা আর থামে না!

সেই গ্যাসের তোড়েই সে-যাত্রা বেঁচে গেলাম—বলে ঘনাদা থামলেন।

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,—গ্যাসের তোড়ে বাঁচলেন কিরকম?

একটু অনুকম্পার হাসি হেসে ঘনাদা বললেন,—এটা আর বুঝতে পারলে না ? কোমরে যে তাঁবুটা বাঁধা ছিল সেটা খুলে ধরে গ্যাসে ভর্তি ক'রে নিলাম। তারপর দুজনে সেই বেলুনের দু'দিকে দড়ি দিয়ে নিজেদের বেঁধে হাওয়ায় ভেসে গুহা থেকে বেরিয়ে এলাম।

এই বেলুনেই দক্ষিণ মেরু থেকে দেশে পৌছলেন নাকি ?—গৌর গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করলে।

না, ও বেলুনে আর কতদূর যাওয়া যায়! ঘনাদা একটু যেন বিরক্ত হয়ে বললেন,—সে বেলুন থেকে গিয়ে পড়লাম এক পাহাড়ের ওপর। সাধারণ পাহাড় সেটা নয়,—বিরাট Iceberg অর্থাৎ বরফের পাহাড়। এই সময়ে এই সব বরফের পাহাড় ঝড়ের বেগে ক্রমশ উত্তর দিকে ভেসে যেতে যেতে গলতে থাকে। আমাদের পাহাড়টা যখন গলতে গলতে কোনোরকমে দুজনের দাঁড়াবার মতো ছোট হয়ে এসেছে, তখন ভাগ্যক্রমে একটা তিমি-ধরা জাহাজ সেইখান দিয়ে যেতে যেতে আমাদের দেখতে পেয়ে আমাদের তুলে নেয়। আমরা ভাসতে ভাসতে যে ম্যাকওয়ারি দ্বীপ পর্যন্ত এসে পড়েছিলাম, তা ভাবতেও পারি নি।

ঘনাদা বলা শেষ করে শিশিরের দিকে ২৩৯৯তম সিগারেট ধার করবার জন্যে হাত বাড়ালেন।

গৌর হঠাৎ বলে উঠল,—ছড়িটা আপনি সাউথ জর্জিয়া থেকে কিনেছিলেন বললেন না! আমাদের পাড়ার মিত্র ব্রাদার্সও বোধ হয় সেখান থেকে ছড়ি আমদানি করছে আজকাল। ঠিক এই রকম ছড়ি সেখানে কটা দেখলাম যেন!

ঘনাদার সিগারেট ধার করা আর হলো না। আমাদের, বিশেষ ক'রে গৌরের, দিকে অগ্নিদৃষ্টি হেনে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

শিশি



আপনাকে চুরি!—প্রায় কেলেঙ্কারিই ক'রে ফেলেছিলাম বেফাঁস কথাটার সঙ্গে কাশি চাপতে গিয়ে বিষম খেয়ে। তাড়াতাড়ি সামলে বললাম,—এত বড় সাহস!

ঘনাদা ঠাণ্ডা হয়ে রহস্যময় হাসি হেসে বললেন,—সাহস নয়, দায়!

ব্যাপারটা যে বাহাত্তর নম্বর বনমালী নস্কর লেনের তা বলাই বাহুল্য, কিন্তু গোড়া থেকে শুরু করাই নিশ্চয় উচিত।

ফন্দিটা মাথায় এসেছিল গৌরের। আমরা সবাই সেটায় যোগান দিয়েছি মাত্র।

কিন্তু শেষে নিজেদের ফাঁদে নিজেরাই পড়ে জব্দ হবো কে জানত!

সব দিক বেঁধে-ছেঁদেই ব্যবস্থা করেছিলাম কিন্তু কোথায় যে ছিদ্রটুকু ছিল, আগে ধরতে পারি নি।

শিবু দামী কার্ডটা ছাপিয়ে এনেছে। তার আগে ঘনাদার দিবানিদ্রার সুযোগে আমরা ক'জনে মিলে চিঠিটার ভাষার খসড়া করেছি অনেক মাথা ঘামিয়ে।

সুবিধে ছিল এই যে, সে সময়ে বিজ্ঞান-কংগ্রেস হচ্ছে কলকাতাতেই। দেশ-বিদেশের বড় বড় সব বিজ্ঞানের রথী-মহারথীরা এসেছেন এই শহরে। যেন তাঁদেরই একজনের নাম দিয়ে কার্ডটা ছাপানো। ভূগোলবিশারদ নামকরা মানচিত্রকার মঁসিয়ে সুস্তেল, যেন পৃথিবীর অজ্ঞাত দুর্গমতম স্থানের অদ্বিতীয় আবিষ্কারক ও পর্যটক ঘনশ্যাম দাস এই কলকাতা শহরেই সশরীরে উপস্থিত এই আশাতীত খবর পেয়ে, আহ্লাদে গদগদ হয়ে, তাঁকে বিজ্ঞান-কংগ্রেসের এক বিশেষ ভূগোল-বৈঠকে উপস্থিত দেশ-বিদেশের সুধীমণ্ডলীকে তাঁর ভাষণ শুনিয়ে কৃতার্থ করবার জন্যে বিনীত অনুরোধ জানিয়েছেন। কবে ও কখন তিনি স্বয়ং গাড়ি নিয়ে ঘনশ্যাম দাসকে নিতে আসবেন, তাও এ অনুরোধের চিঠিতে জানানো আছে।

আগে থাকতে মহলা দিয়ে যেমন যেমন ঠিক ক'রে রাখা গিয়েছিল, ঠিক সেইমতোই প্রথম অভিনয় সবাই করেছি। বসবার ঘরের মার্কামারা আরামকেদারায় ঘনাদা এসে গা এলিয়ে বসবামাত্র, শিশির যথারীতি তার সিগারেটের টিন সামনে খুলে ধরেছে। আমি লাইটার জ্বেলে সিগারেট ধরিয়ে দিয়েছি সসম্ভ্রমে। ঘনাদা প্রথম-টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে শিশিরের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করেছেন,—কত হলো?

বেশি নয়, এই চার হাজার দু'শ একুশ মাত্র!—শিশির জানিয়েছে সংকুচিতভাবে।

একুশ কেন হবে, উনিশ না?—ঘনাদার ভ্রূ কুঞ্চিত হতে না হতেই শিশির তাড়াতাড়ি পকেট থেকে নোটবই বার ক'রে খুলে দেখে লজ্জায় জিভ কেটেছে।—হ্যাঁ হ্যাঁ উনিশ-ই তো!

ঘনাদা সন্তুষ্ট হয়ে আর একটি টান দিয়ে চোখ দু'টি প্রায় নিমীলিত করার পরই আমি আনন্দে যেন কথাটা চাপতে না পেরে বলেছি,—আমরা কিন্তু সবাই শুনতে যাচ্ছি সেদিন ঘনাদা!

সবাই শুনতে যাচ্ছ!—ঘনাদা চোখ খুলে তাকিয়েছেন।—কি শুনতে?

বাঃ, আপনার বক্তৃতা!—আমি যেন ঘনাদার বিস্মৃতিতে অবাক হয়েছি।

ঘনাদা দন্তস্ফুট করার আগেই শিশির সোৎসাহে বলে উঠেছে,—একেবারে ভোরবেলা থেকে 'কিউ' দিতে হবে কিন্তু। নইলে জায়গা মিলবে না।

ভোরবেলা থেকে কি!—শিবু শিশিরকে ধমকেছে,—আগের রাত্তির থেকে বল্! মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলের শীল্ড ফাইন্যাল হার মেনে যাবে দেখিস্। সায়েন্স কংগ্রেসে একটা দাঙ্গাহাঙ্গামা না হয়ে যায় না!

ঘন ঘন সিগারেট টানা আর চোখ-মুখের ভাব দেখেই ঘনাদার অবস্থাটা বুঝতে পারা গেছে তখন। নেহাত মানের দায়েই সোজা-সুজি রহস্যটা সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারছেন না।

শেষপর্যন্ত ধৈর্য ধরতে আর পারেন নি। যথাসম্ভব গম্ভীর হয়ে নিজের চাল বজায় রেখে একটু ঘুরিয়ে বললেন,—সায়েন্স কংগ্রেসে আমি বক্তৃতা দিচ্ছি, তোমরা জানলে কোথা থেকে?

কোথা থেকে জানলাম!—আমরা সমস্বরে নিজেদের বিস্ময় প্রকাশ করেছি।

শিবু বিশদ ব্যাখ্যার ভার নিয়েছে,—শহরে কে না জানে! তবে মঁসিয়ে স্যুস্তেল নিজে সব আয়োজন করেছেন আর নিজেই যে তিনি আসছেন আপনাকে নিয়ে যেতে, এটা অবশ্য সবাই জানে না।

ঘনাদার মুখে আশানুরূপ আশঙ্কার ছায়া দেখে আমরা উৎসাহিত হয়ে উঠেছি।

ঘনাদা অস্বস্তিটা বিরক্তির ছলে প্রকাশ করেছেন,—হুঁঃ! মঁসিয়ে স্যুস্তেল বলে তো আমার গুরুঠাকুর নয়! তিনি এসে ধরলেই আমায় যেতে হবে! সায়েন্স কংগ্রেসে বক্তৃতা দেবার জন্যে আমি হেদিয়ে মরছি না কি?

কি যে বলেন ঘনাদা!—শিশির সমস্ত সায়েন্স কংগ্রেসের হয়ে যেন ঘনাদার রাগ ভাঙাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে,—আপনি হেদিয়ে মরবেন কি, হেদিয়ে মরছে তো তারা! এ যে কত বড় সৌভাগ্য তা কি তারা জানে না! নইলে মঁসিয়ে স্থস্তেল নিজে বাড়ি বয়ে এসে আপনাকে নিমন্ত্রণের চিঠি দিয়ে যান!

নিমন্ত্রণের চিঠি! কি চিঠি?—ঘনাদা সত্যিই আকাশ থেকে পড়েছেন। আমরাও একেবারে যেন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছি, —সে কি! নিমন্ত্রণের চিঠি আপনি দেখেন নি? আপনি তখন বিকেলে লেক-এ বেড়াতে গেছেন। মঁসিয়ে স্থস্তেল কত খোঁজ ক'রে এসে কতক্ষণ বসে রইলেন, তারপর আমাদের কাছে চিঠিটা দিয়ে দেখা না হওয়ার জন্যে কত দুঃখু ক'রে গেলেন। বার বার ক'রে বলে গেলেন যে, আপনাকে নিতে তিনি নিজেই পরশু, মানে শনিবার বিকেল চারটেতে আসছেন। সে চিঠি—সে চিঠি, হ্যাঁ গৌরই তো চিঠিটা রাখলে আপনাকে দেবার জন্যে!

আমরা যেন রেগে আগুন হয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এসে গৌরের নাম ধরে ডাকাডাকি শুরু করেছি তারপর। গৌরও শশব্যস্ত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বিরক্তির ভান করেছে,—কি, ব্যাপার কি! হঠাৎ এত চেঁচামেচি কিসের!

চেঁচামেচি কিসের!—আমরা গৌরকে গালাগাল দিতে আর বাকি রাখি নি—আহম্মক, অকর্মার ধাড়ি কোথাকার! কলকাতা শহরের মুখে চুনকালি দিয়ে সায়েন্স কংগ্রেসকে তুমি ডোবাতে বসেছ! মঁসিয়ে স্থস্তেলের সে চিঠি তুমি ঘনাদাকে দাও নি!

গৌর লজ্জায় যেন মাটিতে মিশিয়ে গিয়ে হাতে-হাতে ধরা পড়া চোরের মতো মুখ কাঁচুমাচু করে ঘর থেকে কার্ডটি এনে ভয়ে ভয়ে ঘনাদার হাতে দিয়ে বলেছে—মাপ করবেন ঘনাদা। একেবার মনে ছিল না।

তাচ্ছিল্যভরে কার্ডটা ধরলেও ঘনাদার চোখ দেখে বোঝা গেছে কি মনোযোগ দিয়ে কার্ডটা তিনি পড়েছেন।

কার্ডে কোনো খুঁত যে নেই তা আমাদের জানা, ঘনাদাও নিশ্চয় ধরতে পারে নি।

ভেতরে যাই হোক, বাইরে ঠাঁট বজায় রেখে একটু অবজ্ঞার সুরে বলেছেন—সুস্তেল! দাঁড়াও দাঁড়াও, কোন্ সুস্তেল ঠিক মনে পড়ছে না!

বাঃ—মঁসিয়ে সুস্তেলকে মনে পড়ছে না!—শিশির ঘনাদার স্মৃতিশক্তিকে একটু উস্কে দেবার চেষ্টা করেছে—সেই বিখ্যাত কার্টো-গ্রাফার, মানে মানচিত্রের ব্যাপারে দুনিয়ায় যাঁর জুড়ি নেই বললেই হয়।

হুঁ—সংক্ষিপ্ত একটি ধ্বনিতে যা বোঝাবার বুঝিয়ে, ঘনাদা ঘর থেকে উঠে গেছেন।

তারপর শনিবারদিন সকাল থেকেই আমরা সজাগ। আধা নয়, সে শনিবার কিসের যেন একটা পুরো ছুটি ছিল। দুপুরের খাওয়া দাওয়া পর্যন্ত কিছু হবে না তা জানতাম। কারণ ছুটির দিন বলে সকালে বাজারটা একটু ভালোরকম করা হয়েছে। মাছের থলের বড় বড় গলদা চিংড়িগুলো ঘনাদাকে কায়দা ক'রে দেখিয়ে রাখতে ভুলি নি।

বেলা একটা নাগাদ ভুরিভোজ শেষ হবার পরই আমাদের সজাগ থাকার সময়।

এবারের সজাগ থাকা একটু অবশ্য আলাদা ধরনের। ঘনাদা পাছে পালিয়ে যান সেই ভয়ে পাহারা দেওয়া নয়, তিনি কোন্ ফাঁকে কিভাবে মেস থেকে সরে পড়েন, নিজেরা গা-ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে তাই দেখে মজা করা।

দুপুরের খাওয়ার সময়ই জমি তৈরি ক'রে রাখা হয়েছে। ভরপেট খেয়ে আমাদের সকলেরই যেন ঘুমে চোখের পাতা জুড়ে আসছে। ছুটির দিন বলে সেদিন আর তাই খেলাধুলো আড্ডা নয়, যে-যার বিছানায় পড়ে ঘুম—এই কথাটাই জানিয়ে রেখেছি।

কিন্তু বিছানায় কতক্ষণ মট্‌কা মেরে শুয়ে থাকা যায়! একটার

পর দুটো বাজল। দুটোর পর তিনটে। ঘনাদা এখনো করছেন কি! ঘরের দরজা জানালা বন্ধ। কান খাড়া ক'রে আছি ঘনাদার পায়ের শব্দের জন্যে। পালা ক'রে জানালার খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে তেতলা থেকে নামবার সিঁড়িটার ওপর চোখও রাখছি, কিন্তু ঘনাদার কোনো সাড়াশব্দই নেই।

তিনটের পর চারটে বাজল। ঘনাদা কি সত্যিই ছাদ ডিঙিয়ে পালালেন! কিন্তু সেদিকেও তো আমাদের রামভুজকে পাহারায় রেখেছি, ঘনাদার সেরকম কোনো চেষ্টা দেখলেই নিচে থেকে 'রামা হো' বলে গান ধরবে। তাহলে? ঘনাদা কি সত্যিই অন্তর্ধানমন্ত্র-গোছের কিছু জানেন না কি!

ঘনাদার ঘরের দিকেই একবার খোঁজ ক'রে আসব কিনা ভাবছি, এমন সময়ে সশব্দে তাঁর ঘরের দরজা খোলার শব্দ শোনা গেল। তারপর তেতলার সিঁড়ির ওপর থেকে তাঁর পাড়া-কাঁপানো ডাক—কই হে! সব গেল কোথায়! দিনের বেলা আর কত ঘুমোবে!

এ ওর মুখের দিকে তাকালাম ফ্যাল ফ্যাল ক'রে। শেষে ঘনাদাই আমাদের খুঁজছেন নিজে থেকে।

ঘনাদার ডাক না শুনে উপায় কি! গুটি-গুটি একে একে ভিজে বেড়ালের মতো তাঁর তেতলার ঘরে গিয়ে ঢুকলাম।

শিবু ওরই মধ্যে একটু নিজেদের মুখরক্ষার চেষ্টা ক'রে বললে,—আপনি এখনো তৈরি হন নি ঘনাদা! চারটের সময়ে না আপনাকে নিয়ে যাবার কথা!

নিজের আধময়লা ফতুয়া আর ধুতিটার দিকে একবার চেয়ে বিছানার মাঝখানটিতে উঠে বসে ঘনাদা অদ্ভুত মুখভঙ্গি ক'রে বললেন,—আর কি তৈরি হবো! কেন এই সাজে যাওয়া যাবে না?

বাধ্য হয়ে এ-বিদ্রূপও হজম করতে হলো। শিবু আর একবার ন্যাকা সেজে মান বাঁচাবার চেষ্টা করলে,—মঁসিয়ে স্তেল-এর না আসাটা কিন্তু আশ্চর্য!

ঘনাদা একটু হাসলেন এবার। অবজ্ঞাভরে বললেন,—স্থস্তেল যে আসবে না আমি জানতাম!

আপনি জানতেন!—বেশ সন্ত্রস্ত হয়েই আমরা ঘনাদার দিকে তাকালাম। কিন্তু যা ভয় করছিলাম ঘনাদা সেদিক দিয়ে গেলেন না। শিশিরের দিকে তর্জনী ও মধ্যম আঙুল ফাঁক ক'রে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে অনুকম্পার সুরে বললেন,—হ্যাঁ, জানতাম। আমি ছিলাম না জেনেই সেদিন এসেছিল, নইলে আমার সামনে এসে দাঁড়াবার ওর সাহস নেই।

পরম স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সাগ্রহে এবার উস্কানি দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,—কেন বলুন তো? অমন পৃথিবীজোড়া নাম, অতবড় কার্টোগ্রাফার!

হুঁঃ, কার্টোগ্রাফার! ঘনাদা নাসিকাধ্বনি করলেন।

শিশির তৈরি হয়েই এসেছিল। এতক্ষণে ঘনাদার আঙুলের ফাঁকে যথারীতি সিগারেট বসিয়ে দিয়ে দেশলাই-এর কাটি জ্বেলে ফেলেছে।

ঘনাদা প্রথম-টানটি দিয়ে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে ধোঁয়া ছাড়লেন। আমরা চাতকের মতো তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে। ঘনাদার শ্রীমুখ থেকে কি শুধু ধোঁয়াই বেরুবে?

ধৈর্য ধরতে না পেরে শিবু একটু ঝাঁকুনি দেবার চেষ্টা করলে,—সত্যি কার্টোগ্রাফার নয় বুঝি? জাল?

জাল হবে কেন!—ঘনাদা মৃদু ধমক দিলেন,—আসল কার্টোগ্রাফারই বটে। কিন্তু তাতে হয়েছে কি? নাম-ই গালভরা, আসলে জরিপদারের জেঠা ছাড়া তো কিছু নয়! বনজঙ্গল পাহাড়-পর্বতেরই খবর রাখে। জানে কি 'সোহ্‌ম অ্যাবিস্যাল প্লে-ন' কোথায় আর কতখানি, মেপেছে কখনো 'মুইর' কি 'প্লেটো সি-মাউন্ট' কত উঁচু?

অভিভূতের মতো বললাম,—মঙ্গলগ্রহের ভূগোলে আছে বুঝি? নামও তো কখনো শুনি নি।

ঘনাদা অনুকম্পার হাসি হাসলেন,—তোমাদের ওই স্থস্তেলই

কি জানত! ডোবার পুঁটি হয়ে গেছিল সমুদ্রের তিমির সঙ্গে ফচ্‌কেমি করতে! এই শিশিটা না থাকলেই হতো খতম।

তক্তপোষের ওপর থেকেই হাত বাড়িয়ে পেছনের শেল্‌ফ থেকে যে-শিশিটি তুলে ঘনাদা আমাদের এবার দেখালেন, তাতে আমরা তো থ'।

ওই শিশি! ওটা হোমিওপ্যাথিক ওষুধের না?

শিবুর অসাবধান মুখ এক-মুহূর্তের জন্যে ফস্‌কে গিয়ে প্রায় ঘাটে এসে ভরাডুবি হয়েছিল আর কি!

হোমিওপ্যাথিক!—ঘনাদা প্রায় ফেটে পড়ছিলেন, শিবুই তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বললে,—মানে প্রায় সেইরকম দেখতে কিনা। বোকা লোকেরা তফাত ধরতেই পারবে না।

ঘনাদা ফণা নামালেন, একটু অবজ্ঞাভরে হেসে বললেন,—তোমাদের ওই সুস্তেলও পারে নি। সাত সাগর খুঁজে নারবরো দ্বীপে আমায় চুরি করতে আসবার সময় ও অন্তত জানত না যে, এই শিশির মধ্যে তাদের পরমায়ু লুকোন থাকবে!

আপনাকে চুরি!—হাসি চাপতে গিয়ে বিষম খেয়ে প্রায় যাই আর কি! অতিকষ্টে সেটা সামলে ও কেলেঙ্কারি বাঁচিয়ে বললাম,—এত বড় সাহস!

সাহস নয়, দায়।—ঘনাদার মুখে রহস্যময় হাসি দেখা গেল। আমাদের মুখগুলোর ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে তিনি শুরু করলেন,—নারবরো দ্বীপের নাম নিশ্চয় শোন নি, গ্যালাপ্যাগোসের নামই হয়তো জান না। দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর-পশ্চিমে ইকোয়েডর থেকে প্রায় ছ'শ পঞ্চাশ মাইল দূরের এই কটি ছোট-বড় আগ্নেয়দ্বীপের জটলায় প্রায় সওয়া এক শতাব্দী আগে, সেকালের একটি পালতোলা জাহাজ টহল না দিতে গেলে, বিজ্ঞানের এ যুগের সবচেয়ে একটা দামী মতবাদের জন্মই হতো কিনা সন্দেহ। সে পালতোলা জাহাজের নাম এচ. এস. এম. বীগ্‌ল, সে জাহাজের বৈজ্ঞানিকের নাম চার্লস ডারউইন, আর সে মতবাদ হলো বিবর্তনবাদ।

গ্যালাপ্যাগোস দ্বীপগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো অ্যালবেমার্ল বা ইসাবেলা। দেখতে খানিকটা ইংরিজি জে হরফের মতো। সেই ইসাবেলার মাথার বাঁ দিকে একটি বড় ফুটকি হলো নারবরো দ্বীপ, ফার্নানডিনা-ও বলে কেউ কেউ। পৃথিবীর একমাত্র সামুদ্রিক গির-গিটির জাত সি-ইগুয়ানা-র ভালো ক'রে পরিচয় নিতে সেই দ্বীপে তখন কিছুদিনের জন্যে ডেরা বেঁধেছি। পেরুর লিমা থেকে একটি ছোট ষ্টিমার আমাকে আর আমার এক অনুচর নিমারাকে সেখানে নামিয়ে দিয়ে গেছে। মাসখানেক বাদে আবার সেই ছোট ষ্টিমারই আমাদের নিয়ে যাবে।

আমার অনুচরটি ইকোয়েডরের আদিবাসীর জাত। এমনিতে কাজকর্মে চৌকশ, কিন্তু একেবারে ভীতুর শেষ। একে এই জন-মানবহীন পাথুরে দ্বীপ,তার ওপর চারিদিকের বালির চড়ায় বিদ্‌ঘুটে চেহারার ইগুয়ানারা গিজ্‌গিজ করছে সারাক্ষণ। দু'দিন যেতেই নিমারার ভয়ে প্রায় নাড়ি-ছাড়ার অবস্থা। সে ধর্মে খ্রীস্টান। তার ধারণা কোনো অজানা পাপের শাস্তিতে বেঁচে থাকতেই সে নরকে পৌঁছে গেছে।

আমি যত তাকে বোঝাই যে দেখতে ভয়ংকর হলে কি হয় এ দ্বীপের ওই-সব প্রাণী একেবারে নিরীহ, মানুষকে পর্যন্ত তারা ভয় করতে শেখে নি, আর লড়াই-এর পাঁয়তাড়া কষলেও নিজেদের মধ্যেও রক্তারক্তি মারামারি কখনো করে না, কিন্তু ভবী ভোলবার নয়। রাত্রে সে ভালো ক'রে ঘুমোয় না পর্যন্ত। তার বিশ্বাস চোখের দু'পাতা এক করলেই সাক্ষাৎ শয়তানের ওসব দূত চুপিচুপি হানা দিয়ে তাঁবু সুদ্ধ আমাদের চিবিয়ে শেষ ক'রে দেবে।

নিমারার অবস্থা দেখে বেশ একটু ভাবনাতেই পড়ে গেলাম। খাওয়া নেই, ঘুম-নেই, লোকটা শেষপর্যন্ত পাগলই হয়ে যাবে নাকি! সঙ্গে যে ক্ষুদে ওয়্যারলেস ট্র্যান্‌সমিটারটি ছিল তাই দিয়ে লিমাতে যেদিন ষ্টিমারটা তাড়াতাড়ি পাঠাবার জন্যে খবর দিয়েছি, সেই রাত্রেই নিমারা একেবারে ক্ষেপে গেছে মনে হলো।

সারাদিনের ঘোরাফেরার পর ক্লান্ত শরীরে সবে তখন খাওয়া-দাওয়া সেরে একটু ঘুমিয়েছি, হঠাৎ নিমারা হুড়্মুড় ক'রে তাঁবুর দড়িদড়া ছিঁড়ে কাঁপতে কাঁপতে আমার একেবারে গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

বাঁচান, হুজুর বাঁচান!

ধড়মড়িয়ে জেগে উঠে প্রথমটা তো তাকে একটি চড় কষাতেই যাচ্ছিলাম। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে জিজ্ঞাসা করলাম রেগে,—কি, হয়েছে কি!

এবার শয়তান নিজেই এসেছে হুজুর। আর রক্ষে নেই!

রক্ষে যদি নেই জানিস তো আমার ঘুম ভাঙালি কেন হতভাগা! বিছানা থেকে উঠে পড়ে বললাম,—কই কোথায় তোর শয়তান, দেখাবি চল।

নিমারা সহজে কি যেতে চায়। শয়তানকে একবার সে দেখে এসেছে, আর একবার সামনে গেলেই তার দফা রফা এ-বিষয়ে তার কোনো সন্দেহ নেই।

কোনোরকমে টানা-হেঁচ্ড়া ক'রে তাকে বাইরে নিয়ে গিয়ে, তার ভীত ইশারায় যা দেখলাম তাতে আমারও চক্ষুস্থির!

নারবরো দ্বীপের মাঝখানে মরা আগ্নেয়গিরির প্রায় চূড়ার কাছে আমাদের তাঁবু খাটানো হয়েছে।

কৃষ্ণপক্ষের রাত। চারিদিকের সমুদ্রে যেন গাঢ় নীল কালি গোলা। সেই গাঢ় নীলকৃষ্ণ সমুদ্রের জলে নারবরো আর ইসাবেলা দ্বীপের মাঝখানের সংকীর্ণ প্রণালীতে বিরাট কি একটা জলজন্তু ভাসছে দেখতে পেলাম। সেটাকে সবচেয়ে বড় জাতের নীল তিমি বা সিবাল্ড'স্ ররকোয়াল ভাবতে পারতাম, কিন্তু নীল তিমিও তো ছেষট্টি-সাতষট্টি হাতের বেশি লম্বায় কখনো হয় না। তা ছাড়া নীল তিমির গা থেকে থেকে-থেকে এরকম আলো ঠিক্‌রে বেরোয় বলে তো কখনো শুনি নি। গ্যালাপ্যাগোসের সবই অদ্ভুত। অতল সমুদ্রের কোনো অজানা বিরাট বিভীষিকাই আমার দেখবার সৌভাগ্য হলো নাকি?

দেখতে দেখতে বিরাট জলজন্তুটা সমুদ্রে ডুবে গেল। নিমারা তখন আর দাঁড়াতে না পেরে বসে দু'হাতে মুখ ঢেকেছে।

তাকে ধমক দিয়ে বললাম,—অত ভয়ের কি আছে। তোমার শয়তান তো সমুদ্র থেকে ডাঙায় ওঠে নি। তা ছাড়া নিজেই সে ভয়ে ডুবে মরেছে চেয়ে দেখ।

চোখ না খুলেই নিমারা বললে,—না হুজুর, ও শুধু শয়তানের ছল। এখন ডুব দিয়েছে কিন্তু দেখবেন ঠিক আবার অন্য মূর্তিতে এসে হাজির হবে।

নিমারার কথাই এক দিক দিয়ে অক্ষরে অক্ষরে তার পরদিন ফলল বলা যায়।

রাত্রে-দেখা সেই অজানা বিশাল জলচরের কথা মাথায় থাকলেও, রোজগার মতো সকালে বেরিয়ে ক্যামেরায় ক'টি অদ্ভুত প্রাণী ও দৃশ্যের ছবি তখন তুলেছি। নারবরো দ্বীপে হিংস্র প্রাণী একেবারে নেই বলা ঠিক নয়। একধরনের সাপই এই অহিংসার রাজ্যের কলঙ্ক। একটা ফণিমনসা জাতের অদ্ভুত গাছের ঝোপে সেই সাপের একটি বড় গিরগিটি ধরে খাওয়ার ছবি তন্ময় হয়ে তুলছি, এমন সময় পিঠে একটা খোঁচা খেয়ে চম্‌কে উঠলাম।

নিমারার অবস্থা কাহিল। তাকে তাঁবুতেই রেখে এসেছি শুইয়ে। সুতরাং হঠাৎ একেবারে ক্ষেপে গেলেও সে এমন চুপিচুপি এসে আমার পিঠে নিশ্চয় খোঁচা দেবে না। তাহলে এই জনমানবহীন দ্বীপে কে এসে আমার পিছনে দাঁড়িয়ে খোঁচা দিয়েছে!

বলতে এতক্ষণ লাগলেও পলকের মধ্যে এসব ভাবনা বিদ্যুতের মতো মাথার মধ্যে খেলে গেল। তারপর পেছন ফিরতে যাচ্ছি, পিঠে আরো জোরে একটা খোঁচার সঙ্গে ভারি গম্ভীর গলার শাসানি শুনতে পেলাম—ফেরবার চেষ্টা কোরো না, যেমন আছ সেইভাবে এগিয়ে চল। তোমার পিঠে দোনলা বন্দুক ঠোকানো, তা বোধ হয় বুঝেছ।

শুধু ঐটুকুই নয়, আরো অনেক কিছুই তখন বুঝে ফেলেছি। কথাগুলো ফরাসিতে বলা হলেও তাতে একটু বাঁকা টান। আল-জিরিয়া কি মরক্কোতে যারা কয়েক পুরুষ কাটিয়েছে সেই ফরাসিরা যেভাবে কথা বলে সেই রকম কতকটা। আশ্চর্যের বিষয়, এই গলার আওয়াজ আর এই কথার টান কেমন যেন আমার চেনা বলেই মনে হলো। কিন্তু তাই বা কি ক'রে সম্ভব?

কয়েক পা হুকুমমতো এগিয়ে গিয়েই হঠাৎ হেসে উঠে ফিরে দাঁড়ালাম। 'খবরদার!' হাঁকের সঙ্গে সঙ্গে একটি বন্দুক আর একটি রিভলভার আমার দিকে উঁচিয়ে উঠল।

রিভলভার যার হাতে, তালগাছের মতো লম্বা রোগা পাকানো বুড়োটে-চেহারার সে লোকটিকে কখনো দেখি নি, কিন্তু দোনলা বন্দুক আমার পিঠে ঠেকিয়ে যে হুকুম করেছিল, শুধু গলা শুনেই তার পরিচয় ঠিকই অনুমান করেছিলাম। যাকে দেখলাম সে তোমাদের এই স্লুস্তেল।

গৌর হঠাৎ একটা হেঁচকিই যেন তুললো মনে হলো।

ঘনাদা কথা থামিয়ে সন্দিগ্ধভাবে তার দিকে চাইতেই আমরা বলে উঠলাম—জল খেয়ে নে না একটু।

জল খাব কি!—গৌরই খেঁকিয়ে উঠল আমাদের—ঘনাদার দিকে দু' দুটো বন্দুক ওঁচানো না? তা বন্দুক আর রিভলবার তারা ছুঁড়ল তো?

না।—ঘনাদার মুখে রহস্যময় হাসি।

গুলি ছিল না বুঝি? না, খেলার বন্দুক?—শিশিরের বোকার মতো প্রশ্ন।

খেলার বন্দুক নয়, গুলিও ছিল। ঘনাদার মুখ আবার গম্ভীর হলো।

তবে?—আমরা সবাই বেকুব।

ঘনাদা আবার হাসলেন,—গুলি ছুঁড়বে কি ক'রে? সেই কথাই হাসতে হাসতে তাদের বললাম। বললাম—কই, ছোঁড় গুলি!

দেখি। একটু চুপ ক'রে থেকে হতভম্ব মুখগুলো একটু উপভোগ ক'রে আবার বললাম,—ভড়কিতে আর লাভ কি! সারা ছুনিয়া চুঁড়ে এই অখদ্দে দ্বীপে আমায় গুলি ক'রে মারবার জন্যে হানা যে দাও নি তা বুঝেছি। এখন মতলবটা কি খোলাখুলিই বল।

খোলাখুলিই বলছি।—বুড়োটে লম্বা লোকটিই বজ্রগম্ভীর স্বরে ভাঙা-ভাঙা ইংরিজিতে এবার কথা বললেন, আমাদের সঙ্গে আপনাকে যেতে হবে।

কোথায়? কেন?

জানতে পাবেন না—বুড়োর মুখ নয় যেন লোহার মুখোশ।

তাহলে কি ক'রে যাই বলুন! ভাঙা-ইংরিজির বদলে যদি নিজের ভাষায় কথা বলতেন তবু আপনার জাতটা, দেশটা কি বুঝতে পারতাম। স্থস্তেলের তো ওসব বালাই নেই। টিউনিশিয়ায় জন্ম, জার্মানিতে শিক্ষা। যুদ্ধের পর রুশেরা কিছুদিন আটকে রেখেছিল বলতো। তারপর ইংলণ্ডের হয়ে অজানা জায়গার মানচিত্র আঁকার ছুতোয় আফ্রিকায় আর বলিভিয়ায় ইকোয়েডরে কিছুদিন ঘোরাঘুরি ক'রে হঠাৎ একদিন নিরুদ্দেশ হয় বলে সবাই জানে। আপনাদের মতো ছুই অজানা আঘাটার মানুষের সঙ্গে কিছু না জেনে যেতে কি মন চায়।

এত কথা যে সুযোগের জন্যে বলছিলাম তা এবার মিলে গেল। স্থস্তেল আমার টিটকারিতে এতক্ষণ রাগে ফুলছিল। আমার কথা শেষ হতেই হুংকার দিয়ে উঠল,—তবু তোকে যেতেই হবে শুঁটকো বাঁদর। ভালয় ভালয় না যাস তোর মতো পুঁচকে ফড়িংকে ছু' আঙুলে টিপে নিয়ে যাব।

তা চেহারার দিক দিয়ে স্থস্তেল সে তম্বি করতে পারে। স্থস্তেলকে তো দেখেছ? মাংসের একটা পাহাড়, কিং কং তার কাছে কোন্ ছার!

কিন্তু আমরা যে রোগা চিম্‌সে দেখলাম!—এমন একটা সুবিধে ছাড়তে না পেরে শিবু ফস্ ক'রে বলে ফেললে।

সে তাহলে ভুগে ভুগে হয়েছে। তিন মাইল সমুদ্রের তলায় তিন তুকুনে ছ'হপ্তা ডুবে থাকা তো চারটিখানি কথা নয়! সেই থেকেই ওর অসুখ।—অম্লান বদনে শিবুর খোঁচা এবার অগ্রাহ্য ক'রে আমাদের সত্যিকার হাঁ ক'রে দিয়ে ঘনাদা আবার শুরু করলেন,—তখন সে একটা দৈত্যবিশেষ। কিন্তু গর্জনের সঙ্গে আচম্‌কা আমার একটি হাইকিক্-এ হাতের বন্দুকটা ছিট্‌কে পড়তেই প্রথমটা একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। তারপর মনে হলো বুনো ক্ষ্যাপা একটা হাতিই ছুটে আসছে আমার দিকে। ডিগ্‌বাজি খেয়ে হাত-পাঁচেক দূরে ছিট্‌কে পড়েও তার রোখ কি যায়! গা ঝেড়ে-ঝুড়ে উঠে, আগুনের ভাঁটার মতো দু'চোখ দিয়ে আমায় যেন ভস্ম করতে এবার সন্তর্পণে দু'হাত বাড়িয়ে এগুতে লাগল। ধোবি-পাটে তাকে রাম-পট্‌কান দেবার জন্যে তৈরি হচ্ছি এমন সময় ঘাড়ে পিঁপড়ের কামড়ের মতো কি একটা জ্বালা পেয়ে ফিরে দেখি, সেই পাকানো লম্বা বুড়ো শয়তানের মতো আমার পিছনে হাতে কি একটা নিয়ে দাঁড়িয়ে।

তারপরে আর জ্ঞান নেই।

জ্ঞান যখন হলো তখন প্রথমটা স্বপ্ন দেখছি কিনা বুঝতে পারলাম না। এ কোথায় এলাম! ছোট্ট একটা জানালা-দরজাহীন কোটর বললেই হয়। ছাদটা এত নীচু যে বিছানার ওপর উঠে বসলেই যেন মাথায় ঠেকে যাবে। নারবরো দ্বীপ বিষুবরেখার ওপরে বলে সেখানে ছিল বেশ গরম, আর এখানে দিব্যি ঠাণ্ডা। তা ছাড়া বাতাসেও কেমন একটা ওষুধ-ওষুধ গন্ধ। স্থির হয়ে ব্যাপারটা ভেবে নিচ্ছি, এমন সময়ে খুট্ ক'রে একটা আওয়াজ হয়ে সামনের দেওয়ালেরই খানিকটা যেন সরে গেল। একগাল হাসি নিয়ে পাহাড়ের মতো শরীরটা কোনোরকমে সেই গা-দরজার ফাঁক দিয়ে গলিয়ে স্মুস্তেল আমার বিছানারই একধারে এসে বসে পড়ে বলল,—যাক্, ঘুম তাহলে ভাঙল এতদিনে।

এতদিনে! মনে যা হলো মুখে তা প্রকাশ করলাম না। বরং

তাচ্ছিল্যের সুরে একটু হেসে বললাম,—ভাঙল নয়, তোমরা ভাঙালে বল! তা, কতদিন ওষুধপত্র দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখলে?

তা মন্দ কি! প্যাসিফিক্-এ শুয়েছ আর অ্যাটলান্টিকে জাগলে। এখন আইসল্যাণ্ড ছাড়িয়ে চলেছি।

হুঁ—একটু চুপ ক'রে থেকে বললাম,—কিন্তু এ নিউক্লিয়ার সাবমেরিনটি কোথায় পেলে? 'অ্যাটমিক স্যব' তো শুধু মার্কিন মুলুকেরই আছে জানতাম।

'অ্যাটমিক স্যব!'—স্থস্তেল সত্যিই চম্‌কে উঠল,—কে বললে তোমায়!

ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে জেনেছি বোধ হয়, যেমন সাত সমুদ্দুর খুঁজে আমায় কি জন্যে চুরি ক'রে এনেছ তাও জানতে পেরেছি!

স্থস্তেল প্রথম অবাক হওয়ার ধাক্কাটা খানিকটা সামলে বললে—কি জন্যে এনেছি বল দেখি?

—যে জন্যে এনেছ অ্যাটলান্টিকের তলা দিয়ে লুকিয়ে যাবার সে একটি মাত্র রাস্তার খোঁজ জিজ্ঞাসা করলে তো আমি এমনিই বলে দিতে পারতাম। তার জন্যে ছুঁচ ফুটিয়ে অজ্ঞান ক'রে চুরি ক'রে আনবার দরকার ছিল না।

দরকার ছিল।—বলে স্থস্তেল একটু হাসল। আন্দাজ তুমি অনেকটা করেছ, সবটা পার নি। অ্যাটলান্টিকের তলায় রিফ্‌ট ভ্যালির খাদের খবর তোমার চেয়ে ভালো কেউ জানে না এটা ঠিক, কিন্তু সে খাদ ছ'কে দেওয়ার চেয়ে বড় কাজ তোমায় দিয়ে করাতে হবে।

ঘনাদা থামলেন। শিবুর কাশিটা মাঝে মাঝে এমন বেয়াড়া হয়ে ওঠে!

ফাঁক পেয়ে, আর ঘনাদার মেজাজ পাছে বিগড়ে যায় এই ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—রিফ্‌ট ভ্যালিটা কি ব্যাপার ঘনাদা?

ঘনাদা খুশি হয়ে বললেন,—পৃথিবীর ওপরকার নয়, অ্যাটলান্টিক সমুদ্রের তলায় এ একটা আঁকাবাঁকা জোড়া পাহাড়ের মাঝখানকার

লম্বা গিরিখাত, আইসল্যাণ্ডের তলা থেকে শুরু হয়ে দক্ষিণ আমেরিকার মাথা ছাড়িয়ে চলে গেছে। এক ধারে মিড্-অ্যাটলান্টিক রিজ্, আর এক ধারে রিফ্ট পাহাড়। এ রাস্তায় কোনো সাবমেরিন চুপিসারে গেলে আমেরিকা কি ইউরোপ হদিসও পাবে না। সুস্তেলের কথায় জানলাম শুধু এই ডোবা গিরিখাত চেনানো নয়, অ্যাটলান্টিকের ক'টি ডুবো পাহাড়ের হদিসও আমায় দিয়ে তারা পেতে চায়। ডাঙার পাহাড়-পর্বতের তুলনায় এ-সব ডুবো পাহাড় যে পেট্রোল থেকে শুরু ক'রে দামী সব ধাতুর কুবেরের ভাণ্ডার, এ খবর তারা জানে।

সমস্ত কথা শুনে একটু হেসে বললাম,—আমায় যদি এতই দরকার তাহলে এ সাবমেরিনটা কাদের আমায় বলা উচিত নয় কি?

অস্বস্তিভরে এদিক-ওদিক চেয়ে সুস্তেল যেন একটু ভয়েভয়েই বললে,—বলতে মানা আছে।

মানা আছে!—তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে তীব্রস্বরে বললাম,—তাহলে দুনিয়ার ওয়াকিব মহলে যা কানাঘুষা চলেছে তা মিথ্যা নয়! আমেরিকা ও রাশিয়া ছাড়া আর একটি গোপন তৃতীয় শক্তি কে বা কারা সত্যিই গড়ে তুলেছে! আমেরিকা কি রাশিয়া যার যে ভুল বা দোষই থাক, তারা মানুষের সত্যি কল্যাণ চায়, কিন্তু এই তৃতীয় শক্তির সে-সব কোনো দুর্বলতা নেই। আর যা-ই হোক, তোমার গায়ে ফরাসি রক্ত তো কিছু আছে, কি বলে শুধু পয়সার লোভে তুমি এদের কাছে নিজেকে বেচে দিয়েছ? নিজের দেশ বলে কিছু না মানো, মানুষ জাতের ওপরও কি তোমার মমতা নেই?

সুস্তেল কিরকম যেন বিহ্বল হয়ে পড়ল। দু'বার ঢোক গিলে বললে,—দেখ দাস, আমার চেহারাটা প্রকাণ্ড হলেও ভেতরে ভেতরে সত্যি আমি দুর্বল। মনের জোর এত কম যে, অন্যায় বুঝেও হঠাৎ প্রলোভনের কাছে হার মেনে বসি। বিশ্বাস কর, যা আমি করেছি

তার জন্যে আমার আফসোসের সীমা নেই। আমি পুরস্কারের লোভে তোমার খবর দিয়ে ওভাবে ধরাবার ব্যবস্থা না করলে, ওরা তোমার খোঁজও পেত না। কিন্তু এখন উপায় কি?

সুস্তেলের কথাগুলো যে আন্তরিক তা তার মুখ দেখেই বুঝলাম। এ কথার উত্তরে যা বলতে যাচ্ছিলাম তা কিন্তু আর বলা হলো না। সেই শয়তানের মতো বুড়ো তখন দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। কামরার ভেতর ঢুকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমায় একবার লক্ষ্য ক'রে সে ভাঙা ইংরিজিতে সুস্তেলকেই বললে,—যা বোঝাবার বুঝিয়ে দিয়েছ তো?

হ্যাঁ, এই দিচ্ছি!—বুড়ো হঠাৎ এসে পড়ায় সুস্তেল একটু যেন ভড়্কে গেছে।

আচ্ছা, বুঝিয়ে কমিটি রুমে এস। এখানে বেয়াড়াপনার শাস্তি যে কি, তাও জানাতে ভুলো না—বলে আমায় একটু সম্ভাষণ পর্যন্ত না জানিয়ে বুড়ো চলে গেল।

বুড়ো যেতেই আগ্রহভরে বললাম,—উপায় কি তুমি জিজ্ঞাসা করেছিলে?

সুস্তেল সভয়ে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে চাপা গলায় বললে,—সাবধান! বেফাঁস আর কিছু বোলো না। এ-ঘরে লুকনো মাইক আছে। তোমার ঘুমের সময় বন্ধ ছিল, এখুনি চালু হবে।

তার কথা শেষ হতে না হতে প্রায় অস্পষ্ট খুট্ ক'রে একটা আওয়াজে বুঝলাম মাইক সজাগ!

কি এখন করা যায়! সুস্তেলকে গোটাকতক কথা এখনি না বললে নয়।

তাকে চোখের ইশারা ক'রে ধীরে ধীরে বললাম—তিন, একশো বাইশ, সাতাত্তর।

সে খানিক হতভম্ব হয়ে থেকে হঠাৎ উৎসাহভরে বললে,—ছয়!

বললাম,—তেইশ, চারশো পাঁচ, এগারো।

স্থুস্তেল তৎক্ষণাৎ উঠে ঐ কামরারই একটি টেবিলের ওপর থেকে কাগজ-পেন্সিল নিয়ে এল।

ব্যাপারটা কি হলো?—আমরা হাঁ ক'রে ঘনাদার দিকে তাকালাম।

কি আর, সাংকেতিক কথা!—ঘনাদা একটু হাসলেন।

সাংকেতিক কথা তো বুঝলাম!—গৌর বললে,—কিন্তু ও তো শব্দ নয়, সংখ্যা। আর আপনি বলতেই স্থুস্তেল বুঝল কি ক'রে?

লোগোগ্র্যাফি জানলেই বুঝবে!—ঘনাদা অনুকম্পাভরে আমাদের দিকে চেয়ে বললেন,—লোগোগ্র্যাফিতে দু' হাজার পর্যন্ত সংখ্যা দিয়ে মোটামুটি সবকিছুই বলা যায়। সকলের অবশ্য অত মুখস্থ থাকে না। সঙ্গে লোগোগ্র্যাফির আলাদা অভিধান রাখতে হয়।

এর পরে আর ট্যাঁ-ফোঁ করবার কিছু নেই, তবু চোখ কপালে তুলে বললাম,—আপনার বুঝি সব মুখস্থ?

ঘনাদার মুখে স্বর্গীয় হাসি দেখা দিতেই শিবু জিজ্ঞাসা করলে, —ওই সব হিজিবিজি অঙ্ক যে বলাবলি করলেন তার মানে কি?

মানে?—ঘনাদা বুঝিয়ে দিলেন,—মানে প্রথমে জিজ্ঞাসা করলাম,—তুমি লোগোগ্র্যাফি জান? স্থুস্তেল তাতে জানালে, হ্যাঁ। তখন তাকে খাতা-পেন্সিল আনতে বললাম।

একটু থেমে আমাদের মুখের চেহারাগুলো দেখে নিয়ে ঘনাদা আবার শুরু করলেন, খাতা-পেন্সিল আনবার পর কাগজে লিখে সব কথাবার্তা সেরে ফেললাম। চুক্তি হয়ে গেল যে দুশমনদের চোখে ধুলো দেবার ফন্দিতে স্থুস্তেল আমার সহায় হবে গোপনে। কিন্তু স্থুস্তেলের সব সাধু-সংকল্প শেষপর্যন্ত তার মনের দুর্বলতায় ভণ্ডুল হয়ে গেল। তার এবং সাবমেরিনের সকলের প্রাণ বাঁচানোর কৃতজ্ঞতাটুকু পর্যন্ত সে দেখালো না। লোগোগ্র্যাফিতে তার কাছে জেনে নিয়েছিলাম যে, নারবরো দ্বীপ থেকে আমায় অজ্ঞান ক'রে

আনবার সময় নিমারাকে সঙ্গে না নিলেও আমার ক'টি দরকারী বাক্স ব্যাগ তারা সাবমেরিনে তুলে নিয়েছিল। আইসল্যাণ্ড ছাড়িয়ে রিফ্‌ট ভ্যালির খাদে সাবমেরিন ঢোকবার পর সেই ব্যাগ আর বাক্স না থাকলে এ-গল্প আর এখানে বসে করতে হতো না। সেইখানেই সাবমেরিনটির কবর হয়ে যেত।

কেন! অ্যাটমিক সাবমেরিন না ?—মুখ থেকে বেরিয়ে গেল আপনা থেকে।

হ্যাঁ, অ্যাটমিক সাবমেরিনও বেগড়ায়। একসঙ্গে তখন ওপরে ভাসিয়ে তোলার আর হাওয়া শোধনের কল গেছে খারাপ হয়ে। সেসব যন্ত্র মেরামত করতে যতক্ষণ লাগবে তার আগেই কার্বন-ডায়ক্সাইড গ্যাসে আমাদের কারুর আর জ্ঞান থাকবে না! সুস্তেলের মুখ তো ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে। সেই শয়তান বুড়ো পর্যন্ত কেমন একটু দিশাহারা।

আমার ব্যাগ থেকে ওই শিশি তখন বার করলাম।

ওই শিশি!—এক সঙ্গে সবাই বলে উঠলাম। ওই শিশিতে সাবমেরিন ভাসল ?

সাবমেরিন ভাসবে কেন ?—ঘনাদা অধৈর্যের সঙ্গে বললেন, হাওয়ার সমস্যা মিটল।

ওই শিশিতে ?—আমরা আবার হাঁ।

—হ্যাঁ ওই শিশিতে! ও-শিশিতে কি ছিল জান ? ক্লোরেলা নামে একরকম আণুবীক্ষণিক ফাঙ্গাস্—যাকে ছত্রাক বা ছাতা বলে। সিকি আউন্স জলে প্রায় চার কোটি ক্লোরেলা থাকে। কার্বন-ডায়ক্সাইড থেকে তাড়াতাড়ি অক্সিজেন ছেঁকে বার করতে তার জুড়ি নেই। শিশি থেকে নানান পাত্রে সেই ক্লোরেলার ফোঁটা জলে ফেলে সমস্ত সাবমেরিনের নানা জায়গায় রাখবার ব্যবস্থা করলাম।

দেখতে দেখতে বদ্ধ হাওয়ার সব বিষ কেটে গেল।

সময়মতো যন্ত্রপাতি মেরামত হলো। তারপর প্রায় একমাস ধরে সমুদ্রের তলায় সমস্ত রিফ্‌ট গিরিখাদ আর মরক্কোর পশ্চিমের

মাদিরা অ্যাবিস্যাল প্লেন থেকে প্লেটো আর অ্যাটলান্টিস্ সি-মাউন্ট হয়ে সার্গাসো সমুদ্রের উত্তরে সোহম্ অ্যাবিস্যাল প্লে-ন পেরিয়ে বার্মুদা পেডেস্টাল পর্যন্ত অ্যাটলান্টিকের বিশাল অতল রাজ্যের সন্ধান নিয়ে একদিন নিউফাউন্ডল্যাণ্ডের এক নির্জন তীরে গিয়ে উঠলাম।

সেই শয়তান বুড়োর মতলব এবার স্পষ্ট বোঝা গেল। একটি নির্জন খাঁড়িতে ঢুকে সাবমেরিন থামবার পর বুড়ো এসে হঠাৎ বাইরে তার সঙ্গে একটু ঘুরে আসার অনুরোধ জানালে।

হেসে বললাম,—যা কুয়াশার দেশ, এখানে টহল দেবার শখ আমার নেই।

তবু একবার বেড়িয়েই আসি চল না। এখানকার সীল মাছ একটা শিকারও করা যেতে পারে।

প্রতিবাদ নিষ্ফল জেনে ওভারকোট পরে নিয়ে বেরুলাম। দেখলাম শুধু বুড়ো নয়, সুস্তেলও সঙ্গে চলেছে। শিকারের লোভ দেখালেও বন্দুক শুধু বুড়োরই হাতে।

তীর ছাড়িয়ে কিছুদূর যেতেই বুড়ো সোজাসুজি আসল কথা পাড়লে—লুকনো ম্যাপটা এবার দাও দাস।

উঁচিয়ে-ধরা বন্দুকটা অগ্রাহ্য করেই অবাক হয়ে বললাম,—অ্যাটলান্টিকের তলার ম্যাপ! সে তো সাবমেরিনেই আছে।

না,—বুড়োর গলার স্বরে যেন বাজ ডাকল—সে ম্যাপ ফাঁকি। সুস্তেল সব আমার কাছে স্বীকার করেছে। আসল ম্যাপ তুমি নিজের কাছে লুকিয়ে রেখেছ। দাও।

সুস্তেলের দিকে জলন্ত দৃষ্টিতে তাকালাম। সে একেবারে অমানুষ নয়। অত্যন্ত অস্বস্তির সঙ্গে থতমত হয়ে চোখ ফিরিয়ে নিলে।

বুড়োর দিকে ফিরে বললাম,—যদি না দিই?

তাহলেও ও ম্যাপ আমি পাব, শুধু এই নির্জন তীরে তোমায় শেষ নিঃশ্বাস নিতে হবে। কেউ জানতেও পারবে না কিছু।

বুড়ো বন্দুকের সেফ্টি ক্যাচ্টা সরাল।

সুস্তেল হঠাৎ এগিয়ে এসে বললে,—দাঁড়ান, ওই ছুঁচোর জন্যে গুলি খরচ করবার দরকার নেই। একবার আমায় বেকায়দায় কাবু করেছে, তার শোধ আমি নিজে হাতে নিতে চাই।

শোধ সে সত্যিই নিলে। দু'বার আমার প্যাঁচে মাটি নিয়ে তিন-বারের বার আমার পিঠের ওপর ঘটোৎকচের মতো চেপে বসল ঘাড়টা লোহার মতো হাতে আমার পেছনে টেনে ধরে। প্রায় মটকে যায় আর কি!

বুড়ো এবার এগিয়ে এসে সব খুঁজে শেষপর্যন্ত জুতোর সুকতলার নিচে থেকে ভাঁজ করা ম্যাপটা বার ক'রে নিয়ে বললে,—ছেড়ে দাও কালা ভূতটাকে।

ছেড়েই তারা রেখে গেল। তারপর একা সেই জনমানবহীন খাঁড়ির পাড়ে পড়ে রইলাম।

দিন তিনেক উইলো-গ্রাউসের বাসা খুঁজে খুঁজে শুধু ডিম খেয়ে কাটাবার পর, এক সীল-শিকারী দলের মোটর বোট সেখানে না এলে আর ফিরতে হতো না!

ঘনাদা থামলেন। শিশিরের মুখেই আমাদের সকলের প্রশ্ন সবিস্ময়ে বার হলো।

—বলেন কি ঘনাদা! আপনি সুস্তেলের কাছে হারলেন, আবার যে ম্যাপের জন্যে এত, তাও ওরা কেড়ে নিলে!

ঘনাদা রহস্যময় হাসি হেসে বললেন,—সুস্তেলের কাছে না হারলে ঐ জাল ম্যাপ ওরা বিশ্বাস ক'রে কেড়ে নিয়ে যায়! সুস্তেলের সঙ্গে গোপনে ঐ বোঝাপড়া ছিল। সুস্তেলকে ঐটুকুর জন্যেই ক্ষমা করেছি।

অভিভূত হয়ে ঘনাদাকে শেষ একটা সিগারেট ধরিয়ে দিয়ে, যাবার সময় শিশির মেঝে থেকে কি যেন একটা কুড়িয়ে নিল মনে হলো!

নিচে নেমে জিজ্ঞাসা করলাম,—কি একটা কুড়িয়ে নিলি তখন?

শিশির ছেঁড়া পাকানো কাগজটা আমাদের সামনে খুলে ধরে বললে,—আমাদের সব ফন্দি যাতে ফাঁস সেই আসল জিনিস।

দেখি ক'জনে মিলে স্বস্তেলের নামে যে চিঠি বানিয়েছিলাম তারই হাতে-লেখা খসড়াটা। ঘনাদা কখন কোথায় যে কুড়িয়ে নিয়েছেন জানতেও পারি নি।

—

প্র ব ন্ধ

সাগর রহস্য

তোমাদের মধ্যে যারা পুরীতে গিয়েছো তারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছো বিকেলবেলায় জেলেরা নৌকো বোঝাই করে যেসব সমুদ্রের মাছ ধরে আনে, কী অদ্ভুত তাদের চেহারা! যেসব নদীর মাছ দেখে ও খেয়ে আমাদের অভ্যেস, তার সঙ্গে এতটুকু মিল নেই। কোনোটা গোল, কোনোটা চ্যাপ্টা ঢঙের, কোনোটা সাপের মতো লিকলিকে লম্বা। সমুদ্রের প্রাণীদের প্রধান বিশেষত্ব এই যে দেখতে তারা অদ্ভুত। শুধু অদ্ভুত বললে কিছুই বলা হয় না। কোনো-কোনো প্রাণী বিকট ভয়ঙ্কর, আবার কোনো-কোনো প্রাণী অপরূপ সুন্দর। আমাদের দেশে এদেরকে চোখে দেখবার বড় একটা উপায় নেই, এ আমাদের মস্ত বড় দুর্ভাগ্য। ইয়োরোপ আমেরিকার প্রত্যেক বড় শহরেই aquarium (জল-জন্তুর চিড়িয়াখানা) আছে, কিন্তু এত বড় ভারতবর্ষে একটিমাত্র aquarium— মাদ্রাজে। এবং বেশির ভাগ বাঙালীর জীবনেই তা দেখবার সুযোগ ঘটে না।

আমরা ডাঙার জীব। আমাদের এ-রকম মনে হতে পারে যে আমাদের চারিদিকে যেসব গাছ-পালা পশু-পাখি-পোকা দেখতে পাই, তা-ই নিয়েই সমস্তটা পৃথিবী। কিন্তু সমুদ্রের নিচে যে কী বিশাল, রহস্যময় এক জগৎ চিরকাল আমাদের চোখের আড়ালে পড়ে রয়েছে, তা ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। তোমরা জানো যে পৃথিবীর তিনভাগই জল, নোনা জল—মানে, সমুদ্র। সমুদ্র যেখানে সবচেয়ে গভীর, সেখানে প্রায় পাঁচ মাইল গভীর। সমুদ্রের একেবারে উপর থেকে প্রায় এক মাইল নিচে পর্যন্ত নানা রকমের

অসংখ্য জীবের লীলা। তারও নিচে যেসব প্রাণী, তারা এতই আশ্চর্য যে তাদের প্রাণী বলতে ইচ্ছা করে না। তারা জীবন্ত আলো, আর-কিছু নয়।

সমুদ্রের প্রাণীরা ডাঙার জীবদের চাইতে কতটা বেশি জায়গা দখল করে আছে, তা তোমরা সহজেই বুঝতে পারবে। তার উপর, মাছেরা পাখি কি স্তন্যপায়ীর চাইতে অনেক, অনেকগুণ বেশি জন্মায়। আমরা যে-ইলিশ মাছের ডিম খাই, তার প্রত্যেকটা আলপিনের মাথার মতো দানা থেকে একটা মাছ হতে পারতো। এত ডিম, এত মাছ খাওয়া হয় (আর এটা মনে রাখবে যে ইলিশ মাছের ডিম অন্যান্য মাছেরও প্রিয় খাদ্য), তবু তো দ্যাখো, বাংলা-দেশের নদীতে ইলিশ মাছের শেষ নেই। আর সমুদ্রের মাছেদের মধ্যে অবিশ্রান্ত ভয়ঙ্কর খাওয়া-খাওয়ি চলছে। ছোট-বড় নির্বিশেষে সমুদ্রের জীবেদের অপরিসীম খাওয়ার ক্ষমতা ও অবিশ্বাস্য হিংস্রতা। মারো কি মরো, এই যেন জলের জঙ্গলের মূল কথা। দু'ইঞ্চি লম্বা মাছ তার দু' তিনগুণ বড় মাছকে আক্রমণ করতে ভয় করে না, এবং অনেক সময় নিরাপদে পেটের মধ্যে চালান করেও দেয়—এ-রকম ঘটনা এক সমুদ্রেই সম্ভব। এদের খিদে কখনো যেন মেটেই না। প্রত্যেক মাছ অন্য প্রত্যেককে খেতে প্রস্তুত ; এবং আত্মরক্ষা ও আক্রমণের জন্য যে এদের কতরকমের আলাদা কলকৌশল, তা ভাবলে প্রকৃতিকে বাহাদুর করিগর বলতে হয় বটে।

এই ভীষণ খাওয়া-খাওয়ি, কামড়া-কামড়ি সত্ত্বেও সমুদ্রের জীবে-দের উজাড় হয়ে যাওয়ার কোনো লক্ষণই নেই, কেননা বিপুল সংখ্যায় এরা জন্মায়। যত দূর পর্যন্ত সূর্যের আলো পৌঁছয়, সমুদ্রের প্রত্যেক কোণ-ঘুপচি প্রাণের অসংখ্য বিচিত্র আকারে কিল্‌বিল্‌ করছে। তারও নিচে, যত দূর জানা গেছে, জানোয়ারের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। মোট সংখ্যায়, ডাঙার জীবের চাইতে জলের জীব নিশ্চয়ই এত গুণ বেশি যে কোনো রকম তুলনাই হয় না। এক চামচে সমুদ্রের জল অণুবীক্ষণের নিচে রাখলে তাতে দেখা যাবে

অণুন্‌তি পোকা—এত ছোট যে সাদা চোখে ধরা পড়ে না। সমুদ্রের অনেক সাধারণ মাছ (মানুষ যেসব খায়) শুধু ঐ পোকা খেয়েই থাকে। সমুদ্রে প্রাণের অফুরন্ত বৈচিত্র্য। গাছ আর প্রাণীর মাঝামাঝি জীব থেকে (আমাদের নিত্য ব্যবহারের স্পঞ্জ যার একটা উদাহরণ) বিরাট তিমি পর্যন্ত সব রকম জীবেরই সেখানে ছড়াছড়ি।

তিমি

আজ তিমির কথা বলি। এটা তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে তিমি, মাছ নয়, স্তন্যপায়ী জন্তু। এবং বর্তমানে তিমির চেয়ে বৃহদাকার জন্তু পৃথিবীতে নেই। অ্যাটলান্টিক ও প্যাসিফিক মহাসাগর এর বিহারভূমি। বিশেষ করে, উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর কাছাকাছি সমুদ্রে তিমি খুব বেশি দেখা যায়। অবশ্যি জ্যান্ত, এমন কি, মরা তিমি চোখে দেখবার সৌভাগ্য পৃথিবীতে খুব কম লোকেরই হয়। বিষুবরেখার উত্তরে ও দক্ষিণে অনেক দেশেই তিমি মারা একটি প্রধান ব্যবসা। মেরু অভিযানে যাঁরা যান তাঁদেরও মাঝেমাঝে তিমির সঙ্গে দেখাশোনা হয়ে থাকে। আমাদের অবিশ্যি ছবি দেখে এবং বই পড়েই তৃপ্ত থাকতে হবে। বড় জোর কলকাতার যাদুঘরে তিমির যে-কঙ্কাল আছে, সেটা তোমরা দেখে আসতে পারো। তাতে এই জানোয়ারের বিশাল আকার সম্বন্ধে খানিকটা অন্তত ধারণা হবে।

তিমি সাধারণত জলের উপরকার স্তরেই থাকে, কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য, কি অন্য বিশেষ কোনো কারণে সে এমন গভীর ডুব দিতে পারে, পৃথিবীর অন্য কোনো জন্তুর পক্ষে যা সম্ভব নয়। এক ডুবে সে এক মাইল নিচে পর্যন্ত নামতে পারে—ভাবতে পারো! শরীরের উপর এক মাইল জলের চাপ যে কী ভয়ঙ্কর তা তোমরা ধারণা

করতে পারবে না। আর সমুদ্রটা যেন বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা, এক এক স্তরে এক এক দল জানোয়ারের রাজত্ব। কম জলের জীব কোনো রকমেই গভীর জলে বাঁচতে পারে না, গভীর জলের জীব কোনো কারণে উপরে উঠে এলে তৎক্ষণাৎ মরে যাবে। তিমির পক্ষে, তাই, এক মাইল জলের চাপ সহ্য করতে পারা একটা ভয়ানক কৃতিত্ব। একবার একটা তিমি হার্পুনের (harpoon—তিমি মারবার জন্য বল্লমের মতো অস্ত্র) খোঁচা খেয়ে এমন নিদারুণ জোরে ডুব মারে যে জলের নিচের মাটিতে গিয়ে ঠেকে মাথার খুলির হাড় ভেঙে ফেলে। আর কোনো রকমে একবার তলাকার মাটিতে গিয়ে ঠেকলে তিমি একেবারে অসহায় হয়ে পড়ে। বাতাসে সে নিঃশ্বাস নেয়, মাঝে-মাঝে নিঃশ্বাস নেবার জন্য জলের উপরে তাকে মুখ তুলতেই হয় এবং আবার ডুব দেবার আগে সে কয়েকবার ঘনঘন ঝড়ের মতো বেগে নিঃশ্বাস নিয়ে নেয়।

বড় জাতের তিমির দাঁত থাকে না। দাঁতের বদলে উপরকার হাঁ থেকে ঝোলানো শিঙের মতো এক রকম জিনিস থাকে, তাকেই Whalebone কি baleen বলে। ব্যবসার দিক থেকে এই ব্যালীন খুব মূল্যবান জিনিস। ব্যালীন আর তার গায়ের তেলের জন্যেই তিমি মারতে মানুষের এত উৎসাহ। 'ব্যালীন' তিমির স্বভাব অপেক্ষাকৃত নিরীহ—দাঁত না-থাকার জন্যেই। তার মুখে এই ব্যালীন জিনিসটা ঝাঁজরার মতো ফুটো-ফুটো করা। এদের খাবার প্রণালীটা বড় চমৎকার। বিশাল গহ্বরের মতো মুখ খুলে সমুদ্রের ভিতর দিয়ে এরা ছুটে চলে, রাশি-রাশি জল মুখের মধ্যে গিয়ে ঢোকে। তারপর এরা মুখ বন্ধ করে দেয়, ব্যালীনের ঝাঁঝরার ভিতর দিয়ে সমস্তটা জল ছুটে বেরিয়ে আসে, কিন্তু সেই জলের সঙ্গে অসংখ্য যেসব ছোট-ছোট প্রাণী ঢুকেছিল তারা আটকে যায়। বড় জানোয়ার এরা খেতে পারে না। চিংড়ি জাতীয় ছোট মাছ লক্ষ-লক্ষ খেয়ে এদের বিরাট শরীর পোষণ করতে হয়। বিখ্যাত গ্রীনল্যাণ্ড-তিমি আর নীল তিমি (Blue whale) এই জাতের। নীল তিমি লম্বায়

একশো ফুটেরও বেশি পাওয়া গেছে। এই নীল তিমি সমস্ত জীবন্ত জানোয়ারের মধ্যে সবচেয়ে বড় তো বটেই, বোধ হয় পৃথিবীতে এত বড় জানোয়ার কোনোকালেও ছিল না।

গ্রীনল্যাণ্ড-তিমির আর-এক নাম Right whale। নীল তিমির চেয়ে ছোট হলেও, এরাও আকারে কিছু কম নয়—সত্তর-আশি ফুট পর্যন্ত যায়। এদেরই whalebone সবচেয়ে বিখ্যাত এবং সেই বস্তুর লোভে মানুষ এদের মেরে-মেরে প্রায় শেষ করে ফেলেছে।

দেঁতো তিমির মধ্যে সবচেয়ে বড় Sperm whale (এদের আর এক নাম ক্যাশালট—cachalot)। এরা পঞ্চাশ-ষাট ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়, দাঁতওয়ালা জানোয়ারের মধ্যে সবচেয়ে বড়। মস্ত পিপের মতো মাথা এদের বিশেষত্ব। গরম দেশের সমুদ্রে এরা ঘুরে বেড়ায়, মেরুর কাছাকাছিও এদের দেখা যায়। এদের শুধু এক পাটি দাঁত—নিচের পাটি—কিন্তু সে দাঁত মস্ত আর অসম্ভব তার জোর। অক্টোপাস জাতীয় জানোয়ার এদের প্রিয় খাদ্য। এরা ডুবুরের সেরা, এক ঘণ্টা পর্যন্ত ডুব দিয়ে থাকতে এদের কষ্ট হয় না। পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্র এরা চষে বেড়ায় খাদ্যের খোঁজে ; ডুব দিয়ে থেকে অক্টোপাস শিকার করে। একবার একটা স্পার্ম-তিমির পেটের মধ্যে একটা অক্টোপাস পাওয়া গিয়েছিল—শুঁড় (tentacle) নিয়ে সাতাশ ফুট লম্বা। গ্রীনল্যাণ্ড-তিমির মতো মানুষ এদেরও মেরে-মেরে প্রায় শেষ ক'রে এনেছে—তার কারণ এদের গায়ের তেল খুব মূল্যবান।

আকারে অনেক ছোট, কিন্তু স্বভাবে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হচ্ছে গ্র্যাম্পাস-তিমি (Grampus)। এরা সাত্যিকারের মাংসাশী—মানে মাছে এদের রুচি নেই। সীল প্রভৃতি সমুদ্রের অন্যান্য স্তন্যপায়ী জন্তু ও পেঙ্গুইন পাখি এদের প্রধান খাদ্য। এরা এমন দুর্দান্ত হিংস্র যে এদের বলাই হয় খুনে-তিমি (Killer whale)। এরা বড় জোর কুড়ি-তিরিশ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়, কিন্তু দল বেঁধে বিরাট ব্যালীনকে আক্রমণ করতেও এরা ভয় করে না। সব তিমিই দল বেঁধে চলে, কিন্তু এই খুনে তিমির ঝাঁক সমুদ্রের অন্য সব জন্তুর পক্ষেই একটা

আতঙ্ক। দারুণ বেগে এরা চলে; দু'সারি ভয়ঙ্কর দাঁত দিয়ে যে কোনো শিকারকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে। বিশাল ব্যালীনকে মারবার এদের পদ্ধতিটা শোনো। দু'জন 'খুনে' দু'দিক থেকে ব্যালীনের নিচের হাঁ-টা জোর করে টেনে ধরে, আর বাকি সবাই তার গায়ের উপর চড়ে প্রকাণ্ড লম্বা লেজ দিয়ে প্রাণপণে বাড়ি মারতে থাকে। এই অত্যাচার চলতে থাকে, যতক্ষণ না ব্যালীন তার হাঁ খুলতে বাধ্য হয়। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত 'খুনে'র দল সেই বিশাল মুখের মধ্যে ঢুকে পড়ে জিভটাকে টেনে কামড়ে খেয়ে শেষ করে। আর তারপর বাকি ব্যালীনের কী অবস্থা হয় সহজেই বুঝতে পারো।

তারপর নিরীহ জলের পাখি পেঙ্গুইন শিকার করবারও এদের অদ্ভুত কায়দা। এদের গায়ের রঙ এত সাদা যে জলের মধ্যে চট্ করে দেখা যায় না বলে এরা মস্ত সুবিধে পায়। কিন্তু খুব কাছে এসে পড়লে পেঙ্গুইনরা তাড়াতাড়ি জল ছেড়ে বরফের উপর উঠে আসে। তখন এরা শরীরের চাপ দিয়ে বরফ ভেঙে ফেলে—যাতে পাখিগুলো ফের জলের মধ্যে পড়তে বাধ্য হয়।

হার্বার্ট জি. পন্টিং নামে এক ভদ্রলোক ক্যাপ্টেন স্কটের সঙ্গে তাঁর শেষ দক্ষিণ-মেরু অভিযানে যান। এই 'খুনে' তিমি সম্বন্ধে তাঁর এক অশ্চর্য অভিজ্ঞতা হয়। সেই গল্প তাঁর মুখ থেকেই তোমরা শোনো :

'আমাদের জাহাজ Great Ice Barrier-এর কাছাকাছি আসতেই অনেকগুলো খুনে তিমি হঠাৎ জল থেকে মাথা তুলে নিঃশ্বাস ছাড়লে। পরের দিন রস্ দ্বীপের কাছাকাছি বিশাল তুষার প্রান্তরের গা ঘেঁষে জাহাজ নোঙর করা হলো। একটু পরে, আমি যখন স্লেজে চড়ে বরফের উপর দিয়ে রওনা হতে যাচ্ছি, হঠাৎ আটটা খুনে তিমি জাহাজের কাছে এসে ভীষণ জোরে কয়েকবার নিঃশ্বাস ছেড়ে আবার ডুবে গেল।

আমি তাড়াতাড়ি ক্যামেরা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম—এদের ছবি তুলতেই হবে। বরফের প্রায় ধারে এসে দাঁড়িয়েছি এমন সময় হঠাৎ

আমি চমকে উঠলাম। আমার পায়ের নিচের বরফ হঠাৎ যেন কেঁপে উঠলো, তারপর টুকরো-টুকরো হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে গেল। আর তার তলা থেকে উঠে এল আটটা 'খুনে', পাশাপাশি তাদের মাথা। একটার মাথা আমার থেকে দু'গজের বেশি দূরে হবে না।

আমি চমকে টলে উঠলাম। কিন্তু আমার কপাল ভালো, সেই ধাক্কায় আমি পিছনে সরে গেলাম। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লে আর রক্ষে ছিল না। খুনেরা মাথা তোলবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা গুম্‌গুম্ শব্দ শোনা গেল। প্রায় এক গজ পুরু বরফ পিঠের চাপ দিয়ে-দিয়ে ওরা ভেঙে ফেলছে। তারপর আমার চারিদিকে তুমুল তোলপাড় তুলে ওরা সেই বরফের টুকরোটাকে এমন প্রবলভাবে দোলাতে লাগলো যে তার উপর দাঁড়িয়ে থাকাই আমার পক্ষে দায় হয়ে উঠলো।

তারপর সেই আটটা তিমি একসঙ্গে হাঁ করে আমার দিকে এগিয়ে এল। দূর থেকে আমি ক্যাপ্টেন স্কটের গলা শুনলুম, 'লাফিয়ে এসো, শিগগির লাফিয়ে এসো, ছুটে চলে এসো।' কিন্তু কী করে ছুটবো—আমার চারিদিকে চল্লিশ গজ পর্যন্ত বরফ ভেঙে গেছে। আমি টুকরো থেকে টুকরোয় লাফিয়ে আসতে লাগলুম—আমার পায়ের নিচে তিমিগুলো জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে আর ভীষণ শব্দ করে বরফের টুকরোগুলো উল্‌টিয়ে ফেলছে। ভাঙা টুকরোগুলো স্রোতে ভেসে যাচ্ছে, আর দৃঢ় তুষারের সবচেয়ে কাছে এসে পৌঁছিয়েই আমাকে সব আশা ছাড়তে হলো। কেননা মাঝখানে এতটা ফাঁকা যে লাফ দিতে গেলেই নিশ্চিত জলে পড়বো।

তারপর একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটলো। স্রোতের ঠেলায় কি তিমিদের তোলপাড়ের ধাক্কায়, যে-টুকরোটার উপর আমি দাঁড়িয়ে ছিলুম তা কাছে সরে এল—এক লাফে আমি নিরাপদ দৃঢ় তুষারে উঠে এলুম। আর এক মুহূর্ত দেরি হলেও রক্ষে ছিল না। পিছনে তাকিয়ে দেখলুম, ঠিক যেখানটায় আমি লাফ দিয়েছিলুম, সেখান থেকে প্রকাণ্ড কালো একটা মাথা উঠে আসছে। খুলে গেল বিশাল

হাঁ, দেখলুম তার ভয়ঙ্কর দাঁতের সারি। এক-এক করে সবগুলো তিমিই মাথা তুলে মুখ খুলে দেখালো তাদের ভয়ঙ্কর দাঁত। আমার কী হলো, যেন তা-ই দেখতে চায়। কিন্তু আমি তখন সব বিপদের বাইরে।'

ক্যাপ্টেন স্কট এই ঘটনা সম্বন্ধে লিখেছিলেন : 'এটা অবিশ্যি আমরা সবাই জানতুম যে খুনে-তিমিরা তুষার প্রান্তরের কাছাকাছি ঘুরে বেড়ায়—যদি কারো সেখান থেকে জলের মধ্যে পড়ে যাওয়ার দুর্ভাগ্য হয় তাকে তৎক্ষণাৎ লুফে নেবে। কিন্তু ওদের যে এত দূর দল-বাঁধা ধূর্ততা থাকতে পারে, আর অত মোটা বরফ শরীরের চাপে ভাঙবার ক্ষমতা যে এদের আছে—এটা আমাদের নতুন শিক্ষা হলো।'

অক্টোপাস

তিমি কি হাঙর যত ভয়ঙ্করই হোক, নিছক বীৎভসতায় অক্টোপাসের তুলনা হয় না। সমুদ্রের এই জীবন্ত আতঙ্কের নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছো, এবং মোটামুটি এর চেহারার রকমটা জানো। যেসব জন্তুর কথা ভাবলেই গা-টা কেমন শিরশির করে ওঠে অক্টোপাসের স্থান তাদের মধ্যে সবার উপরে। অনেক লোক আছে মাকড়সা দেখলেই ভয়ে চেঁচিয়ে ওঠে—যদিও মানুষের মাকড়সাকে ভয় করবার কোনো কারণ নেই। ভয়টা হয় ঐ লিক্‌লিকে, কিল্‌বিলে চেহারার জন্যে। আর অক্টোপাসের চেহারা সেই ভয়ের চরম মূর্তি।

অক্টোপাসকে বাংলায় বলা যায় 'অষ্টপদী'—যার আটটা পা আছে। হাতই বলো আর পা-ই বলো আর শুঁড়ই বলো—এই আটটা লম্বা লম্বা জিনিস দিয়ে ওরা শিকারকে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে। আটটা শুঁড় খুব পাতলা চামড়া (membrane) দিয়ে জোড়া

লাগানো—অনেকটা ছাতার শিকের মতো। প্রত্যেকটা শুঁড়ের সঙ্গে থাকে অসংখ্য sucker, এবং প্রত্যেকটা sucker দশ সের পর্যন্ত ওজন টেনে তুলতে পারে। শিকারের মাংস ছিঁড়ে মুখে তোলবার ব্যবস্থা অক্টোপাস এই রকম ক'রে করে। এই 'শোষক'-যন্ত্রটা অনেকটা বাঁকানো হুক গোছের, যার সাহায্যে খুব শক্ত ক'রে আঁকড়ে ধরা যায়। ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয় যে কোনো-কোনো অক্টোপাসের প্রত্যেকটা শুঁড়ে তিনশো পর্যন্ত sucker পাওয়া গেছে!

অক্টোপাস আসলে মাছ নয়—mollusc নামে অন্য এক জাতের জানোয়ার। নিরীহ শামুক ঝিনুকও এই মোলাস্ক্ জাতের শুনলে তোমরা বোধ হয় অবাক হবে। কাট্‌ল্ ফিস, অক্টোপাস প্রভৃতি বৃহদাকার মোলাস্ক্-এর অবিশ্যি বাইরে খোলস থাকে না—এরা মোলাস্ক্-এর মধ্যে উঁচু জাতের। ছোট জাতের মোলাস্ক্ অত্যন্ত নিরীহ, যুদ্ধ কাকে বলে জানেই না; কিন্তু প্রত্যেক 'বাহু'তে অসংখ্য sucker নিয়ে অক্টোপাস যে মহাযোদ্ধা হবে তা সহজেই বোঝা যায়। এই ভয়াবহ জানোয়ারটির প্রিয় খাদ্য হচ্ছে কাঁকড়া আর গলদা চিংড়ি। সমুদ্র যেখানে খুব গভীর নয়, তার তলাকার মাটিকে পাথরের আড়ালে ওঁৎ পেতে এ বসে থাকে—কাঁকড়া কি গলদা চিংড়ি কাছাকাছি এসে পড়লেই লম্বা শুঁড় বাড়িয়ে টপ্ করে ধরে ফেলে। তাই বলে ভেবো না যেন, কাঁকড়া-চিংড়ি খেয়েই এ খুশি থাকে। বড় বড় জানোয়ার আক্রমণ করতে এর কিছুমাত্র কুণ্ঠা নেই, এবং নিজেদের মধ্যে মারামারি তো অবিশ্রান্ত চলেছে। বিরাট তিমিদের গায়ে প্রায়ই জখমের দাগ দেখা যায়—সেটা অক্টোপাসের কি তাদের জাত কাট্‌ল্ ফিসের কীর্তি। তিমির গা থেকে হামেশাই এরা মাংস ছিঁড়ে-ছিঁড়ে খায়। ইয়োরোপের সমুদ্রে যেসব অক্টোপাস পাওয়া যায় তাদের শুঁড় সাধারণত দু'ফুটের বেশি লম্বা হয় না; কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার সমুদ্রে চল্লিশ ফুট বেড়ের অক্টোপাসও পাওয়া গেছে। প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে এবং জাপানের কাছাকাছি

সমুদ্রে বড় অক্টোপাসে জেলেদের নৌকো অনেক সময়ে উল্‌টে দেয় বলে শোনা গেছে।

প্রবাল

সমুদ্রের প্রাণীজগতের রহস্যের কথা বলতে গিয়ে প্রবালের উল্লেখ না করলে সমস্তই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। মানুষের দিক থেকে প্রবালই বুঝি সবচেয়ে মূল্যবান। এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র প্রাণী অসীম অধ্যবসায়ের ফলে অতল সমুদ্রে মানুষের জন্যে অসংখ্য দ্বীপ নির্মাণ করে তুলেছে এবং এখনও করছে। প্রশান্ত মহাসাগরের যে সমস্ত দ্বীপের সৌন্দর্য দেখে পৃথিবীতে স্বর্গ নেমে এসেছে বলে মনে হয়, সেগুলি এই আকারে নগণ্য প্রাণীদেরই বহু যুগের সমবেত চেষ্টার ফল। ধীরে ধীরে যুগযুগান্ত ধরে নিজেদের দেহের কঙ্কাল দিয়ে তারা এ দ্বীপ রচনা করে তোলে।

প্রবাল দ্বীপ বিষুবরেখার কাছাকাছি সমুদ্রের উষ্ণ, অগভীর প্রদেশেই দেখা যায়। তার কারণ এই যে, প্রবাল-কীট যে চুনের দ্বারা তার শরীর গঠন করে, অপেক্ষাকৃত গরম জল থেকেই সে চুন তার পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব। শীতল সমুদ্রে কোনো প্রবাল দ্বীপ নেই।

প্রবাল দ্বীপ তিন রকম। সমুদ্রতট থেকে কিছু দূরে তার ধারে ধারে সমান্তরাল এক রকম প্রবাল দ্বীপ দেখা যায়—দ্বীপের বদলে সেগুলিকে প্রবাল-প্রাচীর বলাই উচিত। এই প্রাচীরগুলি জলের ভেতর খাড়া হয়ে থেকে সমুদ্রকূলকে যেন পাহারা দেয়, বড় বড় ঢেউ এই প্রাচীরে এসেই ভেঙে পড়ে, তটের ধারে জল অপেক্ষাকৃত শান্ত থাকে।

আর এক রকম প্রবাল দ্বীপের মাঝখানে জল ও চারিধারে প্রবালের দেওয়াল থাকে। সমুদ্রের খানিকটা অংশ ঘিরে প্রবালেরা

যেন বিরাট নকল হ্রদ তৈরি করে। এই প্রবালের দেওয়ালে ঘেরা জলের নাম ইংরেজিতে 'লেগুন'। 'লেগুন'গুলি বেশ গভীর হয় বলে, বন্দর হিসাবে ব্যবহার করবার যোগ্য। বাইরের দুরন্ত সমুদ্র থেকে দরকার হলে জাহাজগুলি এখানকার শান্ত জলে আশ্রয় নিতে পারে। এককালে এমনি বহু 'লেগুন' প্রশান্ত মহাসাগরে অনেক জল-দস্যুর গোপন আড্ডা ছিল। বাইরের সমুদ্রে লুটতরাজ করে তারা জাহাজ নিয়ে এই সমস্ত জায়গায় লুকিয়ে থাকত।

তৃতীয় ধরনের প্রবাল দ্বীপগুলিকে সত্যই দ্বীপ বলা যায়। সমুদ্রের উপর সেগুলি নদীর চরের মতো জেগে উঠেছে। ফলে-ফুলে সুশোভিত এই দ্বীপগুলির সৌন্দর্য সত্যই অপরূপ।

প্রবালের নিজস্ব সৌন্দর্যও অসাধারণ। তাদের বৈচিত্র্যের সীমা নেই। লাল, নীল, সবুজ, হলদে, নানা রঙের প্রবাল দেখা যায়। জলের তলায় ডুব দিয়ে যাঁরা প্রবালের জগৎ চাক্ষুষ দেখেছেন, তাঁদের মতে পৃথিবীর কোনো দৃশ্যের সঙ্গে তার তুলনা হতে পারে না। সে যেন স্বপ্নময় পরীর রাজ্য। সেখানে যেসব মাছ ঘুরে বেড়ায় প্রবালের বিচিত্র রঙ ও রূপের দ্বারা যেন অনুপ্রাণিত হয়ে, তারাও আশ্চর্য সুন্দর হয়ে উঠেছে। জলের তলা থেকে সেখানে প্রবালের থাম উঠেছে। প্রবালের বহুবর্ণ খিলান, প্রবালের দরজা, প্রবালের গুহাপথ, আর তার মাঝে ছুটে বেড়াচ্ছে প্রজাপতির চেয়েও বিচিত্র সব মাছ, নানা আকারের নানা বর্ণের তারামাছ, ঝিনুক, আর কাঁকড়া।

প্রবাল নানা ধরনের হয়। কোনো জাতের প্রবাল গাছের মতো শাখায়-প্রশাখায় ছড়িয়ে বেড়ে ওঠে উপর দিকে, কোনো জাতের প্রবাল আবার মানুষের মাথার মতো গোল হয়ে বাড়ে। এক জাতের প্রবাল দেখলে সারি সারি ফল বলে মনে হয়। এগুলিকে শুধু প্রবাল না বলে, প্রবালের উপনিবেশ বলাই উচিত। কারণ বিচ্ছিন্ন ভাবে প্রবাল সামান্য একটি ফুলের কুঁড়ির মতো প্রাণী মাত্র। তাদের উপনিবেশগুলিই অমন বিচিত্র।

প্রবাল, ফুলের কুঁড়ি মতো, এক রকমের সামুদ্রিক প্রাণী হলেও, অনেক সময়ে উদ্ভিদ জাতীয় জীবের সঙ্গে একান্নবর্তী পরিবারে মিলে মিশে ঘর করে। উদ্ভিদ জাতীয় জীবের প্রাণীটি অবশ্য নিতান্ত ক্ষুদ্র, উদ্ভিদের একটি সবুজ কোষ মাত্র। এদের বৈজ্ঞানিক নাম হলো 'অ্যাল্‌জি'। প্রবালেরা এক সঙ্গে দল বেঁধে বাস করে, আর তাদের দেহে এই উদ্ভিদকোষ থাকে দল বেঁধে। উদ্ভিদকোষগুলি প্রবাল কুঁড়ির আশ্রয়ে থাকতে পাওয়ার জন্য, নিজের দেহ দিয়ে ভাড়া চুকিয়ে দেয়। তাতে তাদের বিশেষ লোকসান অবশ্য হয় না, কারণ প্রবালের পেটে তারা যতগুলি হজম হয় তার চেয়ে বংশবৃদ্ধি হয় তাদের বেশি। প্রবাল-কুঁড়িগুলির শুধু যে এই 'অ্যালজি'ই সম্বল তা নয়, তারা নিজেরাই সমুদ্রের প্রাণী শিকার করে খায়।

প্রবালের ভেতরের কাঠাম চুন দিয়ে তৈরি হয়। কোনো কোনো প্রবাল আবার চুনের খোলসের মধ্যেই বাস করে। প্রবাল মারা যাবার পর তাদের এই চুনের খোলস বা কাঠাম থেকে যায়। সেগুলির উপর আবার নতুন প্রবালেরা নিজেদের উপনিবেশ বসায়। এমনি করে যুগযুগান্ত ধরে তাদের কঙ্কাল পর-পর জমে উঠে শেষকালে প্রবাল দ্বীপ হয়ে ওঠে।

এখন যেসব প্রবাল দ্বীপ আমরা দেখছি—দশ লক্ষ বৎসর ধরে নিজেদের অস্থি জমা ক'রে, প্রবালেরা সেসব গড়ে তুলেছে। বৈজ্ঞানিকদের মতে দশ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীতে যখন তুষার-যুগ এসেছিল, তখন থেকে প্রবালেরা কাজ শুরু করেছে। সমস্ত জল তুষার হয়ে, পৃথিবীর উপর জমা হয়ে থাকার দরুন, তখন সমুদ্রগুলি ছিল অগভীর। সে তুষার-যুগ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের জল বেড়েছে এবং প্রবালের কাজও এগিয়ে গিয়েছে। সমুদ্র তুষার-যুগে অগভীর না হয়ে গেলে, এখনকার অনেক প্রবাল দ্বীপ তৈরি হতো না। কারণ প্রবাল খুব গভীর সমুদ্রের তলায় বাঁচে না। সমুদ্রে জল তখন অল্প ছিল বলেই প্রবালেরা কাজ শুরু করতে পেরেছিল।

স্পঞ্জ

স্পঞ্জ তোমরা অনেকেই দেখছ। এ জিনিসটি যে সমুদ্রে পাওয়া যায়, তাও অনেকে হয়ত শুনেছ। কিন্তু আসলে এটি যে কী—তা তোমরা বোধ হয় জান না। একশো বছরের আগে বৈজ্ঞানিকেরাও ঠিক জানতেন না। তাঁদের অনেকের ধারণা ছিল স্পঞ্জ এক রকম সাগরের উদ্ভিদ। উদ্ভিদ বলে মনে করাই স্বাভাবিক, কারণ স্পঞ্জ জলের তলায় এক জায়গায় আটকে থাকে। নড়ে-চড়ে বেড়ান দূরে থাক, তার ভেতর কোনো প্রকার প্রাণের লক্ষণই দেখা যায় না। অনেক বৈজ্ঞানিকের আবার ধারণা ছিল যে, স্পঞ্জ হয়ত প্রবালের মতো সামুদ্রিক পোকা-মাকড়ের শরীরের পরিত্যক্ত অংশ। স্পঞ্জের চারিধারে এবং নানা গর্তের ভেতরে ছোট ছোট অনেক পোকাকে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়।তাই জন্মেই স্পঞ্জ সেই পোকাদেরই তৈরী বলে তাঁদের মনে হয়েছিল। কিন্তু ঠিক একশো বছর আগে, রবার্ট গ্র্যান্ট নামে একজন ইংরাজ বৈজ্ঞানিক স্পঞ্জের আসল রহস্য উদ্ধার ক'রে, এ সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা দূর ক'রে দেন।

বাজারে যে স্পঞ্জ কিনতে পাওয়া যায়, সেগুলির ভেতর অসংখ্য ছোট বড় ফুটো তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ। ফুটোয় ফুটোয় স্পঞ্জ একেবারে ঝাঁজরা বলা যায় এবং এই অসংখ্য ফুটোই স্পঞ্জের বিশেষত্ব। সেই ফুটোগুলি থাকার দরুনই স্পঞ্জ অনায়াসে অত জল শুষে নিতে পারে। ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সে ফুটো নানা রকম। আঙল গলে যায় এমন বড় ফুটো আছে, আবার আছে অতি সূক্ষ্ম শাখা-প্রশাখায় ভাগ করা ছিদ্রপথ। অসংখ্য সুড়ঙ্গওয়ালা, গোলকধাঁধার মতো স্পঞ্জের সমস্ত ছিদ্রগুলিই ভেতরের দিকে চলে গিয়েছে বিচিত্র ভাবে।

এই ছিদ্রগুলিকে ভালো করে লক্ষ্য ক'রেই রবার্ট গ্র্যাণ্ট স্পঞ্জের রহস্য ভেদ করেন। আমরা যে স্পঞ্জ ব্যবহার করি, সেগুলি আসল স্পঞ্জের শবদেহ ছাড়া আর কিছু নয়। আসল স্পঞ্জ অনেকটা টাট্‌কা যকৃতের মতো দেখতে। জলের তলায় তাদের নানা আকার ও নানা বর্ণ বৈচিত্র্য দেখা যায় বটে, কিন্তু জীবন-প্রণালী তাদের এক রকম। যে সূক্ষ্ম ফুটোগুলির কথা আগে বলা হয়েছে, জীবিত স্পঞ্জের বেলায় সেগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, চুলের চেয়েও সরু এক একটি শুঁড়ের মতো জিনিস প্রত্যেক ফুটোর মুখে অনবরত আন্দোলিত হয়ে জলের স্রোত তৈরি করছে। সে জলের স্রোত স্পঞ্জের ভেতর নানা সুড়ঙ্গ পথে প্রবাহিত হয়ে বড় বড় ফুটোগুলি দিয়ে আবার বেরিয়ে যায়। স্পঞ্জের আহার সংগ্রহের এই হলো ফন্দি। জলের স্রোতে যে সমস্ত আণুবীক্ষণিক প্রাণী ও জৈব পদার্থ ফুটোগুলির ভেতর প্রবেশ করে, স্পঞ্জ সেইগুলিকেই আত্মসাৎ ক'রে নেয়। স্পঞ্জ উদ্ভিদ নয়—প্রাণীই, কিন্তু সম্পূর্ণ অদ্ভুত ধরনের। প্রাণী বলতে আমরা যা মনে করি, তার সঙ্গে কিছুই তার মেলে না। ফুলের মতো যে সামুদ্রিক প্রাণীর কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে, তাদেরও বিশেষ একটি মুখ আছে, বিশেষ হজম করবার মতো উদর। কিন্তু স্পঞ্জের সমস্ত দেহময়ই তার মুখ, সমস্ত দেহই তার উদর। সমুদ্রের তলায় এই নিরীহ চেহারার জীবটি, যাদুকর দৈত্যের মতো, অদ্ভুত এক ফাঁদ পেতে রেখেছে। একবার সে ফাঁদের কাছাকাছি এলেই হলো, আর নিস্তার নেই। অসংখ্য মুখ সেখানে হাঁ ক'রে আছে, গ্রাস করবার জন্যে।

প্রাণী হিসাবে স্পঞ্জের দেহ-কোষের কিন্তু বিশেষ জটিলতা নেই। মানুষের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, খুব নিচু স্তরের প্রাণীরও দেহে অসংখ্য বিশেষ ধরনের কোষ দেখা যায়। শরীরের নানা অংশের বিশেষ কাজের জন্যই তারা তৈরি। কিন্তু স্পঞ্জে মাত্র তিন-চার রকমের জীব-কোষ আছে। এক ধরনের জীব-কোষগুলি থেকে সূক্ষ্ম শুঁড়গুলি তৈরী। আর এক ধরনের কোষ আছে, স্পঞ্জের

গায়ের ওপরকার খোলসে। স্পঞ্জের শরীরে আর প্রত্যেক মুখের কাছে গলায় যে দুই ধরনের জীব-কোষ আছে, সেগুলি ছাড়া আর একটি জীব-কোষ স্পঞ্জের দেহে ইচ্ছামত স্বাধীন ভাবে ঘুরে বেড়ায়, অনেকটা আমাদের দেহে শাদা রক্ত-কণিকার মতো। এগুলির কাজ যে কী, তা কিন্তু ঠিক বলা যায় না। দেহে জটিলতা নেই বলেই স্পঞ্জ পুরাণের রক্তবীজের মতো অমর। কুচি কুচি করে তাকে যদি কেটে ফেলা যায়, তবু সে মরবে না। তার প্রত্যেকটি কুচি থেকে আবার একটি স্পঞ্জ গড়ে উঠবে। সমুদ্রের নিচু স্তরের আরো অনেক প্রাণীর এই রকম ক্ষমতা আছে। প্রবালেরই এমন সব জ্ঞাতি আছে, যাদের দেহ খুব সূক্ষ্ম। তারের ছাঁকনির ভেতর দিয়ে জোর ক'রে চালিয়ে দিয়ে সমস্ত দেহ-কোষগুলি আলাদা করে ফেললেও, তারা মারা পড়ে না। বিচ্ছিন্ন কোষগুলি আবার পরস্পরকে খুঁজে নিয়ে, যে যার জায়গা দখল ক'রে, আস্ত প্রাণী হয়ে ওঠে। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের হাত, পা, মুণ্ড, ধড় সব যদি কাটা পড়ে আলাদা হয়ে যাবার পর, আবার নিজেরাই খুঁজে-পেতে নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে যথাস্থানে জোড়া লেগে যায়, এবং কাটা সৈনিক উঠে বসে প্রাণ পায়, তাহলেও ব্যাপারটা প্রবালের এই জ্ঞাতির পুনর্জন্মের মতো বিস্ময়কর হয় না। কারণ, শুধু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নয়, দেহের সমস্ত কোষই এদের আলাদা হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও, এরা আবার গোটা হয়ে ওঠে।

শুধু সমুদ্রে নয়, স্পঞ্জ নদীর জলে ও পুকুরে পর্যন্ত হয়। সমুদ্রের এক রকম কাঁকড়ার গায়েও তারা অনেক সময়ে বাসা বেঁধে কাঁকড়াকে বাহন করে ঘুরে বেড়ায়। তাদের আকারও হয় অনেক রকম। কলকাতার মিউজিয়ামে নিচের তলার পুবের বড় ঘরে এক রকম প্রকাণ্ড স্পঞ্জ দেখতে পাবে। তাকে ইংরেজিতে বলা হয় 'বরুণের গেলাস'। দেখতে সে স্পঞ্জ সত্যি ফুটবল খেলায় জিতে যে রকম 'কাপ' পাওয়া যায়, তার চেয়েও প্রকাণ্ড। স্পঞ্জের আরো যেসব অদ্ভুত আকার আছে, তাই ধরেই সাধারণত তাদের

শ্রেণী বিভাগ করা হয়। কিন্তু তাতে গোলও মাঝে মাঝে বাধে। একই জাতের স্পঞ্জ সব সময়ে নির্দিষ্ট একটি আকারই গ্রহণ করে এমন নয়। খেয়াল মতো তাদের বদলাতেও দেখা যায়। সেটা খুব অসাধারণ ব্যাপার নয়। বরং স্পঞ্জের মতো অত্যন্ত নিচু স্তরের জটিলতাহীন প্রাণীর, বিশেষ একটি আকার জাতিগত ভাবে গ্রহণ করাই আশ্চর্যের ব্যাপার।

সমুদ্রের প্রধান কয়েকটি প্রাণীর মোটামুটি যে পরিচয় দেওয়া হলো তা থেকে সমুদ্রের জীবন-বৈচিত্র্যের খানিকটা আভাস মাত্র পাওয়া যায়। কিন্তু সাগরের রহস্য সাগরের মতোই অসীম অগাধ। যতখানি তার জানা গেছে, তাও বই-এর পর বই লিখলেও শেষ করা যায় না। এক মেরু থেকে আরেক মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল সমুদ্র, গরম ঠাণ্ডা তার নানা স্রোত, তার আবার স্তর-ভেদ—সব সুদ্ধ নিয়ে এমন একটা বিরাট ব্যাপার যা কল্পনা করাও শক্ত। জলের ওপরের দিকের অবশ্য আনুবীক্ষণিক গাছ-জাতীয় 'প্ল্যাঙ্কটন', সমুদ্রের এই সমস্ত প্রাণী জগতের মূল আহার। সেই মূল আহার, পরের পর ছোট থেকে বড় নানা প্রাণীর মধ্য দিয়ে, হাঙর থেকে বড় তিমিকে পর্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছে। প্ল্যাঙ্কটনের মতোই সূক্ষ্ম, জলের পোকা থেকে তারামাছ, অক্টোপাস প্রভৃতি নানা জাতের জীব সেই মূল আহারকে সম্বল ক'রে সুবিধামতো নানা বিচিত্র রূপ গ্রহণ করেছে।

প্রাণি-রূপের এই বৈচিত্র্য সমুদ্রের সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার। আগেই বলেছি যে, ডাঙায় সমুদ্রের মতো এত রূপের বৈচিত্র্য নেই। তার কারণ এই যে সমুদ্রেই প্রথম প্রাণের আবির্ভাব হয়েছিল, সমুদ্রে বহুকাল ধরে নানা রূপ গ্রহণের পর তাদের কয়েকটি মাত্র ডাঙায় এসেছিল উঠে—বেশির ভাগই রয়ে গেছে সমুদ্রে। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত প্রাণীরই জ্ঞাতিগোষ্ঠী খুঁজলে সমুদ্রে পাওয়া যাবে কিন্তু সমুদ্রের অনেক প্রাণীর ডাঙায় কোনো প্রতিনিধি নেই। অক্টোপাস, তারামাছ, প্রবাল, স্পঞ্জ এরা একান্ত ভাবে সমুদ্রেরই

জীব। এদের আত্মীয়স্বজন কত আকারে, কত ভাবে যে সমুদ্রে নিজেদের বংশ বিস্তার করেছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। তাদের সম্বন্ধে অনেক কিছুই আমাদের জানতে এখনো বাকি। তাছাড়া সমুদ্রে এখনো সম্পূর্ণ অজানা কোনো নতুন ধরনের প্রাণী আছে কি না, তাই বা কে জানে। জোর করে হ্যাঁ, না, কিছুই বলা উচিত নয়, কারণ সমুদ্র অগাধ, আর মানুষ সেদিন মাত্র বিজ্ঞানের চোখ দিয়ে সন্ধান করতে শুরু করেছে।

—

ক বি তা

রবি ঠাকুর

সেই তো সকাল হয় প্রতিদিন
রাত্রি ছিটায় তারা।
সাগর দোলে, লাগে মেঘে
ক্ষ্যাপা ঝড়ের তাড়া।

ধু ধু করে তেপান্তর আর
অরণ্যে ফুল ফোটে,
পাহাড় ধেয়ায় তুহিন শূন্য,
নদীরা সব ছোটে।

নিত্যকালের নিখিল ধারাই
বইছে নিরন্তর।
জীবন রাখে জলে স্থলে
নশ্বর স্বাক্ষর।

সব কিছুরই মানে তবু
বদলে গেল কিসে?
কেমন ক'রে একটি মনের
রঙ গিয়েছে মিশে?

রবি ঠাকুর এলেন গেলেন,
রইল এমন আভা—
সময়ই আর ম্লান হবে না
ও নাম ভুলবে না বা।

যাচ্ছি পূজোয়

মোটরে কেউ কেউ ষ্টীমারে
কেউ চড়বে ট্রেনে,
এরোপ্লেনেও কেউ বা যাবে
ঝড়কে সাথী মেনে।
যাচ্ছে ওরা দার্জিলিঙে
চলল তারা পুরী,
হিল্লী দিল্লী কত মুলুক
করবে ঘোরাঘুরি।

আমি কোথায় যাচ্ছি, জানো?
—এমন মজার দেশে,
পাক দিয়ে এই দুনিয়াখানা
মেলে সবার শেষে।
সব কিছু তার অন্য রকম
মানুষ, মাটি, জল,
চোখ দিয়ে যে দেখতে জানে
তার কাছে কেবল!

খুশিতে নীল আকাশে তার
মেঘের সাদা হাসি,
তারই জবাব দিচ্ছে বুঝি
মাঠে কাশের রাশি।
রোদ নয় ত' সোনা-ই যেন,
পড়ছে গলে ঝ'রে।
যে দিকে চাও পূজো পূজো
গন্ধে আকুল ক'রে।

কেমন ক'রে সে দেশে যায় ?
কায়দাটা আজগুবি।
দরজা খুলে দাঁড়াও শুধু
বলছি চুপি চুপি।

বাঘ

বাঘটা ! ও বাঘ ! বাঘ !
বনেও যদি দেখি তোমায়
হবে কি খুব রাগ ?

বন্দুকটা তুলে ধরে
মারতে গেলে গুড়ুম করে
ডোরা কাটা বাহার দেখেই
ফস্কে যাবে তাগ।

দাঁতে তোমার ধার নাকি খুব
চারটে থাবায় নখ ?
বিনা ক্ষিদেয় মারা ধরার
নেইত' তবু সখ।

নিরিবিলি গহন বনে
ঘোরো ফেরো আপন মনে,
হালুম হাঁকো পেটের দায়ে
নও শয়তান ঠক।

বাঘের বাড়া-ও জন্তু আছে
রক্তবীজের ঝাড়,

মানুষ সেজে ঘুরে বেড়ায়
চিনতে পারা ভার।

থাকে রাজা গজার বেশে
আলাপ করে মিষ্টি হেসে,
চোরা দাঁতে খুন-চোষা সব
ছারপোকা-পাহাড়।

মিষ্টি

যে আকাশে ঝড় ওঠে না
মেঘ ডাকে না,
—চাই কি ?
রোদ ওঠে না জল পড়ে না,
ভালো লাগে তাই কি ?

যে পথে নেই পিছলে পড়া,
হোঁচট খাওয়া, ছুথ্‌খু,
গড়িয়ে যেতে সে পথে যে
পায় মজা সে মুখ্‌খু!

রাস্তা হোক না চড়াই-ভাঙা
অনেক অনেক দূর।
আকাশে থাক ঝড় বৃষ্টি,
আর কিছু রোদ্দুর।

তাতেই হবে, তাইতে।
চিবিয়ে খেতে হয় বলে আখ
মিষ্টি সবার চাইতে!

ন্যাজ-নাড়া ছড়া

রাত দুপুরে হবু রাজা
হঠাৎ গেলেন ক্ষেপে
সাতশ সেপাই ধরে তাঁরে
রাখতে নারে চেপে।

খবর শুনে মন্ত্রী গবু
দৌড়ে আসেন ছুটে,
মানে তিনি বসেই থাকেন
দৌড়ে আসে মুটে।

ঝাঁকা থেকে বপুখানি
ঢেলে বলে গবু,
"কার গর্দান নিতে হবে
জলদি বলুন প্রভু।"

হবু বলেন, "আজ বুঝেছি
সবাই আকাট হাঁদা,
যেথায় যত পুঁথিপত্তর
পোড়াও গাদা গাদা।

কেউ জানে কি এ দুনিয়ার
কোনটি আসল ধাঁধা?

ল্যাজের ডগায় একটা করে
জন্তু কেন বাঁধা?

কুকুর বেড়াল হাতি ঘোড়া
উট কি হনুমান,
তাদের ল্যাজ না ল্যাজের তারা
নেই কোনো প্রমাণ।

আসল কথা ল্যাজই সত্য,
জন্তুগুলো ফাও;
বুঝতে যদি না চায় কেউ তো
ধরে শূলে দাও।"

যুক্তি শুনে মন্ত্রী গবু
চক্ষু দুটি মুছে,
বলেন, "এতদিনে মনের
আঁধার গেল ঘুচে।

এমন সোজা কথা যদি
থাকত আগে জানা,
গড়গড়িয়ে লাটে তুলে
দিতাম রাজ্যখানা।

আগাগোড়া উল্টো মানে
শিখিয়েছে সব গাধা।
দেখছি কালো সবই এখন
জানতাম যা শাদা!

ফলের আদর বোঁটার জন্যে
টিকির জন্যে মাথার,
জুতো বানাই বলেই পা চাই
নইলে কি দাম বা তার!

বাড়ির বড় বাসিন্দা নয়,
হাঁড়ির তরেই রান্না ;
বাঁটের জন্যে কোদাল, চোখের
জলের লোভে কান্না।

কাঁচির জন্যে গাঁটের কড়ি
গুলির জন্যে বক্ষ,
দড়ির জন্যে গলার খাতির
প্রাণটা উপলক্ষ।

দুনিয়াতে যে বলুক না যা
সার হল লাঙল।
ল্যাজ বিহনে মানুষই এক
সৃষ্টিছাড়া ভুল।"

সহজ ব্যাখ্যা

মাঠ বন পাহাড়ের পাখা নাই
দিনরাত বাঁধা থাকে এক ঠাঁই।
ছলছল চোখে শুধু চায়!
মেঘ আর পাখি উড়ে যায়,
দ্যাখে আর ভাবে
তারা কবে ওইমত যাবে!

তাদের দুঃখ বুঝি জানিয়ে
রেলগাড়ি নিলে তারা বানিয়ে!
গাড়ির জানলা দিয়ে চেয়ে
তাই দেখি চলে তারা ধেয়ে
তুফানে সওয়ার
মাঠ বন গ্রাম ও পাহাড়।

আছাড়-খাওয়া ছড়া

ছিলেন কবি মস্ত
　　ধরা দেখতেন সরা,
কলম নিলেই পদ্য
　　আসতো গড়া-গড়া।

বললাম, 'কবিমশাই,
　　ক'রে মেহেরবানি
ছড়া একটা লিখবেন ?
　　দোয়াত-কলম আনি ?'

মুখটা কবির আম্‌শি
　　পড়লো দীর্ঘ নিশ্বাস।
বললেন, 'শুনলে কাণ্ড
　　করবে কি তা বিশ্বাস।

এই-যে আগুন-ঝরা
　　গেলো দারুণ গ্রীষ্ম,—
তাইতে বারেক ভুলে
　　হলাম অবিমৃশ্য।

দুপুর রোদে বেরিয়ে
　　নিই নি সেদিন ছাতা
তাইতে ডিহাইড্রেটেড
　　হলো হঠাৎ মাথা।

কল্পনা সব ধু-ধু
　　যে-দিকে চাই চড়া,
কলম ঘ'সে-ঘ'সে
　　মিছেই হাতে কড়া।

মেঘ তো এখন জল
　　ঢালছে ঘড়া-ঘড়া,
পক্ষে আছাড় খেয়েও
　　বেরোয় না আর ছড়া।'

পাড়ি

জলে রোদের ঝিকিমিকি
　　হাওয়ায় ফোলে পাল
গহিন গাঙে ডিঙা বেয়ে
　　আমরা ফেলি জাল।

কূল কোথা যার নাই ঠিকানা,
সেই দরিয়ায় দিলাম হানা
ভয় করি না আসুক তুফান
　　হই হব বানচাল।

নইকো শুধু মাছের কাঙাল।
রুই কাতলা চিতল বোয়াল—
মুক্তো-মানিক আনব তুলে
　　লুট করে পাতাল।

সমাপ্ত